শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা হাফি.

নামাজে
মন ফেরানো

শারিন সফি অদ্রিতা

লেখক পরিচিতি

শায়খ আব্দুল নাসির জাংদা কালাম ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং একজন শিক্ষক। তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর উপর বিস্তৃত অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন এবং প্রতি বছর "কালাম ইন্সটিটিউট" থেকে তিনি "সীরাহ" টপিকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড়ভাবে ক্লাস করান। এছাড়াও তিনি নিয়মিত উমরা এবং মসজিদ আল-আকসা সফরের দলগুলোর নেতৃত্ব দেন।

আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে তার জন্ম ও বেড়ে উঠা। তিনি বর্তমানে তার স্ত্রী এবং তিন সন্তানের সাথে সেখানে থাকেন। অল্প বয়সেই সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে "হাফিজ" হন। স্থানীয় স্কুল থেকে একাদশ শ্রেণী পাশ করার পরে তিনি আমেরিকা থেকে করাচীতে চলে যান। সেখানে তিনি জামিয়া বিনোরিয়াতে বিজ্ঞান বিষয়ক ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তার ক্লাসের শীর্ষে থেকে ২০০১ সালে “আলিম প্রোগ্রাম” এ স্নাতক হন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ এর উপর ব্যাচেলর ডিগ্রী অর্জন করেন করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন “সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়” থেকে।

আলিম প্রোগ্রাম শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর, তিনি বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ পড়াচ্ছেন। এছাড়াও তিনি এলাকার বিভিন্ন ইসলামিক স্কুলে কাজ করছেন এবং ডালাস এলাকার কলিভিল মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু

দ্বীন
পাবলিকেশন

বই নামাজে মন ফেরানো

লেখক শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা হাফি.

অনুবাদ শারিন সফি অদ্রিতা

সম্পাদনা মাওলানা হাসান শুয়াইব

বানান ও ভাষারীতি মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম

পৃষ্ঠাসজ্জা দ্বীন গ্রাফিক্স টিম

প্রচ্ছদ দ্বীন গ্রাফিক্স টিম, গোলাম আহাদ

নামাজে মন ফেরানো

আপনার নামাজ হয়ে উঠুক জীবন্ত

দ্যা মিনিংফুল প্রেয়ার

লেকচার অবলম্বনে

শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা হাফি.

অনুবাদ

শারিন সফি অদ্রিতা

দ্বীন পাবলিকেশন

নামাজে মন ফেরানো

প্রকাশনা – ১১ [এগারো]
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০২২
৩য় মুদ্রণ: অক্টোবর, ২০২২
৪র্থ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
৫ম মুদ্রণ: জুলাই, ২০২৩

প্রকাশক – দ্বীন পাবলিকেশন
www.facebook.com/deenpublication
email: deenpublications@gmail.com
+88 01303 77 12 22, +88 01303 77 12 02

বাংলাবাজার পরিবেশক
তারুণ্য প্রকাশন, শপ # ১৩, ২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯৭৯৪৫৬৭২২, ০১৯৭৯৪৫৬৭২১

অনলাইন পরিবেশক
❒ বইভ্যালি ❒ রকমারি ❒ ওয়াফি লাইফ ❒ নিয়ামাহ শপ ❒ সিয়ান শপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৪০০ টাকা ❒ Price: 20 USD

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Namaze Mon Ferano by Shaikh Abdul Nasir Jangda, Translated by Sharin Shafi Odrita, Edited by Maolana Hasan Shuaib, Published by Deen Publication, Dhaka, Bangladesh

অর্পণ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাকে মেধা, অন্তর এবং বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে সত্য ধর্মকে জানার, বোঝার এবং এই বিষয়ে অল্প-বিস্তর লেখার তাওফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ এবং সালাম পেশ করছি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যার উম্মত হতে পেরে নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবতী মনে হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব আমার মা কামরুন নাহার, বাবা ডা: মোঃ সফি উদ্দিন, বড় ভাই তানভীর, জীবনসঙ্গী সৈয়দ জিয়া এবং বড় বোন মুন আপুর প্রতি। এই মানুষগুলো শত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিনিয়ত আমাকে বইটি লেখার জন্য উৎসাহ, দুআ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। উত্তম জ্ঞানের সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে সকলের আমলনামায় এটি কবুল করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সূচিপত্র

অর্পণ ৫

সূচিপত্র ৭

প্রকাশক কথন ১১

সম্পাদক কথন ১৭

অনুবাদিকার কথা ২০

বই নিয়ে কিছু কথা ২৩

অধ্যায় ১ : সূচনা

সূচনা ২৪

আপনার ভিতটা মজবুত আছে তো? ৩০

নামাজ কি আপনার বিষণ্ণতার ওষুধ? ৩৪

শাইখের জীবনের একটি সত্য ঘটনা ৩৭

রবের কালামের ছোঁয়ায় নামাজ ৩৯

অধ্যায় ২ :খুশু—সালাতের প্রাণ

খুশু কী? ৪৫

অধ্যায় ৩ : আযান—শাফায়াত লাভের হাতিয়ার

আযান—শাফায়াত লাভের হাতিয়ার ৫০

আযান শোনার পর করণীয় ৫০

আযানের উত্তরে আমরা কী বলব? ৫০

আযান শেষে করণীয় ৫২

দুআ কবুল হয় আযানের পর ৫৩
আযানের ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক ৫৪
আযান–গুনাহ মাফের উপায় ৫৫

অধ্যায় ৪ : ওযু—ঈমানের অর্ধেক

ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক? ৫৮
ওযু সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৫৯
নবীজির শেখানো দুআ, যা ওযুর পর পাঠ করতে হয় ৬৫

অধ্যায় ৫ : আপনি প্রস্তুত তো নামাজের জন্য?

নামাজ শুরুর আগে করণীয় ৭০
নামাজে খুশু থাকার পূর্ব শর্ত ৭২
এক. লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনা ৭২
দুই. নামাজ শুরু করার আগে ৭২
তিন. নামাজরত অবস্থায় খুশু ৭৪

অধ্যায় ৬ : নামাজে বহুল পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা

নামাজে পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা ৭৫
নামাজে ‘আল্লাহু আকবার’ এর অর্থ ৭৫
নামাজে পড়া সানার অর্থ এবং ব্যাখ্যা ৭৬
বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম ৮৫

অধ্যায় ৭ : নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি

নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি ৮৬
আপনি কি জানেন আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন? ৯৫

অধ্যায় ৮ : রুকু ও সিজদাহ

রুকু এবং সিজদা ৯৭
রুকু থেকে উঠার দুআ—একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৯৯
সিজদায় অন্যান্য দুআ ১০০

অধ্যায় ৯ : তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা

তাশাহুদ ১০২
দরুদ ১০৬
দুআ মাসূরা ১২১
তাশাহুদ এর বিস্ময়কর তাফসীর ১২৫

অধ্যায় ১০ : দুআ—মুমিনের হাতিয়ার

নামাজ শেষে পঠিত দুআসমূহ ১৩৪
দুআ—মুমিনের হাতিয়ার ১৪২
দুআ কীভাবে কাজ করে? ১৪৬
নবীদের দুআ থেকে শিক্ষা ১৬৪
নামাজ শেষে যিকির ১৬৭
ইস্তিগফার—যে দুআ সকল মুশকিল আহসান করে দেয় ১৬৮
তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল-তাহমীদ পাঠের ফযিলত ১৮২
দুআ কুনুতের অর্থ ১৮৩
দুআ কবুল না হবার কারণসমূহ ১৮৫
ফিরিশতারা যাদের জন্য দুআ করেন ১৯২

অধ্যায় ১১ : নামাজে মধুরতা আনব কীভাবে?

নামাজকে মধুর করার কিছু কলাকৌশল ১৯৪
নামাজের আগে ১৯৪
নামাজের মধ্যে ১৯৭
নামাজ শেষে ১৯৭

অধ্যায় ১২ : নামাজ এবং বাস্তবতা

নামাজ এবং বাস্তবতা ১৯৯
সোনামণিদের নামাজ ২০২
নামাজের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো ২০৪
ফোন আসছে ২০৮
রিসেট, রিস্টার্ট, রিভাইভ! ২১১
পারফিউম কথন এবং নামাজ ২১৫

অধ্যায় ১৩ : সালাত নিয়ে বরেণ্যদের বয়ান

মদ না দুআ? ২১৮
রেজাউল করিম

সালাত: অজানা মনোজগতের হারানো চাবি ২২৬
ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত কেন? ২৩২
শাইখ ড. আকরাম নদভী

সালাত—ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং ২৩৪
ডা. জাকির নায়েক

মনের মতো সালাত ২৪১
ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

অধ্যায় ১৪ : সালাত বিষয়ক আয়াত

সালাত বিষয়ক আয়াত ২৫০

অধ্যায় ১৫ : সালাত বিষয়ক হাদিস

সালাত বিষয়ক হাদিস ২৫৪

অধ্যায় ১৬ : নামাজে প্রচলিত কয়েকটি ভুল

নামাজে মনে মনে কুরআন পড়া ২৬৭
তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা ২৬৮
আমিন মনে মনে বলা ২৬৮

অধ্যায় ১৭ : উপসংহার

শেষ কথা ২৭০

প্রকাশক কথন

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সালাতের মাধ্যমে আমাদের মতো নগণ্য বান্দাদের তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি যাকে পৃথিবীর বুকে পাঠানো হয়েছে রহমতস্বরূপ। যিনি নিজে সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর প্রিয় সাহাবীদের সালাত শিক্ষা দিয়েছেন।

সালাত গুনাহ মাফের এক আশ্চর্য প্যাকেজ! কীভাবে? সেটাই আমরা ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করব।

মসজিদে যাবার গুরুত্ব

মসজিদে যাবার গুরুত্ব বোঝাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আসা-যাওয়া করে, প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন।"[১] আরেকটি হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে কেবল সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে রওনা হলে, মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।"[২]

---

[১] বই: রাসূলের চোখে দুনিয়া, নং ১

[২] ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২৮১

সালাতের জন্য অপেক্ষার গুরুত্ব

মসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বান্দা যে সময়টা মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শব্দ করে বায়ু বের হয়।"[৩]

আযানের উত্তর দেয়ার গুরুত্ব

আযানের উত্তর দেয়ার গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা আযান শুনতে পাও, মুয়াজ্জিন যা বলবে, জবাবে হুবহু তাই বলবে। আযানের জবাব দেয়ার কারণে তোমরা জান্নাতে যাবে।"[৪]

ওযুর গুরুত্ব

ওযুর গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করার পর বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন; আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামতো যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[৫]

আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্ব

আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আযান ও ইকামতের মাঝের সময়ের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।" সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, (ঐ সময়ে)

---

[৩] সহীহ বুখারী ১৭৭

[৪] সহীহ মুসলিম ৭৩৬

[৫] মুসলিম ২৩৪, তিরমিজি ৫৫

আমরা কী বলব?" তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।"[৬]

সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার গুরুত্ব

সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক ফরয নামাজ শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোনো বাধা থাকে না, মৃত্যু ব্যতীত।"[৭]

সালাতের পরে মসজিদে বসে থাকার গুরুত্ব

সালাতের পরে মসজিদে বসে থাকার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পরে যতক্ষণ সালাতের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকেন। তারা বলেন, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ, তার উপর রহম করো।'"[৮]

এখন,

» সালাতের প্রস্তুতিমূলক কাজ ওযু যদি হয় মাগফিরাতের কারণ,

» সালাতের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া যদি হয় জান্নাতে ঘর তৈরি আর মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম,

» সালাতের জন্য অপেক্ষা যদি হয় সালাতরত অবস্থায় সওয়াবের সমতুল্য এবং মুসলিম ভূখণ্ডের সীমানা পাহারার সমতুল্য,

» সালাত শেষ করা যদি হয় ফিরিশতাদের দুআ পাওয়ার উপায়,

» সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসী যদি হয় জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি,

তাহলে একটিবার ভেবে দেখুন তো মূল "সালাত" এর মর্যাদা কেমন হতে পারে?

---

[৬] আবু দাউদ ৫৩৪, তিরমিজি ৩৫৯৪

[৭] নাসাঈ শরীফ

[৮] বুখারী ৪৪৫

এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে বান্দার যে কাজের হিসাব প্রথম নেয়া হবে, তা হলো সালাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেন, মুমিন এবং কাফির-মুশরিকের মাঝে যে জিনিসটা পার্থক্য তৈরি করে তা হলো সালাত। সমস্ত ইবাদতের হুকুম এসেছে জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে, নামাজের হুকুম এসেছে সাত আসমানের উপর থেকে—সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছে থেকে মিরাজের রাতে। সুবহানআল্লাহ!

কিন্তু আমাদের এখনকার সালাতগুলো কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। এখন আমরা সালাত পড়ি আবার ঘুষও গ্রহণ করি। কেউ মসজিদে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, দেখা যায় তিনিই আবার সুদ অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত। তার হাত থেকে কোনো অসহায় মানুষও রক্ষা পায় না! এমন কোনো অশ্লীল কথা নেই তার মুখ থেকে বেরোয় না!

কিন্তু কেন? এমন তো হবার কথা ছিল না! কথা ছিল সালাত মানুষকে সমস্ত অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখবে। সমস্ত পাপ কাজ, অনাচার থেকে দূরে রাখবে।

তাহলে? এখানে মূল ব্যাপার হলো, মানুষের সালাতগুলো আর সালাত হয় না, হয় কেবল শারীরিক ব্যায়াম। সালাতগুলো হয় নিছক আনুষ্ঠানিকতা বা লোক দেখানো। অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার শুদ্ধিকরণ এবং নিয়তের বিশুদ্ধতা নিয়ে যতক্ষণ না বান্দা সালাত আদায় করবে, ততক্ষণ তার সেই নামাজ, সালাত হিসেবে গণ্য হবে না।

সালাত কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

সালাত হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কালেমার পরেই সালাতের স্থান। একজন মানুষ ঈমান আনার পর তার উপর প্রথম যেটি পালন ফরজ হয়ে পড়ে সেটি সালাত। একজন মুমিনের জীবনে সালাত হলো তার ঢাল। সালাত তাকে সমস্ত অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচায়। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে মন্দ কাজ হতে দূরে রাখে।[৯]

সালাত এমন একটি বর্ম যা একজন মুমিনকে অশ্লীলতা, সমস্ত পাপাচার, অনাচার

---

[৯] সূরা আনকাবুত ২৯ : ৪৫

থেকে দূরে রাখে। সালাত এমন এক মাধ্যম যা সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগ স্থাপন করে। সালাত তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। যখন একজন মানুষ তার দুঃখ-কষ্ট-বেদনার কথা কাউকে বলতে পারে না, তখন নামাজ এ সুযোগটা করে দেয় আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার জন্য।

খুশু-খুযুর সাথে সালাত কী?

সালাতে খুশু-খুযু কী তা নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন,

অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার শুদ্ধিকরণ, নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং একাগ্রতা নিয়ে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে বলা হয় সালাতে খুশু-খুযু। খুশু-খুযুবিহীন সালাত হলো ওই ব্যক্তির জন্য শাস্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য শিকল। এতে অবশ্য ফরজ আদায় হবে। কিছু সওয়াব সে পাবে। গুনাহ মাফ হবে এবং আল্লাহর রহমত ততটুকুই সে পাবে যতটুকুর সে উপযুক্ত। তবে সালাতে যে ত্রুটিগুলো সে করেছে, তার জন্য একদিন কঠোরভাবে পাকড়াও হবে।

অপরদিকে খুশু-খুযুওয়ালা সালাত হলো ফুলের বাগানের মতো। আত্মার প্রশান্তি। চোখের শীতলতা। নফস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুখ। সে সালাতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে, তার স্বাদ আস্বাদন করে। সে তার সালাত দ্বারা যা লাভ করার তা তো পাই-ই, সাথে লাভ করে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য এবং মর্যাদা। একমাত্র মুমিন ব্যক্তিরাই এটা উপভোগ করতে পারে। যেমন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।"[১০]

সালাতকে আমি কীভাবে দেখি?

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সালাত হলো গুনাহ মাফের প্যাকেজ। আল্লাহ তাআলা সব সময় উসিলা খোঁজেন কীভাবে বান্দার গুনাহ মাফ করা যায়।

সালাতই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে সকালের গুনাহ দুপুরে, দুপুরের গুনাহ বিকেলে, বিকেলের গুনাহ রাতে এবং রাতের গুনাহ ভোরে ধুয়ে-মুছে ছাফ হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ। একটি বিখ্যাত হাদিসে আমাদের রাসূল তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কী মনে করো যে দৈনিক পাঁচবার

---

[১০] সূরা মুমিনুন ২৩ : ১-২

গোসল করে?" সাহাবীরা বুঝতে পারেননি নবীজি আসলে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তারা জবাব দিলেন, "ওই ব্যক্তি তো সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এটা হলো নামাজের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ তাআলা বান্দার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন।"

সালাতের মাধ্যমে গুনাহ মাফের যে অবারিত সুযোগ, আমাদের উচিত সালাত খুশু-খুযুর সাথে পড়া এবং এই বইটি নিঃসন্দেহে আপনার আমার সালাতকে খুশু-খুযুর সাথে পড়তে নিয়ামক (টনিক) হিসেবে কাজ করবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির পরতে পরতে পাঠকরা নতুন কিছু খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ। এখানে এমন কিছু টেকনিক আলোচনা করা হয়েছে যা একজন সালাত আদায়কারীকে নামাজে মনোযোগী হতে, নামাজ খুশু-খুযুর সাথে আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করবে, ইনশাআল্লাহ।

সালাতে খুশু খুযু নিয়ে শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা হাফিজাহুল্লার সাড়া জাগানো লেকচার সিরিজ The Meaningful Prayer, বাংলায় পাবলিশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদিকা শারিন সফি অদ্রিতা এত চমৎকার অনুবাদ করেছেন যে, মনে হবে শাইখ বুঝি বাংলায় লেকচার দিচ্ছেন আমাদের সামনে। অনুবাদিকার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বইটিকে নির্ভুল করতে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ছাড়া কোনোটিই নির্ভুল নয়। চিরসত্য হলো আমরা ভুলের ঊর্ধ্বে নই। কাজেই কোনো ভুল পেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার না করে, প্রথমেই আমাদেরকে জানাবেন, আমরা শুদ্ধ করে নিব ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে তাদের শান অনুযায়ী আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন—আমিন।

আল্লাহর তাআলার ক্ষমার মুখাপেক্ষী
প্রকাশক, দ্বীন পাবলিকেশন।
জুন, ২০২২

সম্পাদক কথন

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর সমীপে, যিনি আমাদেরকে তাঁর সামনে প্রার্থনায় দাঁড়ানোর জন্য সালাতের বিধান দিয়েছেন, দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর নিকটবর্তী হবার জন্য সিজদায় নত হওয়া শিখিয়েছেন। মহাবিশ্বের অণু পরিমাণ সালাত ও সালাম প্রেরিত হোক সেই শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি, যিনি প্রভুর নির্দেশে পৃথিবীর বুকে সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায়োগিকভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে নিজের সবটুকু দিয়ে সমর্পিত হতে হয় আল্লাহর সামনে।

সালাত—মুমিনের জীবনে আল্লাহর দেয়া এক বিকল্পহীন উপহার। কথা ছিল এই উপহার সালাত হবে আমাদের চোখের শীতলতা, হৃদয়ের বসন্ত, মনের কথা আল্লাহকে খুলে বলবার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কথা ছিল সালাত আমাদের সংকটময় জীবনে সমাধানের পথ খুলে দিবে। মানুষ বিপদ থেকে পাবে পরিত্রাণ। কথা ছিল সালাতের মাধ্যমে দূর হবে সকল মন্দ ও অশ্লীল কাজ। মুসলিম জীবন হবে নির্মল।

কিন্তু কই, আমাদের সালাতের মাধ্যমে তো এগুলো অর্জিত হয় না! কেন এমন হয়? কারণ, সালাতকে আমরা জাস্ট ফরমালিটি মেইনটেইন মনে করছি। একটি বোঝার মতো ধরে নিচ্ছি, মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে পারলেই বাঁচি। আজ নামাজে আমাদের চোখ শীতল হয় না। সিজদার মাধ্যমে করতে পারি না জীবনের সমাধান। সালাত পড়েও দূরে থাকতে পারছি না মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে। কেন এমন হয়?!

হ্যাঁ, এর পেছনে মূল কারণ হলো আমাদের সালাতে প্রাণ নেই। আমাদের সালাত জীবন্ত নয়। সালাতে আমাদের মন নেই।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে সালাতে প্রাণ ছিল, সে সালাত ছিল জীবন্ত। যে সালাতে মন ছিল নিবিষ্ট ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন, সেই সালাতের মাধ্যমে হৃদয়ে আসত বসন্তের হিল্লোল। সেই সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি বেঁচে থাকত যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে। সেই সালাত খুলে দিত জীবনের সামনে সমাধানের রাজপথ।

তাহলে কীভাবে আমাদের সালাত জীবন্ত আর চোখের শীতলতা হবে? কীভাবে সালাতে কথা বলব আমাদের রবের সাথে? কীভাবে সালাত হবে আমাদের সংকট সমাধানের মাধ্যম?

হ্যাঁ, এসব প্রশ্নের সহজ-সাবলীল উত্তর পাওয়া যাবে 'নামাজে মন ফেরানো' বইটিতে। সম্পাদনার সুবাদে বইটির আদ্যোপান্ত পড়েছি। যত সামনে এগিয়েছি, মুগ্ধতার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। নামাজে মন বেঁধে রাখার কার্যকরী সুন্নাহভিত্তিক কলাকৌশল সুন্দর ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে বইটিতে। শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা হাফিজাহুল্লাহর বয়ান অবলম্বনে রচিত বইটিতে লেখিকা পরম যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যক্ত করেছেন কীভাবে মন আবদ্ধ থাকবে সালাতে। কীভাবে সালাত মাধ্যম হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের।

নামাজে মধুরতা আনয়নের জন্য কার্যকরী উপায়গুলো তিনি ধরে ধরে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখানে উল্লিখিত উপায়গুলো পাঠককে নতুন করে ভাবতে শেখাবে। নামাজে খুশু-খুযু তৈরির ক্ষেত্রে পাঠকের মনে নতুন বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে নামাজ সম্পর্কিত সময়ের বিজ্ঞ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের বয়ান সংযোজন। শাইখ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহর বয়ানটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সারগর্ভপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তার সমাধিকে জান্নাতী আলোয় আলোকিত করে দিন। আর উস্তাদ নোমান আলি খান হাফিজাহুল্লাহর সংযোজিত অংশটুকু তো অভিভূত করার মতো। আল্লাহ তার মাধ্যমে জাতিকে আরো বেশি উপকৃত হবার সুযোগ দিন। ড. ইয়াসির ক্বাদি হাফিজাহুল্লাহর ওযু নিয়ে, বাসিরা মিডিয়ার তাশাহুদ এবং আত্তাহিয়্যাতু নিয়ে আলোচনা, অনুবাদিকা শারিন সফি অদ্রিতার নামাজ নিয়ে নিজের অভিব্যক্তি, ডাক্তার শামসুল আরেফিন শক্তি, ড. জাকির নায়েক, শাইখ আকরাম নদভী হাফিজাহুল্লাহর সালাত নিয়ে মর্মস্পর্শী বয়ান,

রেজাউল করিম ভাইয়ের দুআ নিয়ে চমৎকার লেখনী বইটিকে নিয়ে যাবে অন্য উচ্চতায়, ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠ শেষে একটি উপলব্ধি অবশ্যই জাগবে। তা হলো, নামাজে মন ফেরানোর জন্য আগে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে নিজের মাঝে। আগে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে আমি জীবন্ত সালাতের মুসল্লি হতে চাই। আমি আমার সবকিছু কেবল আমার রবকেই বলতে চাই। আমি সালাতের মাধ্যমে আমার রবের নিকটবর্তী হতে চাই। আমি সকল সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করব সালাতের মাধ্যমে।

এমন সুন্দর একটি বইয়ের রচয়িতার প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে পারছি না। আল্লাহ তার ইলমে বারাকাহ দান করুন। শানিত করুন তার গতিশীল কলমকে। মন থেকে চাইব, তার দ্বীনকেন্দ্রিক প্রতিভার মাধ্যমে আধুনিক মনন যেন আরো বেশি উপকৃত হয়।

প্রকাশক মহোদয়ের দীর্ঘ এবং গভীর চিন্তাশীলতাও বইটিকে সার্বিকভাবে সুন্দর করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। দুআ করি আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। সকল বাধা পেরিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে বলব, আমাদের কাজগুলো ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ভুলের মধ্য দিয়েই যেহেতু আমাদের পৃথিবীতে আসা, তাই আমাদের ছোটখাটো এই কাজগুলোতেও ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর ক্ষমার মুহতাজ

হাসান শুয়াইব
সম্পাদক, দ্বীন পবলিকেশন
মার্চ, ২০২২ ঈসায়ী

অনুবাদিকার কথা

‘নামাজে মন ফেরানো’ বইটি লেখার পেছনের গল্পটা যতবার বলি, ততবারই গা শিউরে ওঠে। ঘটনাটা শুরু হয় এক দ্বীনি আলোচনার মজলিসে। সেদিন উস্তাদ ক্লাসে ঢুকে তার বক্তব্য শুরু করার আগে আমাদেরকে একটা অদ্ভুত কাজ করতে বলেন।

তিনি সবাইকে আমাদের মুঠোফোনটা বের করে সামনে রাখতে বললেন। এরপর বললেন, আমরা যেন মুঠোফোনের ক্যামেরা অপশনে যাই এবং ক্যামেরার সেলফি মোড অন করে নিজের দিকে তাক করি। বাধ্য ছাত্রীর মতো আমরা সবাই শাইখের কথামতো কাজ করলাম। শাইখ ঠিক কী করতে চাচ্ছেন সেটা তখনও কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল।

তখন শাইখ আমাদেরকে বলা শুরু করলেন,

‘প্রিয় ছাত্রীরা, আমি কিন্তু অনর্থক তোমাদেরকে এই কাজটি করতে বলিনি। তোমরা এখন এই অবস্থানে থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করবে। ধরো, তোমাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এখন থেকে কয়েক মুহূর্ত পরেই তোমার মৃত্যু হবে! চিরতরে ওপারের অনন্তকালের জীবনে তুমি চলে যাবে। যাবার বেলায় এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে একটা ছোট সুযোগ দেয়া হলো এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমার জীবনের শেষ মেসেজটি ধারণ করতে। তোমার আপনজনের কাছে, পরিবারের কাছে এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর কাছে তোমার এই মেসেজটি পৌঁছে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। মৃত্যুর আগে এই দুনিয়ার জন্য তুমি ঠিক কী কী রেখে যেতে চাও?

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো তো, তুমি কবরের আলো হিসেবে তোমার কোন

আমলগুলো রেখে যাচ্ছ? নিজের সাদাকায়ে জারিয়াহগুলোকে তুমি কীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছ? মুসলিম উম্মাহর জন্যই বা তুমি কী উপকারী বস্তু রেখে যাচ্ছ? এই সবগুলো পয়েন্ট চিন্তা করে জীবনের শেষ ভিডিও বার্তাটি এখন তোমরা সবাই তৈরি করবে। তোমাদেরকে সময় দিলাম পাঁচ থেকে সাত মিনিট। এবং সময় শুরু হচ্ছে এখন থেকে...!' বলেই তিনি ঘড়ি ধরা শুরু করলেন।

পুরো ক্লাসে পিন পতন নীরবতা। শাইখের কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও তিনি কাল্পনিক একটা পরিস্থিতির কথা বলছেন। তারপরও সেটা কল্পনা করতে গিয়ে একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম। আসলেই তো! আমি যদি এখনই এই মুহূর্তে মরে যাই আমার কবরের আলো হয়ে থাকবে এরকম কি সাদাকায়ে জারিয়াহ আমি নিজের জন্য রেখে যাচ্ছি? নিজের চিন্তার জগতে অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। তেমন কিছুই আসলে খুঁজে পেলাম না।

মুসলিম উম্মাহর জন্য কী রেখে যাচ্ছি সেটা তো অনেক পরের কথা! আমি যদি আজকে মারা যাই, কালকেই পৃথিবীর বুক থেকে আমার নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমার প্রিয় মানুষরা হয়তো আমার কবর পর্যন্ত যাবে। কয়েকদিন অথবা কয়েক মাস আমাকে অনেক স্মরণ করবে, শোক করবে। কিন্তু তারপর বাস্তবতার বেড়াজালে জড়িয়ে সবাই যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে।

সম্মোহিতের মতো তখনও বসে আছি আর নানান চিন্তার জাল থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বের হবার চেষ্টা করছি। কিছু বোঝার আগেই পাঁচ মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমি ভিডিও বার্তায় কিছুই বলতে পারলাম না। নিজের অপারগতার কথা চিন্তা করে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠল। সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললাম আমাকে এমন একটা কাজ করে যেতে হবে যেটা মৃত্যুর পরেও আল্লাহ কবুল করলে আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী একটা প্রজেক্টের অংশ হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ভাবছি কী করা যায়? আমার মতো সাধারণ একজন মানুষ এমন কী প্রজেক্টের উপর কাজ করবে যা তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে? ভাবতে ভাবতে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো, আচ্ছা, এমন কিছু করলে কেমন হয় যদি আমি বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য নামাজকে জীবন্ত করতে সাহায্য করি?

আমরা—মুসলিমরা কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব যে আমাদের নামাজ প্রতিদিন আমাদের চোখকে শীতল করছে? অন্তরকে প্রশান্ত করছে? আমরা কয়জন এমন নামাজ পড়ি যা আমাদেরকে সকল প্রকার অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছে? জীবনে চলার পথে নানা বাধাবিপত্তির এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যখন আমরা ধরাশায়ী হয়ে যাই, আমরা কয়জন আমাদের নামাজকে বিপদ থেকে উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করি? আমরা কি বলতে পারব যে, আমি সারা জীবন এমন নামাজ পড়তে পেরেছি যা আমার জন্য অবশ্যই কবরের আলো হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ?

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের বেশিরভাগ মুসলিমদের জন্য উপরের প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেয়াটা কষ্টসাধ্য। সেই কষ্টকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত করারই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নাম 'নামাজে মন ফেরানো'। আলহামদুলিল্লাহ।

ঐদিন ক্লাসের সেই স্মরণীয় ঘটনাটির পরপরই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, আল্লাহ কবুল করলে আমার জীবনের সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রজেক্টটি হবে নামাজ নিয়ে ইনশাআল্লাহ। রোবটিক এবং প্রাত্যহিক এই মহামূল্যবান নামাজকে যান্ত্রিকতার চক্র থেকে বের চক্ষু এবং অন্তর শীতলতাকারী সফল ইবাদতে রূপান্তরিত করার একটি বিনম্র প্রচেষ্টাস্বরূপ এই বইটি লেখা।

'নামাজে মন ফেরানো' একটি স্বপ্নের নাম! এবং আমার রব কবুল করলে, এটি আমার কবরের আলো হবে বলে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শুরু হলো আপনি এই বইটি হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমে। আপনাকে অভিনন্দন! আল্লাহ আপনার এই প্রচেষ্টা কবুল করুক এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে নামাজ এবং সত্যের উপর অটল রাখুন। আমিন।

কখন যে আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবার ডাক চলে আসবে, সেটা কেউ বলতে পারি না। হতে পারে সেটা আগামী বছর, আগামী মাস, অথবা আগামী কাল। এই ঠুনকো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মটিকে আরো সুন্দর, মধুর, অর্থপূর্ণ এবং সফল করার এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগতম।

শারিন সফি অদ্রিতা
১৮ অক্টোবর, ২০২০

বই নিয়ে কিছু কথা

শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা কর্তৃক পরিচালিত 'মিনিংফুল প্রেয়ার' কোর্সটির শিক্ষারত্ন এবং ভাবানুবাদ এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কোর্সটি মূলত অনলাইনে প্রচারিত হয় এবং সর্বমোট ১১টি লেকচারের সমন্বয়ে গঠিত। সম্পূর্ণ কোর্সজুড়ে একজন মুসলিম তার নামাজের মধ্যে যা যা শব্দ, বাক্যমালা, তাসবীহ ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, সেগুলোর ভাষাগত এবং পরিভাষাগত অর্থের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেই সাথে নামাজকে মধুর এবং সফল করার বিভিন্ন কলাকৌশল, সত্য ঘটনা অবলম্বনে কিছু গল্প-উপাখ্যান ইত্যাদি আজকের যুগের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য অনুবাদিকা ক্ষেত্রবিশেষে মূল লেকচারের ভাবার্থ করেছেন। সেইসাথে, ক্ষেত্রবিশেষে লেখাকে প্রাঞ্জল এবং প্রাসঙ্গিক করার জন্য অনুবাদিকার নিজের জীবনের কিছু প্রতিফলন, শিক্ষা এবং বার্তা উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাদটীকার মাধ্যমে কিছু বিষয়ের আরো বিশদ বর্ণনা অথবা গবেষণার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এই বইয়ের মধ্যে যা কিছু ভালো এবং উত্তম সবই আল্লাহর তরফ থেকে এবং যা কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে সবই আমার ভুল এবং শয়তানের তরফ থেকে। প্রিয় পাঠক এবং বিজ্ঞজনেরা বইটিতে কোনো ভুলত্রুটি খুঁজে পেলে, আমাদের সংশোধন করে দিলে উপকৃত হব এবং অনেক কৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।

সূচনা

চলুন, সময়ের পর্দা তুলে ১৪শ' পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে চলে যাই। নিজেকে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কল্পনা করি, যাকে পাঠানো হয়েছে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।[১১]

সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার মতো গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর কাঁধে। মানুষের অপমান, কটুকথা, লাঞ্ছনা, নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে, নিজের পরিবার-পরিজনের বিপরীতে থেকে সত্য ধর্ম প্রচার করে যাওয়া নেহাত সহজ কাজ নয়। আমাদের বেপর্দা বান্ধবী অথবা আত্মীয়াদেরকে কেবলমাত্র পর্দার দাওয়াত দেয়ার সময় আমাদের কেমন লাগে? কোনো আন্টিকে গীবত করার সময় কায়দা করে থামিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে কতটা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়? এখন কল্পনা করুন, দিনের পর দিন রাতের পর রাত এমনি দায়িত্ব বৃহত্তর পরিসরে পালন করে গেছেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবী যদি আমাদের কথা শুনে দ্বীন চর্চার ব্যাপারে সচেতন না হয়, এটার জন্য আমার-আপনার যতটা কষ্ট লাগবে, তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি কষ্ট লেগেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে, তাঁর উম্মত হিদায়াত না পাওয়ার জন্য। তাঁর উম্মতের জন্য তিনি যেভাবে কাঁদতেন, সেরকম দরদের নজির আমরা আর কোথায় পাব?

তিনি ছয় বছর বয়সে তার মা-বাবা দুজনকেই হারান। এতিম একটা বাচ্চা ছেলে বড় হতে থাকে তাঁর দাদার কাছে। কয় বছর যেতে না যেতেই তাঁর দাদা আব্দুল

---

[১১] হে নবী, আমি আপনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া ২১ : ১০৭)

মুত্তালিব মারা যান। এরপর তিনি বড় হতে থাকেন তাঁর চাচার কাছে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনটা কঠিন এবং সংগ্রামের।

পরে যুবক বয়সে প্রিয়তমা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। খাদিজা রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের প্রতিটা পদে পদে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে পাশে থাকেন। মক্কার মুশরিকরা নানাভাবে কষ্ট দেয়। এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে। সম্পূর্ণ বয়কট বলতে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে সব রকমের বাণিজ্য, বিয়ের সম্পর্ক, আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

সেই পিতৃতুল্য চাচা আবু তালিব এবং প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা. মক্কার মুশরিকদের বয়কটের জুলুমের অধ্যায়ের পর পরেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান। খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা দুইজনই মারা যান। চোখের সামনে চাচা আবু তালিবকে তিনি কাফির অবস্থায় মারা যেতে দেখেন।[১২] কল্পনা করতে পারেন আমাদের কেমন লাগত আমরা যদি আমাদের প্রিয় বাবাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখতাম?

ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় তাঁকে সর্বপ্রকার আর্থিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিব এবং প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। পরপর তাদের দুজনের মৃত্যুতে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হন, তবু নিজের দায়িত্ব থেকে এতটুকু পিছপা হননি। একটু ভাবুন, কোথা থেকে প্রিয় রাসূল পেয়েছেন এমন উদ্যম? এই প্রশ্নটা মাথায় রেখে সামনে পড়ে যান ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় তিনি মক্কার বাইরে তাঈফ নামক এক শহরে গেলেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। এক বুক আশা নিয়ে তিনি তাঈফের গোত্র প্রধানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঈফবাসী আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর মেরে, রক্তাক্ত করে, পাগল আখ্যা দিয়ে, কটুকথা বলে, ঠাট্টা করে শহর ত্যাগে বাধ্য করল।

---

[১২] চাচা আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপত্তা দিলেও তিনি নিজে কখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।

আপনি নিজেকে সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় কল্পনা করুন যিনি তাঁর ছয়টি সন্তানের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশাতেই পাঁচজনকে কবর দিয়েছেন এবং নিজের দুধের শিশুকে কবরে শোয়ানোর বেলায় বলেছেন,

> 'আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হবে, আমার অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে, কিন্তু মুখ এমন কিছু বলবে না যাতে আমার রব অসন্তুষ্ট হন।'

আপনি হয়তো ভাবছেন, নামাজে মনোযোগী হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করার কথা! তাহলে কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের ঘটনাগুলো নিয়ে এত কথা বলছি?

চলুন একটু আগে করা প্রশ্নটির কাছে ফিরে যাই। আচ্ছা, কখনো কল্পনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে পেয়েছেন এরকম অকল্পনীয় মানসিক শক্তি? কীভাবে দিনের পর দিন এরকম দৃঢ় প্রত্যয় এবং ধৈর্য নিয়ে একজন মানুষ গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে গিয়েছেন? কখনো কল্পনা করে দেখেছেন কীভাবে একজন মানুষ জাজিরাতুল আরব থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে দিলেন? মূর্খ বেদুইনদেরকে পৃথিবীর বুকে হাঁটা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত করলেন? কোথা থেকে পেয়েছেন তিনি এরকম মানসিক শক্তি, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা?

তিনি কি কখনো ভয় পাননি? হতাশ হননি? পিছপা হননি?

যখন জিবরীল আলাইহিস সাল্লাম তার স্বরূপ দেখিয়ে ৬শ' ডানা[১৩] মেলে নবীজির কাছে নবুওয়াতের জন্য আসেন, সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং চিন্তিত অবস্থায় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে আসেন। এসে তিনি বারবার বলছিলেন,

---

[১৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরিশতা জিবরীলকে তার প্রকৃত অবয়বে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, জিবরীল আলাইহিস সালামের ৬০০ ডানা, এবং প্রতিটি ডানা দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছেয়ে যায়। তার ডানাগুলো থেকে মুক্তো, মানিক এবং রত্ন ঝরে পড়ছিল এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। (আল-মুসনাদের বর্ণনা থেকে ভাবানুবাদ করা হয়েছে)

‘আমাকে আবৃত করো! আমাকে আবৃত করো!’

আমাদের প্রিয় এই মানুষটিও তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন। তখন তাঁর উপরে কোন সূরা নাযিল হলো জানেন? সূরা মুজাম্মিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে সেই আয়াতগুলো জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ
مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا
سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا
وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ
اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

> ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! রাতে নামাজে দাঁড়াও, তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে, রাতের অর্ধেক (সময় দাঁড়াও) কিংবা তার থেকে কিছুটা কম করো, অথবা তার চেয়ে বাড়াও, আর ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ করো। আমি তোমার উপর গুরুভার কালাম নাযিল করব (বিশ্বের বুকে যার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অতি বড় কঠিন কাজ)। বাস্তবিকই রাত্রি জাগরণ আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। দিনের বেলায় তোমার জন্য আছে দীর্ঘ সন্তরণ। কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হও। [১৪]

রব তো তাঁর বান্দাকে সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন যে, তাঁর নবীর এই কঠিন মিশনে ঈমানী শক্তির জ্বালানি হিসেবে কোন ইবাদতটা সবচেয়ে বেশি কাজ করবে। **সারাদিনের ক্লান্তি, দুঃখ, হতাশা, দুশ্চিন্তা, প্রিয়জন হারানোর বেদনা এসব কিছুই প্রশমিত করবে সালাত তথা একাগ্রচিত্তে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে রবকে স্মরণ করা।**

---

[১৪] সূরা মুযযাম্মিল ৭৩ : ১-৮

যখন আমরা আমাদের প্রিয় মানুষকে হারাই, আমরা কয়জন জায়নামাজের দিকে ছুটে যাই? আমাদের শেষ কবে মনে হয়েছিল যে, নামাজকে আমি আমার সমস্যা সমাধানের অংশ হিসেবে দেখতে পারছি?

অথচ আমরা করি উল্টো! মন খারাপ তো নামাজ বাদ। ভালো লাগছে না তো নামাজ বাদ। কেউ একজন দুঃখ দিয়েছে তো নামাজ বাদ। অফিসে তাড়া আছে তো নামাজ বাদ। এক কথায় কোনো সমস্যা এলে প্রথম যেটা বাদ পড়ে যায় সেটা আমাদের নামাজ।

আমরা যখন প্রচণ্ড দুঃখে কাঁদতে থাকি, অথবা প্রচণ্ড হতাশার অন্ধকারে চলে যাই; তখন অনেক রকমের সমাধানের পথ মাথায় চট করে চলে আসে। কেউ বলে, ডাক্তার দেখাও, ভালো খাওয়াদাওয়া করো, মেডিটেশন করো, কিন্তু কেউ কি কখনো বলে যে, **"সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাচ্ছ না? তাহলে ওযু করে পবিত্রতার সাথে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে রবের সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাও?"**

আমরা কিছু সংখ্যক মানুষ নামাজ পড়লেও আমাদের নামাজগুলোর মধ্যে বিরাট শূন্যতা রয়ে যায়। নামাজ আমাদের হাত-পায়ের পেশী নড়াচড়ার অনুশীলনীতে পরিণত হয় মাত্র, এর মাধ্যমে মানসিক শক্তি পাওয়ার আশা অনেক পরের কথা। এর একটা বড় কারণ, আমরা আমাদের নামাজে আল্লাহর সাথে সংযোগ করতে পারি না। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সেই সম্পর্কের মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। কারণ, আমরা নামাজে যে কী বলছি সেটাই আমরা জানি না। ইনশাআল্লাহ, আমরা এই বইয়ের পরবর্তী আলোচনাগুলোর মাধ্যমে সেগুলো বিস্তারিত জানার এবং বোঝার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

এবং আমরা যেন এই শিক্ষাগুলো শক্তভাবে জীবনে আমল করার নিয়তে এই বইটা হাতে তুলে নিই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের তরফ থেকে এটা কবুল করে নিক। আমিন।

> এটা এমন একটা বই যার কাছে বারবার আপনাকে ফেরত আসতে হবে। এই বইটি অন্যান্য দশটা বইয়ের মতন একবার চোখ বুলিয়ে বছরের পর বছর ধরে বইয়ের তাকে তুলে রাখলে চলবে না! বরং এই বইটা থাকবে আপনাদের স্কুলব্যাগে, পার্সে, অফিসের ব্যাগে, গিফটের মোড়কে। ইনশাআল্লাহ এই বইটি আপনার কাছে পানি এবং অক্সিজেনের মতো

প্রয়োজন হবে ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে দৈনিক কয়েকবার করে বইটা নাড়াচাড়া করে নিবেন।

নামাজ দায়সারাভাবে করার মতন কোনো ইবাদত নয়। বরং নামাজ যেন আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি এবং বিষণ্নতার ওষুধে পরিণত হয়। নামাজ যেন আপনার অন্তর প্রশান্তকারী ইবাদত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার বাস্তবিক সমাধান হয়। নামাজ যেন আপনার দিনের সবচেয়ে সুন্দর পর্বে পরিণত হয়।

আপনার ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততিদের সবাইকে নিয়ে এই বইয়ের অধ্যায়গুলো ধরে ধরে নিয়মিত পারিবারিক তালিমে বসবেন, ইনশাআল্লাহ। তাহলে আপনার জন্যও রব্বুল আলামিন এটা সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করে নিবেন। আল্লাহুম্মা আমিন।

আপনার ভিতটা মজবুত আছে তো?

ধরুন, আপনি নিজের জন্য একটা বাড়ি বানাচ্ছেন। আপনার অনেক শখের বাড়ি। সে বাড়িটাকে বছরের পর বছর ধরে ঝড়, বৃষ্টি, টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাপিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন একটি মজবুত ফাউন্ডেশনের। বাড়ির ভিত্তি শক্তিশালী হলে, গোটা বাড়িটা শক্তিশালী ও নিরাপদ থাকবে।

ধরুন, আপনি বাড়িটা তৈরীর সময় ভিত্তির দিকে খুব একটা খেয়াল করলেন না। বরং সেই বাড়ির দেয়ালের রং কী হবে, কয়টা বেডরুম থাকবে, বারান্দা এবং জানালাগুলো কোন দিকে হবে, দরজাটা কোন কাঠের হবে ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর শ্রম দিচ্ছেন এবং মাথা ঘামাচ্ছেন। এভাবে অনেক সময় এবং শ্রম দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাড়িটাকে দাঁড় করালেন। কয়েকদিন পরই সেই বাড়ি ঝড়ো হাওয়ায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কেমন লাগবে আপনার তখন?

আমাদের—মুসলিমদের জীবনের শক্ত ভিত্তিটা হচ্ছে আমাদের নামাজ। অথচ আমরা যেন সেই বোকা বাড়িওয়ালার মতো যিনি তার বাড়ির শক্ত ভিত্তির কথা ভুলে গিয়ে এদিকে-ওদিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় এবং শ্রম নষ্ট করেছে। দিনশেষে যখন আমাদের দুর্বল ভিত্তির জন্য জীবনে ব্যর্থতার কালো ছায়া নেমে আসে, তখন ভেবে পাই না যে, আমাদের ভুলটা কোথায় ছিল? অথচ আমরা এ কথা ভাবতেও চাই না যে, আমাদের ভিত্তিটাই ছিল নড়বড়ে!

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচ জিনিসের উপর,

(১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়া।
(২) নামাজ কায়েম করা।

(৩) যাকাত আদায় করা।
(৪) হজ করা।
(৫) রমাদান মাসের রোজা রাখা।[১৫]

অর্থাৎ ঈমান আনার পর একজন মানুষের উপর প্রথম যেটি পালন ফরজ হয়ে পড়ে সেটি সালাত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে তার নামাজ। সুতরাং যদি তার নামাজ সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামাজ) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[১৬]

সুবহানআল্লাহ! আমরা তৈরি আছি তো কিয়ামতের দিন আমাদের রবের সামনে এই নড়বড়ে ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে?

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের সময় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন,

> 'হে বিলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে আমল করেছ তার কথা আমাকে বলো। কেননা, জান্নাতে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।' বিলাল রা. বললেন, 'দিন বা রাতে যখনই আমি ওযু করি, তখনই আমি সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ পড়ি।[১৭] এছাড়া আর তেমন কিছুই করি না।'[১৮]

সুবহানআল্লাহ! ওযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের মতো একটা ছোট্ট অভ্যাস। এটাই তাকে সমুন্নত মর্যাদা দান করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন! সুবহানআল্লাহ!

---

[১৫] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৮; সহীহ মুসলিম , হাদিস নং ১২২

[১৬] আবু দাউদ ৮৬৪

[১৭] তাহিয়্যাতুল ওযু

[১৮] সহীহ বুখারী ১০৮৩

যদি কারো জীবনের সবকিছু হারিয়ে যায় কিন্তু নামাজ ঠিক থাকে, তারপরও সে ব্যর্থ নয়। কিন্তু কারো জীবন থেকে যদি নামাজ হারিয়ে যায়, অন্য সব ঠিক আছে মনে হলেও এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর কী হতে পারে? আল্লাহর সাথে আপনার সেই সম্পর্কের শক্তি এবং সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য নামাজের থেকে মহৎ ইবাদত আর নেই। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম।

*****

একবার একটি দুর্দান্ত প্রজেক্টের উপর কাজ করছিলাম। নেট থেকে খুঁজে খুঁজে ভালো ভালো প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি বের করে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়াশোনা করছিলাম প্রজেক্টের অংশ হিসেবে। বেশ ভালোই কাজ চলছিল। হঠাৎ করে বাসার ওয়াইফাই কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওয়াইফাই কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই সবরকমের ওয়েবসাইট, ইউটিউব লেকচার এবং সোশাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো মুহূর্তের মধ্যে অকেজো হয়ে গেল। মোটামুটি বেকার অবস্থায় কম্পিউটারের সামনে পড়ে আছি।

ঠিক তখনই ওয়াক্তের আযান শুনতে পেলাম। সুবহানআল্লাহ, সেই মুহূর্তে আমাকে একটা উপলব্ধি ভীষণভাবে নাড়া দিল যে, আমার সাথে আমার রবের সম্পর্কটা যেন অনেকটা এই **"ওয়াইফাই"** কানেকশনের মতন। সেটা যদি ঠিক থাকে, তাহলে জীবনের বাকি সমস্ত সম্পর্কগুলোও ঠিক থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমার এই সম্পর্কতে ঘাটতি পড়ে, তাহলে সেটার প্রতিফলন জীবনের অন্যান্য সম্পর্কগুলোতেও পড়বে। এই উপলব্ধিটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যিনি তাওফিক দিয়েছেন উপলব্ধি করার! সাময়িকভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াটাও যেন আমার জন্য একটা নিয়ামতস্বরূপ!

*****

আপনার-আমার জান্নাতের বাড়ির ভিতকে মজবুত করার কাজটি প্রতিনিয়ত করে যেতে হবে। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই ভিত মজবুতীকরণ এমন কোনো কাজ নয় যা হুড়মুড় করে কোনোমতে একবার করলাম এবং পর মুহূর্তেই

সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছে গেলাম। বরং এটি একটি পরিচর্যার ব্যাপার এবং এই যাত্রা সারাজীবনের। আপনার এই সফরে বইটির পরবর্তী অধ্যাগুলো সঙ্গী হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। যখনই নামাজের মাধুর্যে ভাটা পড়বে, তখনই বইটা হাতে তুলে নিবেন। আপনার ভিত্তিটা মজবুত করার জন্য এবং আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মূল সংযোগকে স্থিতিশীল করে নেয়ার জন্য।

দুনিয়াতে বাড়িঘর সব ভেঙে দেউলিয়া হয়ে গেলেও একটা না একটা আশা থাকে আবার নিজেকে গড়ে তোলার। কিন্তু আখিরাতে যদি আমরা দেউলিয়া হয়ে যাই, তাহলে সেই জায়গা থেকে ফেরত আসার আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে আমাদের নামাজের মাধ্যমে তাঁর সাথে একটা শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার তাওফিক দিন; যা আমাদের দুনিয়াকে করবে কল্যাণকর এবং আখিরাতকে করবে সফল, ইনশাআল্লাহ।

নামাজ কি আপনার বিষণ্ণতার ওষুধ?

আপনাদেরকে আমার প্রাণের বান্ধবী ফারিয়ার (ছদ্মনাম) গল্প বলি। সেদিন ফারিয়ার পাশে বসে ক্লাস করছিলাম। আমাদের দুজনকে প্রায় সময়েই একসাথে দেখা যায়। অনেকটা মানিকজোড় বলতে পারেন। আমি খেয়াল করছি যে, কদিন ধরে ফারিয়ার মনটা খুবই খারাপ। ও ক্লাসে আসতে চাচ্ছিল না। কিছুটা জোর করেই ক্লাসে নিয়ে এসেছি।

ফারিয়ার আম্মুর চেহারাটা অসম্ভব মায়াবতী। প্রচণ্ড সহজ-সরল মনের একজন মানুষ! শরীরটা জীর্ণশীর্ণ কাপড়ে মোড়ানো, কিন্তু মুখে অনেক বড় একটা হাসি। ফারিয়ার আম্মু তার বিবাহিত জীবনে কখনো সুখী হতে পারেননি। ফারিয়ার আব্বু রাত-বিরাতে মদ খেয়ে বাসায় ফিরত এবং ওর আম্মুকে বেধড়ক পেটাত। ফারিয়া এখনও রাতে ঘুমাতে পারে না। ঘুমালেই তার মধ্যে একটা অদৃশ্য আতঙ্ক কাজ করে! এই বুঝি আম্মুর চিৎকার এবং কান্নার আওয়াজ শুনতে পাবে।

ফারিয়া বেশ কয়েকবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজের মাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু মদ খাওয়া মাতাল বাবা বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু হারিয়ে নিজের মেয়ের গায়ে হাত তুলতে এতটুকু দ্বিধা করেনি।

*****

গত দুই মাস ধরে ফারিয়ার আম্মু-আব্বুর ডিভোর্সের প্রসেসিং চলছে। এত কিছুর পরেও ফারিয়ার আম্মু সহজে ডিভোর্স দিতে তৈরি ছিলেন না। ডিভোর্স দিলে ফারিয়ার আব্বু মায়ের কাছ থেকে তার দুই ছেলেকে কেড়ে নিবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। ফারিয়ার আব্বু এলাকার অন্যতম প্রতাপশালী ধনী ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে, ফারিয়ার আম্মু অসহায় এবং তার তেমন কোনো আর্থিক, পারিবারিক

সমর্থন অথবা ক্ষমতার দাপট নেই। সেদিক থেকে চিন্তা করে ফারিয়ার আম্মু সন্তান হারানোর ভয়ে সব রকমের নির্যাতন সহ্য করেও তার বাবার সংসারটা করে গিয়েছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমানবিক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ফারিয়া নিজেই একজন আলিমের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীয়তভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মাকে বোঝানোর এবং শান্ত করার চেষ্টা করে। ফারিয়া কিছুতেই তার মাকে একাকী অবস্থায় ফেলে কোথাও যাবে না। নিজের মাকে এভাবে প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়ে, ধুঁকে ধুঁকে পরাজিত হবার দৃশ্য দেখে যাওয়াটা একজন সন্তানের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট!

*****

ফারিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ভাবনার জগতে ডুবে গিয়েছি যে হুট করে খেয়াল হলো, ক্লাসের নির্ধারিত বেঞ্চে ফারিয়াকে দেখা যাচ্ছে না! ! ওমা মেয়েটা কোথায় গেল! এমন একটা নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে মেয়েটাকে একা একা ছাড়তে মন চায় না। ক্লাসের লেকচার শেষ হতে তখনও দশ মিনিট বাকি। এই দশ মিনিট যেন শেষ হচ্ছে না। খুব পণ্ডিতি করে মেয়েটাকে ভার্সিটিতে নিয়ে আসলাম আর এখন নিজেই ওকে খুঁজে পাচ্ছি না!

লেকচার শেষ হতেই আমি হন্তদন্ত হয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলাম। এখানে খুঁজি! সেখানে খুঁজি! কিন্তু তার তো খবর নেই। এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! এভাবে টেনশন দেয়ার মানে হয়? একবার বলে গেলে কী হতো?

এই ভাবতে ভাবতে মেয়েদের কমন রুমের ভেতর উঁকি দিলাম। এই কমনরুমেই জায়নামাজ বিছিয়ে আমরা ওয়াক্তের নামাজগুলো আদায় করে থাকি। এবং সুবহানআল্লাহ! আমি দেখলাম যে এই কর্মমুখর মাঝ-দুপুরে কমন রুমের এক কর্নারে একটা জায়নামাজ বিছানো এবং সেখান থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। জায়নামাজে বসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহর সাথে একজন বান্দা একান্তে মনের কথাগুলো বলছে। সেই বান্দা আর অন্য কেউ নয়, আমার ফারিয়া।

এর থেকে আর কোনো ভালো উত্তম জায়গা কি ফারিয়ার জন্য থাকতে পারে? খুব সাবধানে নিজের চোখের পানিটা মুছে দরজার কোনা থেকে সরে আসলাম।

ওকে একান্তে ওর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন আল্লাহর কাছে রেখে দিয়ে ফেরত আসলাম। এর আগেও দেখেছি এই দৃশ্য। যখনই হতাশা জেঁকে ধরে এবং বিষণ্ণতায় হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, এমন প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় এই মেয়েটা ওযু করে, হাতমুখ ধুয়ে একটা পাটির জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

ঠিক যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষণ্ণতার ওষুধ ছিল নামাজ, ঠিক তেমনি তাঁর একজন নগণ্য অনুসারী ফারিয়াও বিষণ্ণতার ওষুধ হিসেবে নামাজকেই আঁকড়ে ধরেছে।

*****

একটু ভেবে দেখুন তো, শেষ কবে আপনি আপনার বিষণ্ণতার ওষুধ হিসেবে নামাজকে পছন্দ করেছিলেন? শেষ কোন দিনটি ছিল যেদিন আপনি আপনার কষ্টগুলো জায়নামাজে বসে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে অন্তরে অভূতপূর্ব প্রশান্তি লাভ করেছিলেন?

বিপদে পতিত হলে সর্বপ্রথম মাথায় কী আসে? কাউকে ফোন করব? না কি চুপ করে ঘরের কোনায় বসে থাকব? নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাব? না কি বিষণ্ণতা এবং দুশ্চিন্তা জেঁকে ধরার সুযোগ পাওয়ার আগেই ওযু করে জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে যাব? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে আমাদের —প্রতিটি মুসলিমের জন্য চিন্তার অনেক খোরাক আছে।

শাইখের জীবনের একটি সত্য ঘটনা

এক শুক্রবারের খুতবাতে শাইখ আব্দুল নাসির ‘জীবন্ত নামাজ’ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা বলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে আসেন এবং বলেন, যখন তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা এবং অভিভাবক চাচা আবু তালিব মারা যান, তখন তাঁর জীবনে নামাজ ছিল এক মহৌষধ এবং প্রচণ্ড মানসিক শক্তির উৎস।

সেদিন জুমুআর নামাজ শেষ হবার পরপরই এক ভাই শাইখের কাছে আসেন। ভাইটি কথা বলতে খুব ইতস্তত করছিলেন। শেষে সাহস করে বলেই ফেললেন, ‘শাইখ! আপনাকে কিছু বলতে চাই ... আজকে অনেক দিন পর মনে হলো, আমি সিজদায় প্রশান্তির প্রকৃত স্বাদ পেয়েছি।’ গত কাল রাত পর্যন্তও এই ভাইটির কাছে নামাজকে অনর্থক মনে হতো...! আস্তাগফিরুল্লাহ!

এরপর তিনি তার জীবনের একটি করুণ সত্য ঘটনা শাইখের সাথে শেয়ার করেন।

সে এক ভয়াবহ বিকালের কথা! যেদিন তিনি বাসায় ফিরে দরজাটা খোলার সাথে সাথে তার মনে হলো যেন কিছু একটা ঠিক নেই! তিনি ঘরের ভেতরে কয়েক কদম এগিয়ে যান কিন্তু তার স্ত্রীর কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পান না। বেডরুমের কিছুটা কাছে যেতেই তার বাচ্চার কান্নার আওয়াজটা তার কানে জোরালো হয়ে ওঠে। এবং পাশেই বিছানায় স্ত্রীকে অদ্ভুতভাবে শুয়ে থাকতে দেখেন। হঠাৎ তার বুকটা ধক করে ওঠল! স্ত্রীর কাছে এসে হাতের পালস চেক করতে গিয়ে তিনি টের পেলেন, তার স্ত্রী আর এই পৃথিবীতে নেই! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। নববিবাহিত দম্পতির সংসারে কেবলই

নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে দুই মাস আগে আলহামদুলিল্লাহ। বেশ নামকরা একটি হাসপাতালে শিক্ষানবিশ ডাক্তার হিসেবে কাজ শুরু করেছেন ভদ্রলোক! নতুন বিয়ে করলেন, সংসার গোছাচ্ছেন! তার সামনে কত স্বপ্ন! সুবহানআল্লাহ! চোখের সামনে সব স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে গেল!

তার স্ত্রীর মরদেহ এবং এমন আকস্মিক মৃত্যু তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দিল। তিনি ভাবতে শুরু করেন যে, এই সৃষ্টিকর্তার প্রতি সিজদা অবনত হয়ে তিনি জীবনে কী পেলেন? তার স্ত্রীকে হারালেন। তার সন্তান মা হারা হলো। মায়ের আদর ছাড়া সে অবহেলায় বেড়ে উঠবে। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে একটা লম্বা সময় পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের হননি। নামাজ পড়তে পারেননি। সিজদা দিতে পারেননি। জীবনের সবকিছু কেমন অনর্থক এবং ঘোলাটে মনে হতে থাকে।

এক বন্ধুর অতিরিক্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলতেই যেন আজকে এতগুলো বছর পর তিনি জুমুআর নামাজ পড়তে মসজিদে আসতে বাধ্য হন। এবং আজকের খুতবায় স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে হারানোর গল্প শোনেন। তিনি জানতে পারেন যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরও কীভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তি নিয়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সামনে এগিয়েছেন! তিনি রক্তাক্ত হয়েও, মানুষের অপমান, ঠাট্টার পরেও তিনি আল্লাহর ইবাদত থেকে পিছপা হননি! অবশেষে এই ভীষণ বিষণ্ণতার সময়ে তাকে উপহারস্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামিন মিরাজের জার্নিতে সাত আসমানের উপরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উপহার পান। নামাজ এই উম্মতের জন্য সাত আসমানের উপর থেকে আসা অনন্য উপহার!

বয়ানে উল্লিখিত এই ঘটনাগুলো ভাইয়ের জীবনের কঠিন প্রশ্নগুলোকে সহজ এবং অর্থবহ করা শুরু করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিঃসঙ্গতার কাছে নিজের নিঃসঙ্গতাকে তুচ্ছ মনে হয়। তিনি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে শাইখকে ধন্যবাদ দেন এবং মনে মনে ঠিক করে ফেলেন যে, আজকে থেকে নামাজই হবে তার বিষন্নতার ঔষধ, এই শূন্যতার পরিপূরক।

রবের কালামের ছোঁয়ায় নামাজ

সূরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, বিশ্বাসীরা অবশ্যই বিজয়ী হবে! বিজয়ী তারাই যারা নামাজে বিনম্রতা অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

> "মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।"[১৯]

সূরা আল মুদ্দাসসিরে আল্লাহ তাআলা সেই সকল মানুষদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা জাহান্নামে পতিত হয় এবং তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে কী তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে আসলো? তখন তারা উত্তরে অনেকগুলো কারণের সাথে প্রথম যে কারণটি উল্লেখ করবে সেটাই নামাজ সংক্রান্ত। তারা বলবে যে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না যারা নামাজ আদায় করত! সুবহানআল্লাহ!

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

> "কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, 'আমরা নামাজ আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।'"[২০]

সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, বান্দারা যেন

---

[১৯] সূরা মুমিনুন ২৩ : ১-২

[২০] সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ : ৪২-৪৩

গুরুত্বের সাথে তাদের নামাজের হিফাজত করে।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

> "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"[২১]

সূরা ত্বহার ১৪ নম্বর আয়াতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকপাত করা হয়। এই পৃথিবীর একজন মানুষ, বান্দা এবং নবী তার স্রষ্টা, মহাপরাক্রমশীল আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেন! মুসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড় থেকে আল্লাহর সাথে সরাসারি কথোপকথনের বিবরণ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে নিজের পরিচয়টা জোরালোভাবে তুলে ধরেন এবং এর পরপরই আদেশ করেন, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর স্মরণকে জাগরূক রাখতে।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

> 'প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, কাজেই আমার ইবাদত করো, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো।'[২২]

দুনিয়াতে ভক্তরা যখন তাদের সেলিব্রিটির সাথে দেখা করেন, তারা কতরকমের পাগলামি করেন বলুন তো? একটা সেলফি তোলার জন্য অজ্ঞান হয়ে যান! অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য ঘণ্টা পার করে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে! অনেকে তো আবেগে কেঁদেই দেন! ঐ মুহূর্তে মনে হয়, তাদের সাথে একটু কথা বলতে পারাটা যেন জীবনের সার্থকতা! সুবহানআল্লাহ! আমাদের রব আল্লাহর চেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্তা আর কেউ কি আছেন? সেই আল্লাহর সাথে সরাসরি আলাপ করার অনুভূতিটা কেমন হতে পারে কল্পনা করে দেখুন তো?

হাতে অল্প সময়, কিন্তু ইচ্ছা করবে যেন অনন্তকাল আল্লাহর সাথে কথা বলে যাই! সেই অল্প কিছু মুহূর্তের কথোপকথনের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালামকে

---

[২১] সূরা বাকারা ২ : ২৩৮

[২২] সূরা ত্বহা ২০ : ১৪

আল্লাহ তাআলা সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন! বিশ্বজাহানের রবের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের আলাপনের মধ্যে অবশ্যই নামাজের উল্লেখ থাকে! এবং পরবর্তী সময়ে যখন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের ভ্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান সেখানেও রবের সান্নিধ্যে তাঁদের মিটিং এর পর পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ দেন। সালাত হচ্ছে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত! সুবহানআল্লাহ!

সূরা মারইয়ামের ৩১ নম্বর আয়াতে আমরা দেখি যে শিশুপুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে যখন তার মা মারইয়ামের হয়ে কথা বলছিলেন, তিনিও তখন নামাজের উল্লেখ করে বলেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

> "শিশুটি বলে উঠল, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আর আমাকে নামাজ ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি।'"[২৩]

সুবহানআল্লাহ!

সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিবলা পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনাটি আলোকপাত করেন। এ সময় সাহাবীরা চিন্তিত হয়ে যান যে, তারা এতদিন ধরে যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়ে এসেছেন, সেটা আদৌ গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না! তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য এই আয়াতে বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ

---

[২৩] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৩০-৩১

إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

> "...এবং কখনোই না! আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবার নন, কারণ তিনি নিশ্চয়ই পরম দয়ালু এবং মমতায় পরিপূর্ণ।"[২৪]

এখানে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষণীয়! প্রিয় পাঠক, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! এবার মনোযোগ বাড়িয়ে দিয়ে বাকি অংশ পড়ুন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আয়াতে উল্লেখ করতে পারতেন যে, **"আমি তোমাদের 'নামাজ' নষ্ট হতে দিব না।"** অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের পরে তোমাদের পূর্বের নামাজের নেকীগুলো নষ্ট হবে না। কিন্তু দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বরং বলছেন যে, আমি তোমাদের **"ঈমানকে"** নষ্ট হতে দিব না! সুবহানআল্লাহ! এখান থেকে আমরা একটা গভীর উপলব্ধির বার্তা পাচ্ছি যে, নামাজ সঠিক থাকার অপর নাম যেন ঈমান সঠিক থাকা। নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অপর অর্থ যেন ঈমানের নষ্ট হয়ে যাওয়া; আল্লাহু আকবার!

সালাতের অবস্থান আল্লাহ তাআলার কাছে কোথায় তা বোঝার জন্য এই আয়াতটা বোঝা জরুরী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

> 'বলো, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'[২৫]

জীবন-মৃত্যু এগুলো অনেক বড় বিষয়। কিন্তু প্রথমে আল্লাহ উল্লেখ করলেন কীসের—সালাতের! আমি ভেবেছিলাম সালাত আসবে সবার শেষে। এই জীবন তো আল্লাহরই দেয়া আর সালাত তো জীবনেরই অংশ। কিন্তু না! সালাত প্রথমে। জীবন-মরণ আসছে পরে। সুবহানআল্লাহ! দেখেছেন, আল্লাহর কাছে সালাতের অবস্থান কোথায়?

নামাজ অনেকটা বাধার মতো আপনার প্রতিদিনের রুটিনে। অনেক জরুরী কাজ আপনাকে সম্পন্ন করতে হয়। নামাজটা শুধু মাঝখানে চলে আসে। কিন্তু

---

[২৪] সূরা বাকারা ২ : ১৪৩

[২৫] সূরা আনআম ৬ : ১৬২

চরম সত্য হলো, আমাকে-আপনাকে নামাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে ভাই/(বোন)। আপনার জীবন-মরণ উল্লেখের আগে আল্লাহ তাআলা সালাতের উল্লেখ করেছেন। সালাতের জন্যই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নবী-রাসূলদের প্রতি প্রথম আদেশ ছিল এটাই। আমরা মনে করি, নবী-রাসূল তো হচ্ছেন তারা, যারা মানুষকে শুধু আল্লাহর পথে ডাকবেন। সূরাতুল মুদ্দাসির থেকে আমাদের এই বুঝ হয়। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾

> "হে চাদরাবৃত। যাও, মানুষদেরকে সতর্ক করো।"[২৬]

কিন্তু সূরা মুদ্দাসির এর আগে সূরা মুযযাম্মিল। আর সূরা মুযযাম্মিলে প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী করতে বলা হয়েছে? সালাত পড়ার জন্য। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

> "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন (সালাত পড়ুন) কিছু অংশ বাদ দিয়ে।"[২৭]

সবার প্রতি নসিহা হলো, দেরিতে ঘুমাতে যাবেন না। দেরিতে ঘুম থেকে উঠবেন না। সারারাত ল্যাপটপে, মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকবেন না যদিও সেটা ইসলামিক লেকচার হয়। কারণ, এভাবে আপনারা ফজর মিস করে ফেলবেন। এটা কোনো ইসলামিক জীবনাদর্শ হলো না।

নামাজের যত্ন নিন। স্পেশালি ফজর নামাজের যত্ন নিন। ফজরের কুরআন আপনার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে কাল কিয়ামতের ময়দানে। এটার সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। আল্লাহ নিজেই সাক্ষী থাকবেন সাথে ফিরিশতারাও! যারা আপনার কাজ-কর্মের হিসেব লিপিবদ্ধ করছেন, তারা সবাই আপনার এই কুরআন পাঠের সাক্ষ্য দিবেন।

---

[২৬] সূরা মুদ্দাসির ৭৪ : ২

[২৭] সূরা মুযযাম্মিল ৭৩ : ১-২

আল্লাহ নিজেই ফজরের কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এমনটা বলেছেন। আল্লাহ বলেন—

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

> সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, আর ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন করো), নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের কুরআন পাঠ (ফিরিশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।[২৮]

কীভাবে আপনি ফজরে উপস্থিত থাকবেন? তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবার অভ্যাস দ্বারা। কীভাবে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবেন? রাতে বিভিন্ন ভিডিও দেখা বন্ধ করুন। যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন, সেগুলোকে পরেরদিনের জন্য রেখে দিন। ব্যস্ততা থাকবেই। সেটাকে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে দ্বার করাবেন না। এশার সালাতের পর সব কাজ বন্ধ করুন। ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠুন। এশার সালাত সময়মতো জামাতে পড়ুন। এভাবে শুরু করুন। মসজিদের প্রত্যেক ওয়াক্তের জামাত ধরুন।

অন্তত পক্ষে ফজর এবং এশা জামাতে পড়ুন। আপনি ফজর এবং এশা মসজিদে আদায় করতে পারলে অন্য নামাজগুলো মসজিদে আদায় করা সহজ হবে। আর যদি না পারেন, তাহলে এটাই আপনার কাজ। এটা নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঐসব মানুষে পরিণত হওয়া থেকে দূরে রাখুন, যাদের কাছে সালাত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

---

[২৮] সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭ : ৭৮

খুশু কী?

নামাজে মনোযোগী হবার যেকোনো আলোচনায় এই কথাগুলো আমরা সচরাচর শুনে থাকি, 'নামাজে খুশু আনা চাই! আমাদের নামাজে খুশু নেই কেন?' এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'খুশু' মানে কী?

খুশুর শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি অন্তরের ভেতর এমনভাবে ঢুকে যাওয়া যে তার বহিঃপ্রকাশ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও প্রকাশ পাবে।'

কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় 'খুশু' শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূরা হাশরের ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন,

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি আল্লাহর ভয়ে তাকে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে। এসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা (নিজেদের ব্যাপারে) চিন্তাভাবনা করে।"[২৯]

এখানে পাহাড়ের 'বিনয়-নম্রতা ঝুঁকে চূর্ণ-বিচূর্ণ' হয়ে যাওয়াকে আরবীতে **'খশিয়া'** শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, যেটা খুশু শব্দেরই একটা রূপ।

তাহলে নামাজে খুশু আসা বলতে আমরা বুঝব, 'এমন গভীর মনোযোগ এবং বিনয় নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা বান্দাকে নামাজের মধ্যে স্মরণ

---

[২৯] সূরা হাশর ৫৯ : ২১

করা উচিত যে, অন্তরের বিনম্রতা তার শরীরের ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাবে! অর্থাৎ শরীর কেঁপে উঠবে, অথবা শরীর একদম নিথর হয়ে যাবে আল্লাহর কথা ভাবতে ভাবতে, অথবা আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হয়ে চোখ থেকে পানি পড়তে থাকবে।'

সাহাবায়ে কেরামগণ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করতেন। শত্রুর নিক্ষিপ্ত তিরও তাদের নামাজের মনোযোগে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত না। এ সম্পর্কে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে—

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ঐ মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজির কোনো সাথীর রক্তপাত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। এরপর সে মুসলিম বাহিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, 'এমন কে আছো যে আমাদের পাহারা দিবে?' জবাবে মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। নবীজি বললেন, 'তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় সতর্ক থাকো।' নির্দেশমাফিক দুজনই গিরিমুখে পৌঁছালেন। একটা পর্যায়ে মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারি সাহাবী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে মশগুল হন। একটা বিপদ হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই ঐ মুশরিক লোকটি সেই গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে মুসলিম আনসারিকে দেখেই চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তা প্রহরী। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা সেই মুশরিক ব্যক্তি তাই দেরি না করে নামাজরত মুসলিম আনসারির প্রতি তির নিক্ষেপ করল। তিরটি তার দেহে বিঁধে গেল। সাহাবী বিঁধে যাওয়া তিরটি তার শরীর থেকে বের করে নিলেন এবং নামাজ অব্যাহত রাখলেন।

শত্রু এতে ক্ষান্ত হলো না। একে একে তিনটি তির নিক্ষেপ করল। ঐদিকে নামাজরত সাহাবী ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেই সালাত শেষ করে ঘুমন্ত সাথিকে জাগালেন। ঘুমন্ত সাহাবী জেগে ওঠেন। মুশরিক লোকটি আরেক মুসলিমকে সজাগ দেখে এবার ভয়ে পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীকে

রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বললেন,

> 'সুবহানআল্লাহ! প্রথম তির নিক্ষেপের পরই আপনি আমাকে সতর্ক করলেন না কেন?'

তিনি বললেন,

> 'আমি সালাতে এমন একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' [৩০]

কল্পনা করা যায় একজন ব্যক্তি তার নামাজ পড়ার আনন্দে কতটা মগ্ন থাকলে তিরবিদ্ধ হওয়ার প্রচণ্ড আঘাতও সেই তৃপ্তিকে পরাভূত করতে পারে না? রক্তাক্ত হওয়ার পরেও তিনি নামাজ জারি রেখে যেতে পারেন? অনেকে ভাবতে পারেন, এটা বুঝি বেশ প্রান্তিক উদাহরণ হয়ে গেল। অথচ আমরা নিজেদেরকে এই সুযোগে প্রশ্ন করি, কীভাবে জগৎ সংসারের সবচেয়ে তুচ্ছ বিষয়গুলোও আমাদের মনকে আমাদেরকে নামাজ থেকে সরিয়ে নেয়?

আরেকটি গল্প শুনুন। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। একজন বিখ্যাত সাহাবী। নামাজের প্রতি ছিল তার মনে গভীর ভালোবাসা। একবার বাগানে নামাজ পড়তে গিয়ে মনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগানটিই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বকর রা. বলেন,

> "আবু তালহা আনসারি রা. একবার তার এক বাগানে নামাজ শুরু করেন। একটু পর একটি ছোট্ট পাখি উড়তে শুরু করল। বাগান এত ঘন ছিল যে ক্ষুদ্র পাখিটিও বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল। ফলে তিনি কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর যখন নামাজে মনোযোগী হলেন, তখন তার অবস্থা হয়েছে বেগতিক! কারণ তিনি আর কিছুতেই স্মরণ করতে পারছেন না নামাজের কততম রাকাত আদায় করেছেন। ভীষণ অনুতাপ জাগে তার মনে। তীব্র পরিতাপ নিয়ে বলছিলেন, 'যে মাল আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছে, তার একটা বিহিত করতে হবে।' দেরি করেননি তিনি। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

[৩০] সুনানে আবু দাউদ ১৯৮

> খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তিনি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তা বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এই মাল আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করছি। আপনি যেখানে পছন্দ তা ব্যয় করুন।'" [৩১]

সুবহানআল্লাহ! আমাদেরকে তো নামাজের জন্য নিজেদের সম্পত্তি ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে না! তবে আমরা কি পারি না, নিজেদের ছোটখাটো বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে? যে ফেসবুক, ফোনের নেশার চিন্তা নামাজে আমাদেরকে বুঁদ করে রাখে, সেগুলো ত্যাগ করে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার করতে? এটা তো নিজের সহায় সম্পত্তি বিলিয়ে দেয়ার তুলনায় সহজ হওয়ার কথা, না কি? এতটুকু চেষ্টা তো আমরা করতেই পারি।

নামাজে খুশু পাওয়াটা স্রেফ একটা বিলাসিতা নয় বরং এটা একটি প্রয়োজনীয়তা। নামাজকে জীবন্ত রাখতে খুশুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গুরুত্ব নিয়ে খুশু অর্জনের চেষ্টা করে যেতে হবে। নামাজের ব্যাপারে শৈথিল্যতা, লোক দেখানোর জন্য দায়সারাভাবে "কোনোমতে" নামাজ আদায় করাটা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় এসেছে।

সূরা নিসার ১৪২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

> "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।"[৩২]

আল্লাহ যেন আমাদেরকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

খুশু একটি বিশেষ দক্ষতা, যেটা অনুশীলনী এবং মানসিক চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। খুশু অর্জনের কোনো ফাঁকিবাজি পদ্ধতি নেই। এটা এমন নয় যে,

---

[৩১] মুয়াত্তা ইমাম মালিক ২১৪

[৩২] সূরা নিসা ৪ : ১৪২

সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আর হুট করে আমি ঠিক করে ফেললাম যে, আজ থেকেই আমার জীবনে আমি খুশুসমৃদ্ধ নামাজ নিয়ে আসব! এভাবে চলবে না! এটি একটা অধ্যবসায়, অনুশীলনী এবং ধৈর্য ধরে লেগে থাকার বিষয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা খুশু অর্জনের জন্য সার্বিক অনুশীলনীগুলো ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

আযান—শাফায়াত লাভের হাতিয়ার

নামাজে মনোযোগী হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় আযানের মধ্য দিয়ে। আমরা মনে করি যে, "আল্লাহু আকবার" বলে জায়নামাজে দাঁড়ানো থেকে আমাকে মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু প্রকৃত সফল নামাজীরা আযান কানে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই খুশু অর্জনের মানসিক প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দেয়। যে ব্যক্তি আযান শুনবে এবং উত্তর দিবে, তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা আযানের সময় বেখবর থাকি।

আযানের শাব্দিক অর্থ আহ্বান করা, ডাকা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় আযান হলো,

> 'নির্দিষ্টি কিছু সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুন্নাহসম্মত শব্দমালা দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মানুষকে আহ্বান করা।'

আযান শোনার পর করণীয়

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, আযানের সময় চুপ থাকতে হবে এবং আযানের জবাব দিতে হবে। হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, আযানের জবাব দেয়া সুন্নত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আযানের উত্তরে আমরা কী বলব?

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'তোমরা যখন আযান শোনো, তখন উত্তরে তোমরা তা-ই বলো, মুয়াজ্জিন যা বলে।'[৩৩]

এ হাদিসে আযানের জবাবে যদিও হুবহু আযানের শব্দই আওড়ানোর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অন্য হাদিস দ্বারা ভিন্নতা প্রমাণিত হয়। আর জুমহুর উলামায়ে কেরামও বলেছেন,

> "আযানের জবাবে মুয়াজ্জিনের কথাগুলোই আওড়াবে, তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও হাইয়া আলাল ফালাহ' ব্যতীত। বরং এই দুই বাক্যের সময় 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে।"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যখন মুয়াজ্জিন বলে, 'আল্লাহু আকবার', তখন যদি তোমাদেরও কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার।' যখন বলে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন সেও বলে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' যখন মুয়াজ্জিন বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', তখন সেও বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' যখন বলে, 'হাইয়া আলাস সালাহ', তখন সেও বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' যখন বলে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ', সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' আবার যখন বলে, 'আল্লাহু আকবার', 'আল্লাহু আকবার', তখন সেও বলে, 'আল্লাহু আকবার', 'আল্লাহু আকবার।' আর যখন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন যদি সেও বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৪]

আরেকটি বর্ণনায় আছে, একবার মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান শুনে তাই বলছিলেন, উপর্যুক্ত হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[৩৩] বুখারী, হাদিস নং ৬১১, মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৩

[৩৪] মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৫

যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের পর জবাব দেয়া শেষে তিনি বলেন, 'এভাবে আযানের জবাব দিতেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[৩৫]

আযান শেষে করণীয়

আযানের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত প্রেরণ করা মুস্তাহাব। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবীজির মুখে শুনেছেন, নবীজি বলতেন,

> 'আযান শুনে উত্তরে মুয়াজ্জিনের মতো তোমরাও তাই বলো। আযান শেষে আমার উপর দরুদ পড়ো, কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন।'[৩৬]

আযান শেষে পাঠের জন্য একটি দুআও শিক্ষা দিয়েছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাথে ওয়াদাও করেছেন কিয়ামতের দিন দুআটি পাঠকারীর জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। কল্পনা করে দেখুন, যেই কিয়ামতের দিন নাজাত পাওয়ার জন্য ভিখারির মত সবাই ঘুরতে থাকবে, সেদিন এই ছোট্ট দুয়ার বদৌলতে আপনার ভাণ্ডারে থাকবে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত। কল্পনা করতে পারছেন? যেমন, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দুআ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।'[৩৭]

দুআ:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدتَّهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

---

[৩৫] আহমাদ, ৪/ ৯৮

[৩৬] মুসলিম, হাদিস নং ৩৮৪

[৩৭] তাবারানি

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রববা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্বা-ইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব্'আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ্, (ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং শাশ্বত নামাজের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো সুমহান মর্যাদা তথা জান্নাতের একটি স্তর এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করো জান্নাতের শ্রেষ্ঠ প্রশংসিত স্থানে তথা সকল সৃষ্টির উপর অতিরিক্ত মর্যাদা, যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছ। (নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।)

কিছু কিছু বর্ণনার শেষে অতিরিক্ত আছে, 'নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।' উল্লিখিত দুআর শেষে এই অতিরিক্ত অংশটুকু এসেছে বাইহাকীর বর্ণনায়। কাশমিহানীর বর্ণনা দ্বারা যদিও এই অংশটুকু প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো অতিরিক্ত এই বর্ণনাটুকু হাদিসের কিতাবসমূহে খুবই বিরল।

দুআ কবুল হয় আযানের পর

আযানের পরের মুহূর্তটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সময় দুআ কবুল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুয়াজ্জিনরা তো আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> 'শোনো; মুয়াজ্জিনরা যা বলে তুমিও তাই বলো। আর শেষে তুমি প্রার্থনা করলে তা কবুল করা হবে।'[৩৮]

সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'দুই সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।' কিংবা বলেছেন, 'খুব কমই

---

[৩৮] আবু দাউদ, হাদিস নং ৫২৪

> ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযানের সময়ের দুআ, প্রবল যুদ্ধের সময় যখন একজন আরেকজনের উপর আক্রমণ করে বসে।'[৩৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ব্যর্থ হয় না।'[৪০]

আযানের ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক

যারা আযান শুনতে পায়, জুমুআ ও জামাতে উপস্থিত হওয়া তাদের জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন;

> 'হে মুমিনগণ, যখন জুমুআর দিন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।'[৪১]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল,

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মসজিদে আসার ক্ষেত্রে আমার কোনো সাহায্যকারী নেই। কাজেই আমাকে বাড়িতে নামাজের অনুমতি দিন।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর সুযোগ দেন। লোকটি ফিরতে উদ্যত হলে নবীজি আবার ডেকে বললেন,

> 'তুমি কি নামাজের আযান শুনতে পাও?' লোকটা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে নবীজি বললেন, 'তাহলে তুমি এই ডাকের সাড়া দিবে।'[৪২]

---

[৩৯] আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫৪০

[৪০] আহমাদ, হাদিস নং, ১২২২৪, আবু দাউদ, ৫২১; তিরমিজি, ২১২

[৪১] সূরা জুমুআ ৬২ : ০৯

[৪২] মুসলিম, হাদিস নং ৬৫৩

আযান–গুনাহ মাফের উপায়

কোনো ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করলে তার ঐ কাজের জন্য একটি শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো উপায় রেখেছেন। কিছু কিছু উপায় আমাদের হাতে আছে যেমন তাওবা, ইস্তিগফার, ভালো কাজ করা, অন্যের জন্য দুআ করা ইত্যাদি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা অন্য মানুষদের অনুমতি দিবেন আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত তাঁর উম্মতের জন্য এবং তাঁর ইস্তিগফার তাঁর উম্মতের জন্য। এর জন্য তিনি যা করবেন, তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন আল্লাহ যেন তাঁর সমগ্র উম্মতকে ক্ষমা করে দেন।

আমরা কীভাবে নবীজির শাফায়াত পেতে পারি?

নবীজির সময়ে সাহাবীরা সরাসরি তাঁর কাছে যেতেন। কুরআনে এসেছে;

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

> "আর যদি তারা যখন নিজদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।"[৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে থাকার কারণে তাদের এই মহা সুযোগটা ছিল। সাহাবাদের এ সুযোগটা ছিল কিন্তু আমাদের তা নেই। বহু আশীর্বাদের দরজা তাদের জন্য খোলা ছিল। তার মাঝে অন্যতম হলো, ভুল কিছু করে ফেললে তারা সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলতে পারতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি অন্যায় করে ফেলেছি। দয়া করে আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।" আমাদের জন্য এই আশীর্বাদের দরজাটি খোলা নেই। আমরা তো তাঁর কাছে যেতে পারব না।

---

[৪৩] সূরা নিসা ৪ : ৬৪

যাই হোক, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমাদের আমলগুলো সোম এবং বৃহস্পতিবারে আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। যদি ভালো পাই, আমি আমার উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যদি বিপরীত পাই, আমি আল্লাহর কাছে উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[৪৪]

আর এটা সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাহাজ্জুদের নামাজে তাঁর উম্মতের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন।

আমরা আরো জানি, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দুআ প্রদান করা হয়েছে, যা কবুল করা হবে বলে তাঁদের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। নিজের জন্য কল্যাণকর কিছু প্রার্থনা করে সেই দুআটি সকল নবীই দুনিয়াতে ব্যবহার করে ফেলেছেন। কিন্তু, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি রেখে দিয়েছেন শেষ বিচারের দিনের জন্য। তিনি তাঁর উম্মতের শাফায়াতের জন্য এটি ব্যবহার করবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতের মাধ্যমে আমাদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এখন, এই দুনিয়াতে তো আমাদের পক্ষে সরাসরি তাঁর নিকট শাফায়াত চাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চাইতে পারব।

কিন্তু আসল পয়েন্ট হলো, আল্লাহ সব মানুষকে এই সুযোগ দিবেন না। তিনি কিছু মানুষকে বাছাই করবেন এর জন্য। আল্লাহ সুবহানু তাআলা সিদ্ধান্ত নিবেন কারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতের যোগ্য হবেন।

এজন্য প্রতিটি আযানের শেষে আমাদের দুআ করা করা উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে কেউ এই দুআ আন্তরিকতার সাথে করবে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।"

সুবহানআল্লাহ!

---

[৪৪] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ: ৯ / পৃ: ২৪

সর্বোপরি আযান শোনার সাথে সাথে মানসিকভাবে অন্তরকে নামাজের দিকে নেয়া শুরু করে দিবেন। অন্য যে কাজের মধ্যে ছিলেন, সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা শুরু করবেন। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করতে পারলে তো সর্বোত্তম! সব সময় হয়তো আযানের ৩০ মিনিটের মধ্যেই নামাজ আদায় করা সম্ভব হয় না এটা আমরা বুঝি। তবে আযানের সাথে সাথে দুআ করেই আমাদের প্রথম চিন্তা হওয়া উচিত "নামাজটা পড়ে ফেলা উচিত!" কারণ আল্লাহর ডাক এসেছে, "সালাতের দিকে আসো, সাফল্যের দিকে এসো"। আমি আযান শোনার পরেও নামাজকে পাশে ঠেলে এই মুহূর্তে যেই কাজটাই করছি, তার চেয়েও বড় সাফল্য অর্জিত হবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ!

ওযু—ঈমানের অর্ধেক

আযানের পরেই নামাজে মনোযোগী হবার পরবর্তী ধাপ আসে ওযুর মাধ্যমে। আসুন ওযু সংক্রান্ত একটি হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করি। একটি হাদিসের প্রায়ই অপরিপূর্ণ (অসম্পূর্ণ) অনুবাদ করা হয়। হাদিসটি হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'আত-তুহুরু শাতরুল ঈমান'।

সাধারণত এ হাদিসটির অনুবাদ করা হয়ে থাকে এভাবে—**"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"**। শাব্দিক অনুবাদ এটাই, তবে এই অনুবাদে সামগ্রিকভাবে শব্দের যথার্থতা প্রকাশ পায় না। কারণ, 'তুহুর' শব্দটি পবিত্রতার অর্থ প্রকাশ করলেও এই হাদিসে শব্দটি বিশেষ একপ্রকার পবিত্রতাকে নির্দেশ করে। আর এ হাদিসটি যে ধরনের পবিত্রতার কথা বলছে তা হলো, ওযুর মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা। কেননা এই হাদিসে উল্লিখিত 'তুহুর' শব্দটি দ্বারা অন্য হাদিসে ওযুকে নির্দেশ করা হয়েছে। এজন্য এ হাদিসটিরও অনুবাদ হওয়া উচিত—**"ওযু করা ঈমানের অর্ধেক"**।

ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক?

ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক তা নিয়ে আমাদের গবেষকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর জবাব অত্যন্ত সহজ। কিছু প্রশ্ন করলেই আমরা এর জবাব পেয়ে যাব।

ওযু কারা সম্পাদন করে? আমরা কখন ওযু করি? ওযু করার উদ্দেশ্য কী?

আমরা জানি, ওযু হলো সালাতের চাবি। যারা নিয়মিত ওযু করে তারা সালাত আদায়কারী। এখন, যারা সালাত আদায় করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। কেউ কেউ সালাত আদায় না করেও রমাদানের সাওম পালন করে। এমন অনেক রয়েছে, যারা সালাত আদায় করে না, কিন্তু হজ পালন করতে যায়। কেউ কেউ সালাত আদায় করে না, কিন্তু দরিদ্রদের কমবেশি দান করে। এমনটি হতে পারে।

তবে এটা অভাবনীয় যে, কেউ একজন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে কিন্তু কোনো ওজর ছাড়াই সে রমাদানের সাওম পালন করে না। যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এটাই প্রকৃত অভিজ্ঞতা, যা আমাদের সকলেরই রয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত মুসল্লি বা নামাজী, যে সর্বদাই নিয়মমাফিক সালাত আদায় করে, সে স্বভাবতই রমাদানের সাওম পালন করে, হজ পালন করে, যাকাত আদায় করে। এসব কিছু পালনের বিষয়ে সালাত এবং ওযু বিষয়টি সম্পৃক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি নিয়মিত ওযু করে, সে ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহও আদায় করে। সুতরাং "আত-তুহুরু শাতরুল ঈমান" বা "ওযু করা সমগ্র ঈমানের অর্ধেক" এ বক্তব্য যথার্থ ও সঠিক।

ওযু সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা

মুসনাদে আহমাদে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "তোমরা পথে অবিচল থাকো এবং এর শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করো। তুমি কখনোই সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে পারবে না। আর জেনে রাখো, সালাত হলো তোমাদের সর্বোত্তম আমল এবং মুমিন ব্যতীত কেউই ওযু সংরক্ষণ করে না।"[৪৫]

আমরা আবারও এখানে দেখতে পাচ্ছি, ওযু এবং ঈমান এ দুটিকে পরস্পর সংযুক্ত বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "মুমিন ব্যতীত কেউই ওযু সংরক্ষণ করে না", এখানে ওযু রক্ষা করা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

---

[৪৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২২৪৩৬; ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২৭৭

একজন ব্যক্তি যতটা সম্ভব ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে। আমরা যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার চেষ্টা করি, আমাদের অধিকাংশই কেবল সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে ওযু করি। এটা ভালো আলহামদুলিল্লাহ, এটা ইসলাম। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তিনটি ধাপের বিষয়টি জানি। সর্বোচ্চ ধাপ হলো ইহসান, এরপর রয়েছে ঈমান, তারপর ইসলাম।

আমরা যত বেশি ওযু করব, আমরা তত বেশি পবিত্র অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাই—এটাই প্রকাশ পাবে। এজন্যই উপর্যুক্ত হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> "মুমিন ব্যতীত কেউ ওযুর সংরক্ষণ করে না"

কেবল মুমিনরাই ওযুর হিফাজত করবে, সংরক্ষণ করবে। তার মানে একজন মুমিন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার তাগাদা থেকে ওযু অবস্থায় থাকার প্রয়োজন অনুভব করবে। যদি এটা সালাতের সময় নাও হয়, তবু সে পবিত্রতা অনুভবের জন্য ওযু করে। ওযু অবস্থায় থাকলে যে কেবল হাত-পা পরিষ্কার থাকে, তা নয়। এর একটা আত্মিক প্রভাব অন্তরের মধ্যেও পড়ে। ওযু অবস্থায় থাকলে আপনার জন্য যেকোনো সময় কুরআন স্পর্শ করে পাঠ করা সহজ হয়ে যায়, বাইরে গেলে নামাজ আদায় সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহর হুকুমে আপনার আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

একটি বিখ্যাত হাদিসের ব্যাপারে আমরা কমবেশি সবাই জানি;

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রজনিতে জান্নাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর পায়ের শব্দ শুনতে পান। মিরাজ থেকে ফিরে আসার পর নবীজি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন,

> 'হে বিলাল, আমি আমার সামনে জান্নাতে তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। তোমার কোন বিশেষ আমলটির কারণে মহান আল্লাহ তোমাকে এ বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন বলে তুমি মনে করো?"

বিলাল রা. জবাবে বললেন,

> "আমি তেমন কোনো বিশেষ আমলের কথা মনে করতে পারছি না। তবে

> একটি আমল অব্যাহত রাখার চেষ্টা করি, যখনই আমার ওযু ভেঙে যায়, আমি আবার ওযু করে এসে দুরাকাত নফল সালাত আদায় করি, কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।"

এমনটা নয় যে, বাধ্যতামুলকভাবে সব সময় ওযু করতেই হবে। প্রিয় পাঠক, আমরা নিশ্চয়ই জানি এটা ফরজ বা ওয়াজিব কিছুই নয়। তবে আমরা যেমন আমাদের পড়াশোনা এবং চাকরীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফলাফল আশা করি, গোল্ডেন জিপিএ ফাইফের একটু কম পেলে মন খারাপ করি, সেভাবে কি আল্লাহর কাছে গোল্ডেন জিপিএ ফাইভের রেজাল্ট পাওয়ার উচ্চাশা রাখি? আমরা তো দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে সফল হওয়ার জন্য অনেক কিছুই "বাড়তি"/অতিরিক্ত করি। যেমন, নিয়মিত স্কুলের পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হই, বাসায় গৃহশিক্ষক রাখি। এগুলো তো বাড়তি। তাহলে ওযু ধরে রাখার একটু বাড়তি চেষ্টা কী করতে পারি না সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য?

বিলাল রা. সর্বদাই ওযু অবস্থায় থাকতে চেয়েছেন। যখনই তিনি অপবিত্র হতেন, যখনই তার ওযু ভেঙে যেত, তার মনে হতো, 'আমি ভালো অবস্থায় নেই, আমি ওযু করে আসি।' তখনই ওযু করে নিতেন। আর যখনই তিনি ওযু করতেন, সাথে দুরাকাত নফল সালাত পড়ে নিতেন। বিলাল রা. এটা উল্লেখ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, এটাই একমাত্র আমল, যা আমি মনে করতে পারি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতএব, বলতে পারি এ জন্যই (ওযুর সংরক্ষণ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে তার পায়ের শব্দ শুনেছেন।

সুবহানআল্লাহ! কল্পনা করা যায় জান্নাতে পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়ার মতন মর্যাদা এসেছে ওযুর সাথে সংশ্লিষ্ট আমলের মাধ্যমে!

সুনানে তিরমিজির এক হাদিসে এসেছে, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করলেন। আপনারা সকলেই জানেন কীভাবে ওযু করতে হয়। না জেনে থাকলে ইনশাআল্লাহ শিখে নিবেন। এখন এই জ্ঞান লাভ করাটা অনলাইন দুনিয়াতে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।। যা-হোক, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করলেন। ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন। ওযুর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া শেষে তিনি বললেন,

> "যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর মতো করে ওযু করবে, অতঃপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দুরাকাত নফল সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৪৬]

এটা খুব সুন্দর কৌশল, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। একই সাথে এটি সুন্দর এক উপহার, যা আল্লাহ আমাদেরকে প্রিয় নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

আপনার সকল গুনাহ মাফ করাতে চান? তবে আপনি পরিপূর্ণভাবে ওযু করুন (প্রতি অঙ্গ তিনবার ধুয়ে) এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। এ সালাতে আপনি পূর্ণ মনোযোগ রাখুন, অন্য কোনো কিছুর কথা এ সময় ভাববেন না। অতঃপর ক্ষমা চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে দুআ করুন।

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

> "তোমাদেরকে এমন কিছু আমলের কথা বলা উচিত নয় কি, যেগুলো তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমার কারণ হবে এবং জান্নাতে তোমাদের মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করবে?"

সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমাদেরকে বলুন।"

নবীজি বললেন,

> "কষ্টকর সময়ে ওযু করা; মসজিদের দিকে অধিক কদম ফেলা (এখানে বোঝানো হচ্ছে, বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া। সালাতের উদ্দেশ্যে নিয়মিত মসজিদে গমন করা); এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।"[৪৭]

মসজিদে আগে গিয়ে ইমামের জন্য অপেক্ষা করা। আপনি মসজিদে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই যান। আপনি মাগরিব পড়ে মসজিদেই এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। আপনি অপেক্ষা করছেন ইমাম সাহেব কখন আসবেন। তিনি আসলেই আপনি এশা পড়ে বাড়িতে যাবেন। এখানে আপনি সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে

---

[৪৬] সহীহ বুখারী : ১৫৯, ১৬৪, সহীহ মুসলিম : ৪২৬

[৪৭] সহীহ মুসলিম : ৪৭৫

অপেক্ষা করছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ব্যাপারে বলেছেন।

এই হলো তিনটি বিষয়, যা করলে আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যার প্রথমটি ছিল, কষ্টকর সময়ে ওযু করা। আমাদের বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, এর আদর্শ উদাহরণ হলো ফজরের সময় ওযু করা, যখন পানি খুব ঠান্ডা থাকে। এটা আমাদের জন্য খুব কঠিন কাজ। আমরা তো এখন অভিজাত। আমরা হিটারে ২-৩ মিনিটেই পানি গরম করে ওযু করে ফেলতে পারি। তবু এ গরম পানি দিয়ে ওযু করতেও আমাদের কষ্ট হয়। কারণ, পানি গরম হলেও আবহাওয়া ঠান্ডা। কিন্তু কল্পনা করুন, যখন সাহাবায়ে কেরাম ওযু করতেন, তাদের পানির পাত্রের উপরিভাগ বরফ হয়ে যেত। এ বরফ ভেঙে এর ভেতর হাত দিয়ে ওযু করতে হতো, যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস চলমান। চিন্তা করুন, ঠিক এই সময় ইতমাম-উল-ওযু, ইসবাগ-উল-ওযু (ওযুর প্রতিটি অঙ্গ পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা) কতটা কঠিন ছিল। আমার জীবনে কয়েকবার মদিনার প্রচণ্ড ঠান্ডায় এ কষ্টকর বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মক্কা-মদিনায় এমন সময় গেছে যখন ওযু করার জন্য আমাদের কাছে মাত্র এক জগ পানি থাকত। ঠান্ডা পানিতে হাত-মুখ ধোয়া এমন কিছু নয়, যা করতে আপনি মুখিয়ে থাকেন। এটা আসলেই কঠিন কাজ। এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা অনেক বেশি থাকার ফলেই আপনি পরিপূর্ণভাবে ওযু করতে আগ্রহী হন—ইসবাগুল ওযু আলাল মাকারিহ। এ বিষয়টিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, এটা খুবই আবেগঘন ঘটনা। আমি চাই হাদিসটি আপনারা মুখস্থ করুন। একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত করতে গেলেন। সেখানে কবরস্থ লোকদের জন্য তিনি দুআ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

> ‘হায়! আমি যদি আমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম!’

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন,

> ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই?’

জবাবে নবীজি বললেন,

> 'না, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার সহযোগী। আমার ভাই হচ্ছে তারা, যারা তোমাদের পরে আগমন করবে। তারা আমাকে কখনো দেখেনি। (তারা আমাকে এত ভালোবাসবে যে) আমাকে একটিবার দেখার জন্য তাদের মালিকানায় যা আছে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে।'[৪৮]

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটা ভালোবাসেন।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন,

> 'বিচার দিবসে আপনি তাদেরকে কীভাবে চিনবেন?'

আপনি কীভাবে আপনার সেই ভাইদেরকে চিনবেন? আপনি আবু বকর রা.কে চিনেন, উসমান, উমর, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে আপনি চিনেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিনেন, আপনি আমাদেরকে চিনেন। কিন্তু বিচার দিবসে আপনার সেই ভাইদের আপনি কীভাবে চিনবেন, যাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ-ই হয়নি?

নবীজি বললেন,

> 'তোমরা কি দেখনি, তোমাদের মধ্যে যাদের শুভ্র-উজ্জ্বল চিহ্নবিশিষ্ট সুন্দর ঘোড়া রয়েছে...?'

গুরর হলো এমন ঘোড়া যার কপালে সাদা ডোরাকাটা দাগ রয়েছে। এমন ঘোড়া দেখলে আপনার মনে হবে, বাহ! এটা তো খুবই সুন্দর ঘোড়া; যদিও আপনি ঘোড়ার মালিক ছিলেন না কখনো। ঘোড়ার কপালে সাদা ডোরাকাটা দাগ থাকাকে বলা হয় গুরর।

আর মুহাজ্জাল হলো এমন ঘোড়া যার নিচের দিকে, খুরের উপরের অংশে সাদা ডোরাকাটা থাকে। এটা সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়া হিসেবে বিবেচিত হতো। এ আরব ঘোড়াগুলো কালো বর্ণের এবং এদের কপালে সাদা ডোরা দাগ থাকে। খুরের উপরিভাগের পায়ে সাদা ডোরা থাকে।

---

[৪৮] সুনানে আন নাসায়ী, অধ্যায়; পবিত্রতা, হাদিস নং ১৫০

নবীজি এমন ঘোড়ার উদাহরণ টেনে বলছেন,

> 'তোমাদের কারো যদি এমন গুরর-মুহাজ্জাল (শুভ্র-উজ্জ্বল দাগবিশিষ্ট) ঘোড়া থাকে, আর সেটি যদি ঘোড়ার পালে থাকে, তোমরা কি সে ঘোড়াটাকে আলাদাভাবে চিনতে পারবে না?"

সাহাবিরা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> 'কিয়ামত দিবসে আমার এ উম্মতেরা উজ্জ্বল হাত-পাবিশিষ্ট হয়ে আগমন করবে, আর এ উজ্জ্বলতা হলো ওযুর চিহ্ন।'

হে মুসলিমগণ! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোটি কোটি মানুষের মধ্য হতে আমাকে-আপনাকে চিনবেন, বিচার দিবসে হাউজে কাওসারের পানি পান করাতে ডাকবেন, তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত যেন আমরা হই সেজন্য আমাদের তিনি ডাকবেন। সেদিন আমাদেরকে তিনি একটিমাত্র উপায়ে চিনতে পারবেন। আর তা হলো ওযু। যদি ওযুর চিহ্ন না থাকে তবে সেদিন নবীজি আমাদের চিনতে পারবেন না। এটা কতই না ক্ষতিকর বিষয়! নবীজি আমাদের সেদিন চেনার ব্যাপারে বলেছেন, আমি তাদেরকে চিনব কেননা তারা গুররান-মুহাজ্জালীন অবস্থায় আগমন করবেন।

নবীজির শেখানো দুআ, যা ওযুর পর পাঠ করতে হয়

ওযুর পর পাঠ করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে; ইতমামের সাথে ওযু করবে, আর হ্যাঁ, ইতমাম মানে হুটহাট মুখে পানি ছিটানো, কোথায় পানি পৌঁছেছে না পৌঁছেছে তার কোনো ঠিক নেই—এমনভাবে ওযু করা নয়। এভাবে ওযু করা বড় ধরনের ভুল।

আমি বিশেষ করে তরুণদের বলতে চাই, মুরুব্বিদের বলতে চাই, যখন আমরা ওযু করব তখন ওযুর নির্ধারিত প্রতিটি অঙ্গে পুরোপুরিভাবে অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে। আপনি তাড়াহুড়ো করে ধৌত করবেন না। যে পর্যন্ত পানি পৌঁছানো

আবশ্যক সে পর্যন্ত পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। ওযুর নির্ধারিত অঙ্গসমূহ হলো,

- সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা (কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, পুরুষদের দাড়ি খিলাল করা এর অন্তর্ভুক্ত),
- উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা (দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার করে ধৌত করা অন্তর্ভুক্ত),
- মাথা মাসেহ করা (কান ও ঘাড় মাসেহ এর অন্তর্ভুক্ত) এবং
- উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা (পায়ের আঙুলগুলিও ভালোভাবে ধৌত করতে হবে)।

জেনে রাখা ভালো, পায়খানা-পেশাবের পর, বমি করার পর, রক্ত-পুঁজ বের হলে, ঘুমালে, বেহুঁশ হলে, মাতাল হলে, গোসল ফরজ হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এর কোনোটি ঘটলে আমরা উপরিউক্ত নিয়মে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করব।

এভাবে ওযু করার দিকে নির্দেশ করে নবীজি বলছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করে, ইতমামের সাথে ওযু করে এবং বলে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

এবং

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

আল্লা-হুম্মাজ'আলনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাতহহিরীন।

অর্থ—'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন।'

উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে, এরপর উক্ত যিকির পাঠ করে তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে দেয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[৪৯]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"[৫০] আর ওযুর মাধ্যমে আমরা উভয়টি অর্জন করতে পারি। একমাত্র ওযুর মাধ্যমেই বান্দার পবিত্রতা পূর্ণতা পায়। ওযুর পর কালিমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে বান্দা 'শিরক' থেকে মুক্ত হয়, ঈমান নবায়ন হয়। তাওবা দ্বারা গুনাহ থেকে আর পানি দ্বারা নাপাকী থেকে মুক্ত হয়। আর এজন্যই, ওযুর পর দুআ করার মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এত বিশাল নিয়ামত পাওয়ার জন্য কত সহজ এক পদ্ধতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিলেন। সুবহানআল্লাহ!

প্রিয় ভাই-বোন,

> ওযু হলো এমন এক চাবি, যা অন্যান্য ইবাদতের দরজা খুলে দেয়। যে ব্যক্তি ওযু করে সে ধার্মিক মুসলিম, সে নামাজ পড়ার জন্য পবিত্র হয়।

একইসাথে এটি জানাবাতের[৫১] বেলায়ও। একজন মুমিন কখনো লম্বা সময় ধরে জুনুব অবস্থায় থাকতে পারে না। আপনি পারবেন না দীর্ঘ সময় জুনুব[৫২] অবস্থায়

---

[৪৯] মুসলিম ১/২০৯, হাদিস নং ২৩৪

[৫০] সূরা বাকারা ২ : ২২২

[৫১] জানাবাত হচ্ছে অপবিত্রতা। জানাবাত (جنابة) হলো যৌনসঙ্গম বা বীর্যপাতের কারণে দেহের অপবিত্র অবস্থা। স্ত্রী সহবাস ও স্বপ্নদোষের কারণে মানুষের উপর গোসল করা অত্যাবশক হয়ে যায়। যতক্ষণ না মানুষ গোসল না করে, শুধু ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়।

[৫২] জুনুব (جنب) হলো যৌনসঙ্গম বা বীর্যস্খলনের কারণে অপবিত্র হওয়া। এমন

থাকতে। কেননা রাত অতিক্রম হলেই আপনাকে ফজরের সালাত পড়তে হবে। এজন্যই রাত্রিকালে লম্বা সময় ধরে জুনুব অবস্থায় থাকাটা হিকমতের পরিচয় নাও হতে পারে।

এজন্য মানব ইতিহাসের সবচেয়ে উত্তম মানুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় ঘুমাতেনও না, যদিও এটা জায়েয। আপনি ফজরের পূর্বে গোসল করে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নবীজি তো নবীজিই। তিনি এ অবস্থায় ঘুমাতে যেতেন না, অন্তত ওযুটা করে নিতেন। অন্তত এ পর্যায়ের পবিত্র হয়ে তারপর ঘুমাতেন। হ্যাঁ, জুনুব অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া হালাল, আপনাকে পরবর্তী সালাতের আগে গোসল করলেই চলবে। মূলত আপনি বেশিক্ষণ জানাবাত অবস্থায় থাকতে পারেন না। ওযুবিহীন অবস্থায় খুব বেশি সময় আপনি থাকতে পারেন না। কারণ আপনার সালাত আদায় করতে হয়। আর একজন মুমিন সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকতে চেষ্টা করে।

ওযুর অধ্যায় থেকেই যেন নামাজে খুশু আনার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করে দিতে পারি, সেজন্য একটা চমৎকার মানসিক চর্চার কথা বলছি। যেহেতু আমরা জানি যে, ওযুর সাথে সাথে আমাদের গুনাহ ঝরে যাওয়ার আশা রয়েছে, সেহেতু ওযু করা অবস্থায় আপনি কল্পনা করতে পারেন যে, এই যে আপনি দুই হাত পানি দিয়ে ধুচ্ছেন, এই পানির সাথে সাথে দুই হাত দিয়ে করা গুনাহগুলো আল্লাহ

অবস্থায় পবিত্র হওয়ার জন্য এবং ফরজ কাজ সম্পাদন করার জন্য গোসল করতে হয়। কেননা তা নাহলে নামাজ আদায় করা যাবে না।

সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন তোমরা নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। আর (নামাজের কাছে যেও না) গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়; যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও; কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও; তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।

জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে যে, মহিলাদের হায়েজ (ঋতুকালীন সময়) ও নেফাসের (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের সময়) বিষয়েও ইদ্দতপূর্ণ (মেয়াদ) হওয়ার পর গোসলের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী।

ঝরিয়ে দিচ্ছেন! ধুতে ধুতে আল্লাহর কাছে চেয়ে নিন, "আল্লাহ এই যে ওযুর সময় মুখ ধুচ্ছি, এই মুখ দিয়ে যত গীবত এবং পাপ করেছি, আপনি ক্ষমা করে দিন। এই যে কানে পানি দিচ্ছি, এই কান দিয়ে যত হারাম শুনেছি, আপনি ক্ষমা করে দিন। এই যে মাথা ধুচ্ছি, এই মাথাকে আপনি জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এই যে এখন পায়ে পানি দিচ্ছি, এই পা দিয়ে যেন আমি জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করতে পারি এবং আপনার সান্নিধ্যে বিচরণ করতে পারি!" আমিন।

এই মানসিক চর্চাটা আমি আমার একজন সিরিয়ান উস্তাদার কাছে শিখেছিলাম। এটা বেশ শক্তিশালী অনুশীলনী হতে পারে আপনার নামাজে, অন্তরে পবিত্রতা এবং খুশু আনার প্রাথমিক পর্যায়ে।

ওযু সম্পর্কিত আলোচনার সমাপ্তি টেনে আমরা বলছি, ওযু আমাদের ঈমানের অর্ধেক। এটি আমাদের গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেয়। আমাদের মর্যাদার স্তর উঁচু করে। আমাদের জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। আর ওযু হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়, যার মাধ্যমে আমাদের নবী, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন। সুতরাং, আমাদের জন্য এটাই উত্তম, আমরা পরিপূর্ণভাবে ওযু সম্পাদন করব। আর ওযু পরবর্তী কাজ যেমন, সালাতসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করব। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন।[৫৩]

---

[৫৩] ওযু নিয়ে বিস্তারিত লেখাটি নেয়া হয়েছে ড.ইয়াসির ক্বাদির Branches of Faith-Pt.16 লেকচার থেকে। অনুবাদিকা শারিন সফি অদ্রিতা এবং সম্পাদক হাসান শুয়াইব অনেক কিছুই সংযোজন করেছেন লেকচারটিকে পূর্ণতা দিতে।

নামাজ শুরুর আগে করণীয়

কল্পনা করুন তো, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই যদি আপনি মুখ না ধুয়ে, দাঁত ব্রাশ না করে, রাতে যে কাপড় পড়ে ঘুমিয়েছেন সেটা না বদলিয়ে, নাস্তা না করে সোজা অফিসের দিকে রওনা দিলেন। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো? সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাববে, "ওর মাথা ঠিক আছে তো?"

নিশ্চয়ই আপনি-আমি এটা কখনোই করব না। অফিস, স্কুল বা ভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ কোনো মিটিং/ক্লাসের জন্য আপনি কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিবেন। ঠিক তেমনি নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদতে বসারও অনিবার্য কিছু প্রস্তুতি আছে। ভাবুন তো, কোনো রকমের প্রস্তুতি ছাড়া ঘুম থেকে উঠে রাতের কাপড় পরেই যদি আপনি আপনার গন্তব্যের দিকে রওনা দেন, তাহলে সারাটা দিন আপনি সফল হয়ে থাকতে পারবেন কি? অথচ আমরা নামাজের সাথে অনেকটা এই কাজটাই করে থাকি! যে যেই দুনিয়াবী কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম, সেখান থেকে হঠাৎ করে কোনো রকমে উঠে গিয়ে নামাজটা পড়ে আবার ওই কাজের কাছে ফিরে যাই। এভাবে হুটহাট কাজ থেকে উঠে নামাজে দাঁড়ালে, মাথায় কেবল নিজেদের যার যার কাজের কথাই ঘুরতে থাকে। নামাজে মন বসে না। কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ আসে না। আমার উস্তাদাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, 'কী করলে নামাজে আমার খুশু-খুযু আসবে এবং মনোযোগ বাড়বে?' তিনি চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> 'নামাজের ভেতরে তোমার খুশু কতটা শক্ত এবং আন্তরিক থাকবে, সেটা নির্ভর করে নামাজের বাইরে তোমার কাজকর্ম-চিন্তা ভাবনার উপর।'

সুবহানআল্লাহ! অর্থাৎ, নামাজের বাইরে আমি যদি সারাক্ষণ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে গুনাহ এবং খারাপ কাজে নিমজ্জিত হয়ে থাকি, গুনাহ থেকে বের হবার কোনো রকমের চেষ্টা না করে, ইচ্ছা করে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকি, এরপর এই অবস্থায় নামাজে গিয়ে দাঁড়াই, তাহলে আমার নামাজে খুশু কীভাবে আসবে? আর তাই নামাজের ভেতরটাকে সুন্দর করতে হলে আমাদের নামাজের বাইরের ঈমান, আমল এবং চরিত্রকেও সুন্দর করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে হবে।

নামাজে খুশু থাকার পূর্ব শর্ত

এক. লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনা

- হারাম এবং গুনাহের কাজ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করা। আমরা আদম সন্তানরা কখনোই পুরোপুরি নিষ্পাপ হয়ে যাব না। কিন্তু অন্তত পক্ষে নামাজের বাহিরে যদি আমরা সর্বোচ্চ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা না করি, তাহলে সেটার প্রভাব আমার নামাজের ভেতরেও পড়বে। নিজের নফসকে, অযাচিত ক্রোধকে, বর্জনীয় আখলাক, গীবত করার তীব্র ইচ্ছা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে নামাজের বাইরে।

- বেশি বেশি করে সুন্নাহ এবং মুস্তাহাব কাজগুলো করার চেষ্টা করা। ইহসানের পর্যায়ে যেতে চাই, আল্লাহর কাছে গোল্ডেন এ+ পাওয়ার উচ্চাশা রাখার কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

- অযথা, অযাচিত কথাবার্তা, আড্ডা, লেখা এবং কার্যকলাপ যেগুলোতে দুনিয়া এবং আখিরাতের কোনো কল্যাণ নেই, সেগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করা। নামাজে বসার ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগেই সকল প্রকার ডিভাইস, স্মার্টফোনের এপ, গেমিং, চ্যাটিং, সোশ্যাল মিডিয়ার অর্থহীন স্ক্রলিং ইত্যাদি এই জাতীয় সকল প্রকার বিক্ষিপ্ত, বেহুদা কাজ থেকে লগ আউট করে বের হয়ে আসতে হবে।

- নামাজের বাইরে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের অর্থসহ ব্যাখ্যা নিয়ে পড়াশোনা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা রাখতে হবে।

দুই. নামাজ শুরু করার আগে

- নামাজে দাঁড়ানোর **১০ মিনিট আগেই** নিজেকে দুনিয়াবী কাজ থেকে **বিচ্ছিন্ন**

(ফ্রি) করে নেয়া।

- আযানের পরে **বেশি সময় পার হতে না দেয়া** এবং আউয়াল ওয়াক্ত থাকতে থাকতেই নামাজ শুরু করে দেয়া।

- সুন্দরভাবে ওযু করা। **ওযু করার সময় প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় চিন্তা করা যে অঙ্গটা নামাজে কীভাবে ব্যবহৃত হবে এবং তার ফলস্বরূপ সেটা কীভাবে আখিরাতে কল্যাণের কাজে আসবে।**

- ওযুর প্রশিক্ষণ অনেকটা এমন হতে পারে যে, **আমরা মুখে পানি দেয়ার সময় ভাবতে পারি,** 'আল্লাহ আপনি আমার মুখটা যেভাবে দুনিয়াতে পরিষ্কার করে **দিচ্ছেন সেভাবে আখিরাতে কিয়ামতের ময়দানেও** আমার মুখটা উজ্জ্বল করে বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।' **ডান হাত ধোয়ার সময় ভাবতে পারি,** 'হে আল্লাহ এই ডান হাতে আপনি আমাকে আমার আমলনামা লাভের তাওফিক দিন।' **বাম হাত ধোয়ার সময় ভাবতে পারি,** 'হে আল্লাহ এই হাত দিয়ে যেন আমি আমার আমলনামা না পাই!' এই সম্পর্কে ওযু অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **দুই পা ধোয়ার সময় ভাবতে পারি** যে, 'ইনশাআল্লাহ এই দুই পা দিয়ে যেন আমি জান্নাতের দিকে হাঁটতে পারি।' **নাক ধোয়ার সময় ভাবতে পারি,** 'ও আল্লাহ, এই নাক দিয়ে আপনি আমাকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবার তাওফিক দিন।' এমন চিন্তার মধ্য দিয়ে ওযু শেষ করার সাথে সাথেই অন্তর এবং ঈমানের রূপটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং নামাজের দিকে খুশু উৎপাদনের একটি ক্ষেত্র তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ।

- সম্ভব হলে মিসওয়াক করা অথবা দাঁত ব্রাশ করে নেয়া। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। প্রিয় কারো সাথে মোলাকাতের আগে আমরা নিজেদেরকে যেমন প্রস্তুত করতে পছন্দ করি, ঠিক সেরকম তিনিও নিজেকে গুছিয়ে নিতেন নামাজের আগে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'[৫৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, 'সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।'

---

[৫৪] সহীহ মুসলিম: ৪৭৭

- জামাতে সালাত আদায় করা এবং একসাথে পরিবারের সবাই মিলে নামাজ পড়া। যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করার সুযোগ থাকে, তাহলে সেটা গুরুত্ব সহকারে করা উচিত। কেননা জামাতবদ্ধভাবে সবাই মিলে একটা ভালো কাজ করলে সেই কাজের অন্যরকম উৎসাহ পাওয়া যায়, যেটা একা একা করলে পাওয়া যায় না।

- সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া তিনি যেন আপনার নামাজকে জীবন্ত, মধুর এবং কল্যাণকরভাবে সম্পাদন করার তাওফিক দেন।

তিন. নামাজরত অবস্থায় খুশু

- চোখদুটোকে সিজদার জায়গায় নির্দিষ্ট করে রাখা। নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় চোখকে এখানে-সেখানে যেতে না দেয়া।

- নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। রুকুতে এবং সিজদায় যথাযথ সময় দেয়া উচিত। রুকুতে গিয়ে পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত থামা, এরপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, পরে ধীরেসুস্থে সিজদার দিকে যাওয়া। মুরগির ঠোকর মেরে খাবার খাওয়ার মতো জলদি করে রুকু-সিজদা করে নামাজ পড়া একেবারেই উচিত নয়।

- নামাজে যে জিনিসগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো আসলেই মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা। অনেক সময় আমরা শুধু রোবটের মতো কথাগুলো আওড়ে যাই এবং নিজের কথা নিজে শুনে দেখার চেষ্টা করি না।

- নামাজে পঠিত তিলাওয়াত-তাসবীহ-রুকুর দুআ-সিজদার দুআয় বৈচিত্র্য আনুন। বৈচিত্র্য মনকে ধরে রাখে। একই সূরা বা তাসবীহ পাঠে একঘেয়েমি চলে আসে। মানুষ যান্ত্রিকভাবে এগুলো পড়ে। মুখে তিলাওয়াত-তাসবীহ চলে, আর ঐদিকে মন পড়ে থাকে আড্ডায়-দোকানে-অফিসে। এজন্য নতুন নতুন সূরা পড়ুন। কয়েকটি মাসনুন দুআ শিখুন। বার বার একই সূরা না পড়ে ভিন্ন ভিন্ন ও নতুন সূরা পাঠ করুন।

- নামাজে খুশু-খুযু ধরে রাখার জন্য মনকে ১৪৫০ বছর পূর্বে নিয়ে যান মসজিদে নববীতে। ভাবুন, নবীজির ইমামতিতে আবু বকর, উমর বা সাহাবীদের পাশে একইসাথে নামাজ পড়ছেন। দেখবেন বিক্ষিপ্ত মনটা অনেকটাই শান্ত হয়ে গেছে। এই ভাবনাটা আমার খুব কাজে দেয়।

নামাজে পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা

অনেক কথা হলো! এবার আমরা জানব নামাজের মধ্যে পঠিত বিভিন্ন তাসবীহ, বাক্যমালা ইত্যাদির অর্থ এবং বিশদ ব্যাখ্যা। প্রিয় পাঠক, নড়েচড়ে বসুন ইনশাআল্লাহ। এই বইয়ের সবচেয়ে চুম্বকাংশের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নামাজে 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ

আমরা নামাজ শুরু করি 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধার মাধ্যমে। এছাড়াও নামাজের প্রত্যেক ওঠা-বসায় আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলি। এটার সবচেয়ে সরল একটি অনুবাদ হচ্ছে "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা আল্লাহ সবচেয়ে বড় অথবা আল্লাহ সবচেয়ে মহান!" ইংরেজিতে এটা হবে "Allah is the greatest." মজার ব্যাপার হলো, এই অনুবাদটি প্রকৃত পক্ষে হওয়ার কথা "Allah is greater" (Not greatest).

একটু ব্যাখ্যা করি। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'আকবার' শব্দটি 'ইসমে তাফযীল' (শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক) এর একটি রূপান্তর। এই শব্দটি কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ই তাকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার জন্য। তাহলে সহজ বাংলায় 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ হবে **'আল্লাহ অন্য সব কিছুর থেকে বড়।'**

এখন যদি প্রশ্ন জাগে, আমরা কেনই বা নামাজে আল্লাহকে 'অন্য সব কিছুর থেকে বড় বলছি?' এর উত্তরে রয়েছে চমৎকার এক ব্যাখ্যা! নামাজ শুরুর পর অন্য অনেক কিছুর খেয়াল আমাদের মনে উদয় হয়। এখানেই ভাবতে হবে, নামাজ শুরু করার পরে, যে জিনিসের চিন্তাটাই আমাকে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী

করে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটার থেকে আল্লাহ বড়!

'আল্লাহু আকবার' এর মাঝে 'অন্য সবকিছু' উহ্য ধরতে হবে। মনে করতে হবে 'আল্লাহু আকবার' এর পরে একটি শূন্য স্থান আছে। সেই শূন্য স্থানে বসবে, 'মিন কুল্লি শাইয়িন'—অন্য সব কিছু থেকে।

তাহলে 'আল্লাহু আকবার' এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ সবচেয়ে বড়_____ থেকে, আর এই শূন্য স্থান পূরণ করতে আমরা সেটাই বসিয়ে দিব, যেটা আমাকে নামাজের মধ্যে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। যেমন, নামাজ পড়তে পড়তে স্কুলের হোমওয়ার্ক বা চাকরির কথা মনে পড়ল, যেই আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার', তার মানে আমার এই হোমওয়ার্ক বা চাকরির থেকে আল্লাহ বড়! সিজদা থেকে উঠতে উঠতেই অফিসের বসের কথা মনে পড়ল। যেই বললাম, 'আল্লাহু আকবার', নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম যে, অফিসের বসের থেকে আল্লাহ বড়। নামাজে দাঁড়িয়ে চুলায় বসানো রান্নার কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু রান্নার থেকে আল্লাহ বড়!

দুনিয়ার যে কাজটার কথাই আমি নামাজের মধ্যে ভেবে ভেবে আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী হচ্ছি, সেখান থেকে মনোযোগ সরিয়ে এই খেয়াল আনতে হবে, এই কাজের থেকে আল্লাহ বড়! এজন্যই প্রায় প্রতিটা ধাপেই আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলি। রুকুতে যেতে, সিজদায় যেতে, দুই সিজদার মাঝে, আবার সিজদা থেকে উঠতে! প্রতিটি পর্যায়ে 'আল্লাহু আকবার' এর ব্যবস্থা এমনভাবে করে দেয়া হয়েছে যেন আল্লাহকে ভুলে যেতে গেলেও আবার 'আল্লাহু আকবার' মনে করিয়ে দেয় যে, আসলে এই মুহূর্তে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় আমার কাছে আল্লাহর থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই! আল্লাহু আকবার!

নামাজে পড়া সানার অর্থ এবং ব্যাখ্যা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَوَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারকাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা"

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি অতি পবিত্র (অর্থাৎ, আপনার কোনো ত্রুটি নেই, ভুল নেই) এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্য (অর্থাৎ কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক আপনি সব সময় প্রশংসিত এবং আমি সারাজীবন আপনার প্রশংসা করেই যাব।) আপনার নামগুলো সবচেয়ে বরকতপূর্ণ, আপনার নির্ধারিত হুকুম সবচেয়ে উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহা নেই। (অর্থাৎ, আপনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কোনো সত্য ইলাহা ও মা'বুদ নেই, আমি কখনোই আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। অর্থাৎ, কাউকে আপনার থেকে বেশি গুরুত্ব দিব না।)'

*****

সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ)

অর্থ: 'আমাদের আল্লাহ সবচেয়ে নিখুঁত, তিনি সমস্ত ভুল হতে পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য।'

একটু খেয়াল করি, আমরা মানুষরা জীবনে এই দুইটা জিনিসই খুব চাই; Perfection (নিখুঁত হতে) এবং Praise (প্রশংসা পেতে)। অর্থাৎ, নিজেদের জন্য আমাদের সবকিছু পারফেক্ট (নিখুঁত) হতে হবে। আমরা চাই পারফেক্ট একটি কর্মজীবন, পারফেক্ট জীবনসঙ্গিনী, পারফেক্ট একটি বাড়ি! আর অন্যের কাছে আমরা আশা করি প্রশংসা। আমরা খুব চাই যে—পরিবারে, সমাজে অন্যেরা আমাদের প্রশংসা করুক, সমাদর করুক!

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের জীবনের বেশিরভাগ কষ্ট আসে এই দুইটি জিনিসের অভাবে। হয়, নিজেরা পারফেক্ট কিছু করতে পারিনি, তাই নিজের উপর হতাশ। না হলে অন্যের কাছে যেই প্রশংসা-সমাদর আশা করেছি সেটা পাইনি, তাই অন্যের উপর হতাশ! চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ বারবার নামাজে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ত্রুটিহীনতা এবং প্রশংসা—এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আয়ত্তে; আমাদের আয়ত্তে না।

যখনই আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে বলছি, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা (আল্লাহ তুমি অতি পবিত্র, ত্রুটিহীন), ওয়া বিহামদিকা (এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য); সাথে সাথে আমরা আল্লাহর সামনে নিজেদের ত্রুটিপূর্ণতার কথা মেনে নিচ্ছি। অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে সমাদর না খুঁজে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোযোগী হচ্ছি।

এটা আমাদের জন্য খুব পাওয়াফুল মেসেজ। নামাজে দাঁড়িয়েই এটা একজন মুসলিমকে মানসিকভাবে শক্তিশালী বানিয়ে দিবে, যদি সে এভাবে চিন্তা করতে পারে। এভাবে ভাবলে সে উপলব্ধি করতে পারবে, তার হতাশ হবার কিছু নেই। সে ভুলেভরা হলেও আল্লাহ তাকে তার ঈমানের সাথে করা ছোট-বড় সকল আন্তরিক চেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করবেন! অন্য কারো কাছে প্রশংসা বা উপযুক্ত সমাদর না পেলেও তার কষ্টের কিছু নেই। সত্যিকার প্রশংসা তো কেবল আল্লাহর জন্য, তার নিজের জন্য তো না। ভেঙে পড়া বান্দার জন্য রয়েছে তার প্রাচুর্যময় রব!

*****

ওয়া তাবারকাসমুকা (وَتَبَارَكَ اسْمُكَ)

অর্থ: 'এবং আপনার নামসমূহ বরকতময়।'

এখানে, আরবী 'বারাকাহ' শব্দকে ইংরেজিতে 'Blessing' এবং বাংলায় কল্যাণ বলা যেতে পারে। আমরা প্রায়ই একে-অন্যকে বলে থাকি, 'May Allah Bless you', মানে 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।' বরকত বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কল্যাণ, মঙ্গল এবং জীবনে যা কিছু ভালো।

আর আমাদের মাঝে 'বারাকাহ' শব্দটি একটি বিশেষ আবেদন নিয়ে হাজির হয়। তা হলো, যখন আল্লাহ আমাদের জীবনে অনেক সময় বিশেষ কল্যাণ এমনভাবে বাড়িয়ে দেন যে, আমরা অনেক কম সময়ে অনেক বেশি কিছু অর্জন করে ফেলতে পারি! কিংবা অনেক কম জিনিস অনেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এর বহু উপমা আছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের আঙিনাজুড়ে। তাঁর জীবনী পড়লে আপনি দেখবেন যে, অল্প পরিমাণ খাবার থেকে শত শত মানুষ তৃপ্তি নিয়ে খেতে পেরেছিল "বারাকাহ"র মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জীবনেও এই বারাকাহ প্রতিফলিত হয়েছে।

নবীজির জীবন থেকে এর তিনটি উপমা দিই;

এক.

খন্দক যুদ্ধের কথা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষুধার্ত

দেখে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একবেলা খাবারের জন্য দাওয়াত করলেন। বললেন, সাথে অতিরিক্ত দুচারজনকে নিতে। নবীজিকে আপ্যায়ন করতে জাবির রা. একটি বকরি জবাই করেছেন আর প্রস্তুত করেছেন দুই সের যবের আটা।

ঘটনা ঘটল অন্যরকম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রায় ৩শ' সাহাবী। জাবির রা. ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাকে অভয় দিয়ে বললেন শান্ত থাকতে। পরে নবীজির ছোঁয়ায় আল্লাহর গায়েবী সাহায্যে মাত্র একটি খাসির মাংস আর দুই সের যবের রুটিই ৩শ' সাহাবী তৃপ্তিভরে খেয়েও শেষ করতে পারেননি। পাতিলের ঢাকনা খুলে জাবির রা. দেখেছেন, নবীজি সাহাবীদের মাঝে খানা বণ্টনের শুরুতে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে।

দুই.

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেবার বিয়ে করে নববধূর ঘরে যান। আম্মাজান তখন ঘি মিশ্রিত খেজুরের মিষ্টান্ন তৈরি করেন। তারপর একটি পাত্রে রেখে আমাকে বলেন, আনাস, পাত্রটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাও। নবীজিকে বলবে, 'আম্মাজান আমাকে এই পাত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। অপারগতা জানিয়ে আরো বলেছেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের এই সামান্য হাদিয়া গ্রহণ করলে অত্যন্ত খুশি হব।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আম্মাজানের নির্দেশমতো খাবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এসে বললাম, আম্মাজান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আরো বলেছেন—নিশ্চয়ই আমাদের এই হাদিয়া আপনার জন্য অতি সামান্য।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, 'এটা রাখো।' তারপর বললেন, 'যাও, আমার পক্ষ থেকে অমুক অমুককে দাওয়াত দিয়ে আনো।' এই বলে কয়েকজনের নাম বললেন। তারপর বললেন, 'এর বাইরে যাকে সামনে পাবে তাকেই দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসবে।' আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম বলেছেন তাদেরসহ যাদেরকে সামনে পেয়েছি, দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসি।'

হাদিসের বর্ণনাকারী জা'দ ইবনু উসমান বলেন, আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করি—সেদিন মোট কতজন ছিলেন? আনাস রা. জবাবে বলেন—প্রায় ৩শ' জন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আনাস, পাত্রটা এদিকে দাও।

এদিকে লোকজন জমা হয়ে সুফফা[৫৫] এবং নবীজির কক্ষ—সব কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দশজন দশজন করে সবাই গোল হয়ে বসো। প্রত্যেকে যেন নিজের পাশ থেকে খাবার খায়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবাই তৃপ্তিভরে খেয়ে বিদায় নেয়। একদল খেয়ে বেরিয়ে যায় তো আরেকদল প্রবেশ করে। এভাবে সবার খাওয়া শেষ হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন—আনাস, এবার ঢাকনা ওঠাও। ঢাকনা তুলে হতভম্ব হয়ে যাই। বুঝতেই পারছিলাম না—ঢেকে দেয়ার সময় বেশি ছিল, না ঢাকনা তোলার পরে বেশি আছে![৫৬]

তিন.

একদিন উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি পাত্রে করে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঘি পাঠান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘি ঢেলে রেখে পাত্রটি খাদেমাকে ফিরিয়ে দেন। খাদেমা পাত্রটি নিয়ে উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যান এবং শূন্য পাত্রটি একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখেন। উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন ঘরে ফিরেন, দেখতে পান—তখনও পাত্রটি থেকে টপটপ করে ঘি পড়ছে।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো 'বারাকাহ'র একটি দিক ও উপমা। অল্প খানা অনেক মানুষের জন্য যথেষ্ট হওয়া।

---

[৫৫] আহলে সুফফা বলা হতো মসজিদে নববীর সামনে বারান্দার মতো একটি স্থানে অবস্থানরত সাহাবীদের। সংখ্যায় তারা ৭০ জনের মতো ছিলেন। তাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন কোনো সাদাকা আসত, তখন তিনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি কোনো হাদিয়া আসত, তিনি সেখান থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে এতে তাদের শরিক করতেন এবং নিজে অংশগ্রহণ করতেন।

[৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪২৮

সাহাবীদের গল্প শুনে আমাদের অনেকের মনে হতে পারেন, তাদের মতন সময় কি আর এখন আছে? সেই বারাকাহ কি আমাদের পাওয়া সম্ভব? এর উত্তরে বলবো যে, হ্যাঁ সম্ভব!

বারাকাহর আরেকটি চমৎকার উদাহরণ দিই আমাদের জীবন থেকে;

গেল রোজায় আমার এক বড় বোন কয়েকজন মুরব্বিদের ইফতারে দাওয়াত করবেন বলে নিয়ত করলেন। কিন্তু, আপুর হাতে ওইদিন সময় ছিল অনেক কম। সারাদিনের ঝড়ঝাপটা শেষে সন্ধ্যার ঠিক আগে হাতে পেলেন এক থেকে দেড় ঘণ্টা! এতগুলা মানুষের খাবার এক ঘণ্টায় সে কীভাবে প্রস্তুত করবে?

আপু তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বলল, 'ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার জন্য নিয়ত করেছি যে তোমার বান্দাদের ইফতার খাওয়াব। তুমি আমার জন্য পথ করে দাও!' নিয়ত শুদ্ধ ছিল। ভরসা ছিল আল্লাহর উপর। ফলে দেখা গেল; মাগরিবের আযানের ৫ মিনিট আগে ঠিকই তিনি টেবিলে মন মতন ইফতারের আইটেম রেডি করে ফেললেন। অল্প সময়ের ভেতর টেবিল ভর্তি ইফতার দেখে বিস্ময়ে আপুর মুখ থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বের হলো, 'এটা আমি করি নাই! এটা আল্লাহর বারাকাহ!' যখন আল্লাহ সময়ে বারাকাহ দেন, তখন সেই সময় এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যায় যে, কম সময়ে অনেক বেশি কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব হয়, যেটা আল্লাহর দেয়া বারাকাহ ছাড়া অসম্ভব!

নামাজ এমন একটা ইবাদত, যেটা করতে খুব কম সময় লাগে, কিন্তু আমরা যদি সেটা সঠিকভাবে জীবনে পালন করতে পারি, তাহলে প্রতিদিনের কয়েক মিনিটের এই নামাজই আমাদের জীবনে অসম্ভব রকমের কল্যাণ এবং বরকত নিয়ে আসবে।

নামাজের শুরুতেই যখন আমরা বলছি যে, 'ওয়া তাবারকাসমুকা' বা 'এবং তোমার নামগুলি বরকতপূর্ণ', তখন আল্লাহর কাছে আমরা শান অনুযায়ী বারাকাহর আশা করছি। যেই সত্তার নামই এত বরকতপূর্ণ তিনি নিজে না জানি তাহলে কতটা বরকতপূর্ণ! অকল্পনীয় এই বারাকাহর কল্যাণ আল্লাহ ছাড়া আমাদের জীবনে আসা সম্ভব নয়—এটাই আমরা প্রতিদিন পাঁচবার নামাজে মেনে নিচ্ছি। সুবহানআল্লাহ! নামাজ যেমন বারাকাহ বাড়ায়, গুনাহ তেমনি বারাকাহ

কমায়। সেজন্য আমাদের গুনাহ থেকে অনেক দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে যেন জীবনের বারাকাহগুলো গুনাহ দিয়ে আমরা হারিয়ে না ফেলি। কষ্ট করে নামাজ পড়ে যে বারাকাহ পাচ্ছে, সে ঐ বারাকাহ অটুট রাখার জন্য সমস্ত চেষ্টা দিয়ে গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।' [৫৭]

*****

ওয়া তাআলা জাদ্দুকা (وَتَعَالَى جَدُّكَ)

অর্থ: 'জাদ্দুন' মানে সম্মান, মর্যাদা। 'তাআলা' মানে সমুন্নত, সুউচ্চ, মহান। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো, 'এবং তুমি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী!'

একটি মর্যাদাময় জীবন আমাদের সবার কাম্য। কিন্তু জানতে হবে, মর্যাদা কোথায় নিহিত আছে এবং মর্যাদা আসে কার পক্ষ থেকে। মানুষ যতই নিম্নমানের জীবনের অধিকারী হোক না কেন, প্রত্যেকেই চায় সম্মান নিয়ে বাঁচতে। সম্মানের সাথে সমাজে চলতে। তাহলে আল্লাহর কাছে কারা সম্মানিত? বিত্তশালীরা বেশি সম্মানিত, না কি ভারি ভারি ডিগ্রীধারীরা? না, এরা কেউই নয়। সমাধান দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। তিনি বলছেন,

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি বেশি সম্মানিত, যে বেশি তাকওয়াবান।'[৫৮]

মানুষকেও সম্মান তিনিই দিয়ে থাকেন। 'আর যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। তোমার হাতেই সকল কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' আর আমরা যখন নামাজের শুরুতে উচ্চারণ করছি, 'ওয়া তাআলা জাদ্দুকা' বা 'আপনি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী', তখন মনে মনে প্রত্যাশা করতে হবে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সম্মানের জীবন দান করেন। কারণ, সকল মর্যাদা ও সম্মান তাঁর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

---

[৫৭] সূরা আনকাবুত ২৯ : ৪৫

[৫৮] সূরা হুজরাত ৪৯ : ১৩

আমাদের জীবনে কতই না চাওয়া-পাওয়ার হিসাব থাকে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছামতন সবকিছু হয় না। আমরা অনেকেই তখন ভেঙে পড়ি, কষ্ট পাই। অথচ, নামাজে প্রতিদিন আমরা সানায় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, 'আল্লাহ, আমার ইচ্ছার থেকে আপনার ইচ্ছা বড়!' আমাদের সামান্য জ্ঞান দিয়ে আমরা কোন কাজের কী পরিণাম সেটা বুঝতে পারি না। কিন্তু যেই রব মহান আল্লাহ, তিনি স্থান, কাল, পাত্র ভেদ করে সবকিছু জানেন। তাঁর থেকে ভালো আর কেউ জানবে না যে, এখন আমার জন্য এই বিয়ে, চাকরি অথবা কাজ হয়ে যাওয়াটা আসলেই কতটা কল্যাণকর। যে ব্যক্তি 'ওয়া তাআলা জাদ্দুকা' এর মর্ম বুঝে নামাজে এটা পাঠ করবে, না পাওয়ার কোনো গ্লানি তাকে জেঁকে ধরতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। তার অন্তরজুড়ে থাকবে প্রশান্তি, ইনশাআল্লাহ।

*****

ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা (وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)

অর্থ: 'এবং আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহা নেই (অর্থাৎ, আল্লাহ, আমি আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না)।'

এই পর্যায়ে এসে সানায় আমরা স্বীকার করে নিই যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে আমাদের মাথা নত করব না। নিজেদের কামনা-বাসনা এবং নফসের সামনে না। সমাজের সামনে না। শয়তানের ওয়াসওয়াসার সামনে না! আমরা আল্লাহর থেকে বেশি কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিব না।

আচ্ছা, একটু কল্পনা করি, দিনের মধ্যে পাঁচবার করে যদি আমরা কাউকে নিজে থেকে গিয়ে বলে আসি যে, 'তুমি আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' আর বলার পরপরই যদি তার চোখের সামনে অপছন্দনীয় কাজ করে আসি, তাহলে পরে তার সামনে যেতে আমাদের অনেক লজ্জা লাগার কথা না?

কষ্টের কথা কি জানেন, এই কাজটা আমরা দৈনিক আল্লাহর সাথে করে আসছি। এজন্যই, যে বুঝে নামাজ পড়ে, সে জানে যে আল্লাহর সাথে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে! সেই রবের দরবারে এখনি হাজিরা দিতে যেতে হবে।

কীভাবে আল্লাহকে এতটা অসন্তুষ্ট করে তাঁর সামনে দৈনিক পাঁচবার দাঁড়াই? কীভাবে তাঁর বান্দাকে কষ্ট দিয়ে, তাঁরই বান্দার হক নষ্ট করে এসে তাঁকে বলি যে, 'ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা?'

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজিম

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: 'আমি আল্লাহর কাছে বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।'

আমরা নামাজ পড়ি আর আমাদের মনে হয়, 'কই! নামাজ পড়েও তো খারাপ কাজ করেই যাচ্ছি!' এটা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা, নামাজের না। নামাজের পরও যখন দেখছি, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে, আমার নামাজ যথার্থ হচ্ছে না। আল্লাহ আমাদের নামাজে ইখলাস, মনোযোগ আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিন, আমিন।

কোনো কিছুতে বিজয়ী হতে হলে আমরা কার বিরুদ্ধে লড়ছি সেই ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান রাখতে হবে। তবেই না আমরা সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে পারব! আমাদের অন্যতম শত্রু শয়তান আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নামাজে অমনোযোগী করছে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "যখন আযানের শব্দ উচ্চারিত হয়, শয়তান তখন সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালিয়ে যায়, যাতে তার কানে আযানের শব্দ না আসে। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামতের সময় আবার সে পালিয়ে যায় এবং শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের মনকে ফিসফিসিয়ে ধোঁকা দিতে থাকে, যেন নামাজ থেকে মনোযোগ সরে যায় এবং মানুষকে এমন সব জিনিস মনে করিয়ে দেয় যা নামাজের পূর্বে তার মাথায় ছিল না। যার ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, সে কোন রাকাত নামাজ পড়ছে।"[৫৯]

কি চেনা চেনা লাগছে না? কল্পনা করুন আপনি নামাজে দাঁড়িয়ে আর আপনার ঠিক পাশেই কদাকার এক শয়তান কানের কাছে নানাবিধ অযথা কথা বলে

---

[৫৯] বুখারী

ফিসফিস করেই যাচ্ছে। চিত্রটা বেশ ভয়ঙ্কর! তাই এই শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তবেই নামাজ শুরু করতে হবে। সানা পাঠ শেষ করে আমাদের বলতে হবে, 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজিম', আর মনেপ্রাণে আশা করতে হবে, আল্লাহ যেন নামাজের পুরোটা সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন।

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)

এরপর আমরা বলি, 'শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়ালু এবং অসীম করুণাময়।'

প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনি আরো বলেন, এমন কোনো কাজ যেটা বিসমিল্লাহ ছাড়া শুরু হয়, সেটায় আল্লাহ তাআলা কোনো বরকত রাখেন না। এ কাজের মধ্যে কিছু অপূর্ণাঙ্গতা থেকে যায়। আর বিসমিল্লাহ বলার কারণে আল্লাহ তাআলা পূর্ণতা দান করেন।

প্রত্যেক ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া দরকার। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। পান করার শুরুতে, জবাই করার শুরুতে, স্ত্রী সহবাসের শুরুতে, ওযু করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দুআর শুরুতেও বিসমিল্লাহ পড়ে নিতে হয়।

যেমন, যে জানোয়ারকে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা হয় তার গোশত হালাল। আর যেটা বিসমিল্লাহ বলা হয় না সেটা হালাল নয়।

প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে যেখানে নির্দিষ্ট দুআ নেই, সেখানে অবশ্যই আমরা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে দিব।

নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি

এরপর আমরা পাঠ করি চিরচেনা সূরা ফাতিহা। চলুন এবারে আমরা নতুন করে সেই সূরা ফাতিহা উপলব্ধি করব, ইনশাআল্লাহ।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরিশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম বসে ছিলেন। হঠাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম উপর থেকে একটা শক্ত শব্দ শুনতে পেলেন এবং মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

> 'এটি হচ্ছে আকাশের এমন একটি দরজার শব্দ যা আগে কোনো দিন খোলা হয়নি। সেই দরজা দিয়ে এমন একজন ফিরিশতা আসলেন যিনি আগে কখনো পৃথিবীতে আসেননি। সেই ফিরিশতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আপনি দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হোন। যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা আপনার আগে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। সেই দুইটি নূর হচ্ছে, সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।' [৬০]

সুবহানআল্লাহ! সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আমাদের কি একবারও মনে হয় যে এটি আল্লাহর তরফ থেকে আসা এমন এক নূর যা এই উম্মতকে ছাড়া আর কোনো উম্মতকে পূর্বে দেয়া হয়নি?!

এটা মাথায় রেখে পরের অংশগুলো পড়ুন যে, এই সূরা আপনার জন্য পাঠানো আল্লাহর তরফ থেকে আসা বিশেষ আলো।

---

[৬০] সহীহ মুসলিম ৮০৬

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

*****

রব.

আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সাথে নিজের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আমাদের রব, প্রভু, মনিব। আরবী 'রব' শব্দটি দ্বারা এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, যিনি দিন এবং রাতের প্রতিটি সেকেন্ড আমাদের দেখভাল করে যাচ্ছেন। আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন। হ্যাঁ, আল্লাহই আমাদের রব। আমাদের প্রত্যেকটা হৃদ-স্পন্দন তত্ত্বাবধান, আমাদের খাওয়ানো, পড়ানো, সুস্থ রাখা, আমাদের অনুরোধগুলো শোনা, আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা—এই সবই 'রব' শব্দটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর গোলাম। আমরা আল্লাহর সম্পত্তি। নিজেকে কারো গোলাম ভাবতে অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। কারণ, মানুষ স্বভাবতই স্বাধীন থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া দুনিয়াবী দৃষ্টিতে প্রভুরা তার দাসের উপর ক্ষমতার জোর খাটায়, অত্যাচার করে।

কিন্তু আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলামিন অন্যরকম প্রভু। তিনি এমন প্রভু যিনি তাঁর গোলামের সাথে কখনো অন্যায় করেন না। তিনি তাঁর বান্দাকে ধরে-বেঁধে রাখেন না, বরং বান্দাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিধি পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার দান করেন। এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে হিদায়াতের পথে থাকতে হবে সেটার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের হাত-পা-মুখ সবকিছুই আল্লাহর। খুব সীমিত সময়ের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আমানত হিসেবে কিছু জিনিসের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যাবহার করতে হবে, সেটাও বলে দিয়েছেন কুরআনের আয়াতে আয়াতে। একদিন আমাদের দেহের উপর আমাদের ক্ষমতা থাকবে না। সেই কিয়ামতের দিন আমাদের নিজেদের হাত-পাগুলি শুধুই আল্লাহর কথা শুনবে। আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তাই, আল্লাহকেই সব কিছুর নিয়ন্তা ভেবে আমরা খুশি খুশি এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের দাসত্ব আল্লাহর কাছে স্বীকার করি। আর যদি দাসত্বের অনুভূতি না আসে, তবে শুধু

আয়াত পাঠটাই আমাদের দ্বারা হবে, এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না আমাদের অন্তরে।

আমরা দাসেরা তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকি। তিনি এমন একজন রব, যার জন্য সমস্ত প্রশংসা নির্ধারিত! আরবী 'হামদ' এমন প্রশংসা জ্ঞাপন শব্দ, যা শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শব্দটা প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা দুইটাই ইঙ্গিত করে। আমরা এই আয়াত পাঠ করে, স্বীকার করছি, প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য। এই অনুভূতি আসতে হবে হৃদয়ের গভীর থেকে। আর কেউ যখন মন থেকে প্রশংসা করে কাউকে ধন্যবাদ দেয়, তার কৃতজ্ঞতা হয় নির্ভেজাল। আমরাও সূরা ফাতিহাতে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করি।

*****

আলহামদুলিল্লাহ

এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই আয়াতের বিশ্লেষণে বোঝা যায়, 'আল্লাহ চির প্রশংসিত সত্তা।' তিনি আমাদের প্রশংসার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। আমাদের প্রশংসার আসলে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই; দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহর প্রশংসা ছেড়ে দিলেও আল্লাহর রাজ্য থেকে একটা কিছু কমে যাবে না। তাঁর মাহাত্ম্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয়। আবার দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলে আল্লাহর প্রশংসা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সেটার ফলে আল্লাহর মহিমা এতটুকু বেড়ে যাবে না। তাঁর মাহাত্ম্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয়। আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলি বা না বলি, আল্লাহ সবসময়ই প্রশংসিত! 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আমরা আল্লাহর কোনো উপকার করছি না। বরং লাভটা আমাদের নিজের!

যখন একজন মাকে দেখি তার বুকের ধন সন্তানকে কবর দিয়ে এসে বলছে 'আলহামদুলিল্লাহ! আমার ছেলে এখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে জান্নাতে খেলছে'; একজন ভাইকে দেখি চাকরি হারিয়েও বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আরো অনেক কিছুই তো হারাতে পারতাম'; একজন বোনকে দেখি বিছানায় শুয়ে প্রচণ্ড অসুস্থতায় বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! এই কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ আমার গুনাহগুলি মাফ করে দিচ্ছেন'—তখন আলহামদুলিল্লাহর

মর্মটা বুঝি! আমরা যতবার নামাজে এই আয়াত পড়ছি, ততবার আমরা নতুন করে জীবনের সংগ্রামগুলোর বিপরীতে পজিটিভ হতে শিখছি। শত কষ্টের মধ্যে থেকেও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারার চেয়ে শক্তিশালী আর শান্তিদায়ক অন্য কিছু নেই। দিনের মধ্যে পাঁচবার করে নামাজে আমরা এটারই চর্চা করে চলেছি।

*****

আ'লামিন

অর্থ: 'সকল সৃষ্টি জগতের (পালনকর্তা)।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানবজগৎ, প্রাণীজগৎ, সমুদ্রজগৎ, ফিরিশতাদের জগৎ; মোটকথা আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জগতের পালনকর্তা হলেন আল্লাহ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার রব তিনি! সকলকে সমগ্রভাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব শুধুই তাঁর। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহ আমাদের রিযিক নির্ধারণ করেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, আর আমরা ডুবে আছি ভুলের সমুদ্রে। আমরা ভাবছি, ভালো রেফারেন্স (মামা/চাচা) না থাকলে চাকরি পাওয়া যায় না। ভালো মার্ক না হলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায় না! কিন্তু আল্লাহর রিযিক এসবের মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ধনী, গরিব, কালো, সাদা—সবার জন্য প্রযোজ্য! তিনি যে রব্বুল আলামিন! আমরা মানুষরাও যেন আমাদের অনুগ্রহ বিলানোর সময় নিজেদের মধ্যে তারতম্য করা বন্ধ করি।

তাহলে এক বাক্যে এই আয়াতের অনুবাদ হয়, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।' এই আয়াতটিই নামাজে একটু গভীর চিন্তা নিয়ে পড়লে উপলব্ধি করতে পারব, প্রতিটা শব্দ অন্তরের ভেতরে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে।

'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' আমাদেরকে প্রতিবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, সীমাহীন প্রশংসার যোগ্য আমার রব সারাক্ষণ আমার যত্ন নিচ্ছেন, আমার সকল সমস্যার সমাধান তাঁর কাছে নিহিত এবং তিনি আমাদের কারো মধ্যেই তাঁর প্রভুত্ব নিয়ে ভেদাভেদ করেন না। এমন রব থাকতে আমাদের কীসের দুশ্চিন্তা বলুন?

*****

আর-রহমানির রহিম (الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)

অর্থ: 'যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।'

বলুন তো, আল্লাহ কেন তাঁর দয়ার কথা বলতে গিয়ে 'রহমান' শব্দটা ব্যবহার করলেন? এর একটা চমৎকার কারণ আছে। আরবীতে রেহেম মানে মায়ের গর্ভ। আর এই 'রেহেম' ও 'রহমান' উভয় শব্দই একই মূল ধাতু থেকে নির্গত। আরবীতে একই মূল ধাতু থেকে যে শব্দগুলোর উৎপত্তি হয়, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক থাকে। তাহলে 'রেহেম তথা মায়ের গর্ভ' এবং 'আর-রহমান' এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

দেখুন, একজন মা নয় মাস ধরে একটা বাচ্চাকে পেটে ধারণ করে চলে। শত কষ্টের মধ্যেও সবসময় খেয়াল রাখে, বাবু ঠিক আছে তো? নিজের খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা সবকিছু খুব সতর্কতার সাথে মেনে চলে। ছোট বাবুটা মায়ের পেটের ভেতরে বসে বসে মায়ের প্লাসেন্টা[৬১] দিয়ে সব রকমের পুষ্টি শুষে নিতে থাকে।

---

[৬১] মা যা খান তা গর্ভস্থ সন্তানের জন্য উপযোগী নয়। সরাসরি সেই খাবার ভ্রূণে সরবরাহ করলে উপকারের চেয়ে অপকার হবে। তাহলে উপায়?

উপায় তো আছেই। আল্লাহ তো আহসানুল খালিকিন। সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টিতে খুঁত ধরার কে আছে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়ের গর্ভে বাচ্চার জন্য **'ফুড রিফানারি স্টেশন'** স্থাপন করলেন। নাম তার প্লাসেন্টা (গর্ভফুল)। বাচ্চার সাথে আম্বিলিক্যাল কর্ডের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া গর্ভফুলে এক লাইনে মায়ের দেহ থেকে পরিপোষক জমা হয়ে সৃষ্টিকর্তার বেঁধে দেয়া নিয়মে পরিশোধিত হয়ে ভেইনের মাধ্যমে সন্তানের দেহে যায়। আর্টারির মাধ্যমে ক্ষতিকারক পদার্থ বাচ্চার দেহ থেকে আবার প্লাসেন্টাতে ফিরে আসে। চলতেই থাকে এই প্রক্রিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এই প্লাসেন্টা আবার স্প্রিং করে। বাচ্চা মুভ করলে যাতে কষ্ট না পায় সেই দিকটিও আল্লাহ আমলে নিয়েছেন।

ডেলিভারির সময় বাচ্চার যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় সেজন্য আম্বিলিক্যাল কর্ডের দৈর্ঘ্য রাখা হয়েছে প্রায় ৬০ সে.মি.। যা প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ।

প্রসবের সাথে সাথে আম্বিলিক্যাল কর্ডে থাকা আর্টারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। যাতে বাচ্চার দেহ থেকে রক্ত বের হয়ে গর্ভফুলে না যেতে পারে। কিন্তু যে ভেইনের মাধ্যমে প্লাসেন্টা থেকে বাচ্চার দেহে অক্সিজেন সরবরাহ হতো তা বন্ধ হতে প্রায় ৪ মিনিট সময় নেয়। অর্থাৎ, জন্মের পরও কিছু সময় ব্যাক সাপোর্ট দেয়া হয়। এটা নবজাতকের জন্য খুবই উপকারী।

এই ছোট্ট প্রাণকে পেট থেকে বের করে দুনিয়াতে আনতে গিয়ে একজন মায়ের প্রচণ্ড প্রসববেদনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেকে এ সময় প্রাণ হারায়।

যারা বেঁচে যায়, তাদের জন্য শুরু হয় আরেক পরিশ্রমের যাত্রা! রাতের পর রাত জেগে থাকা। দিনের পর দিন ডায়পার-ডিউটি। এক সেকেন্ডের জন্য চোখের আড়াল হলে ছোট বাচ্চা খেলনা গিলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলবে! যেই বাবুটা পেটের ভেতরে থেকেও কষ্ট দিল, পেট থেকে বের হতে গিয়ে প্রায় মৃতপ্রায় করে দিল, বের হয়েও সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখছে, তার একটু কান্নার শব্দ শুনলে মায়ের সে কী অস্থিরতা! বাচ্চার একটু অসুখ হলে মনে হয় জান বের হয়ে যাচ্ছে! এ যেন ভীষণ অদ্ভুত প্রজাতির মায়াবতী আমাদের মায়েরা! কল্পনা করতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে এই মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসেন!

'মায়ের গর্ভ বা রেহেম' এবং **'রহমান'** এর মধ্যে সম্পর্কটা মাইন্ড-ব্লোয়িং (বিস্ময়কর)! বাচ্চা যখন মায়ের গর্ভে থাকে, সে কিন্তু তার মাকে দেখতে পায় না। মা যে কীভাবে তার জন্য পা টিপে টিপে হাঁটছে, একটু পরপর বমি করছে, বাচ্চার জন্য দুআ করছে, বাচ্চা নেক হবার জন্য দিনরাত কুরআন তিলাওয়াত করছে, অবুঝ বাচ্চা কিন্তু সেটা দেখতে পারে না! ঠিক যেমন আমরা অবুঝ বান্দারা আমাদের আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পারি না। আল্লাহ কীভাবে দিনের পর দিন আমাদের খেয়াল রেখে যাচ্ছেন, আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের চাহিদা পূরণ

জন্ম নিয়েছে বাবু। কাটতে হবে নাভি। কিন্তু এই নাভি কাটার সময় ছোট বাবু একটুও ব্যথা পায় না। কেন জানেন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই নাভিতে কোনো নার্ভ রাখেননি। চুল কাটলে কি আমরা ব্যথা পাই? নখ কাটলে? তেমনি নার্ভহীন এই কর্ড। বাচ্চা টেরই পায় না।

এভাবেই তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন আমাদেরকে। কেন সৃষ্টি করেছেন? উদ্দেশ্য একটাই—বান্দা তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। শয়নে-স্বপনে তাঁকে স্মরণ করবে। যিকিরে কাটাবে দিনরাত। ভালোর সাথে করবে ঘর, খারাপের সাথে হবে বিরহ।

অথচ আমরা বড় হয়ে সেই আল্লাহকেই ভুলে যাচ্ছি। শয়তানের কাঁধে কাঁধ রেখে চলছি। আল্লাহর দাস হওয়ার পরিবর্তে সমাজ ও প্রবৃত্তির দাস বনে যাচ্ছি। আল্লাহ কি আমাদের কাজকাম পর্যবেক্ষণ করছেন না? নিশ্চয়ই করছেন। প্রতিটি সেকেন্ডের আমলনামা রেকর্ড হচ্ছে। ছাড় পাব না। প্রত্যেকটা নিয়ামতের হিসাব দিয়েই এগুতে হবে।

"তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?" আল কুরআন। - [নজরুল ইসলাম; লেখক, অনুবাদক]

করে যাচ্ছেন, অদৃশ্য ব্যাক্টেরিয়া/ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন, আমাদের অবিচ্ছিন্ন অনুগ্রহের চাদরে জড়িয়ে রাখছেন, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই! ছোট্ট বাচ্চাটা যেমন তার মায়ের গর্ভে পরম মমতায় মোড়ানো, ঠিক সেইভাবে আমরা চারপাশ থেকে আল্লাহর রহমত আর দয়া দিয়ে পরিবেষ্টিত! ছোট বাচ্চা মাকে জ্বালিয়ে মাথা নষ্ট করে দেয়ার পরও যেমন বাচ্চাকে ছাড়া মায়ের চলে না, তেমনি আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর অবাধ্য হবার পরও আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করা ছেড়ে দেন না! হ্যাঁ, তিনিই পরম করুণাময়, আমাদের রব—'রাহমানুর রাহীম।'

নামাজে প্রতি রাকাতে আমরা যখন তিলাওয়াত করব 'আর রাহমানির রাহীম', তখন আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার আবেশ হৃদয়ে জাগ্রত করা চাই। নামাজে জাগ্রত হওয়া এই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রতিফলিত হবে আমাদের সমগ্র জীবনজুড়ে। এতে পালটে যাবে জীবনের রং। বদলে যাবে জীবনের গতিপথ। আলোকময় হবে জীবনের মুহূর্তগুলো।

*****

মালিকিইয়াও মিদ্দীন (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)

অর্থ: 'বিচার দিবসের মালিক।'

আগের দুই আয়াতে আল্লাহর এমন মহানুভবতা এবং ভালোবাসার কথা শুনে বান্দা ভাবতে পারে, আমার রবের এত দয়া! তাহলে আমি যতই গুনাহ করি না কেন, তিনি তো শেষমেশ আমাকে ক্ষমা করেই দিবেন। এই ধরনের ভাবভঙ্গি থেকে মানুষ যেন আল্লাহর দয়াকে সহজলভ্য ভেবে পাপে না জড়িয়ে পড়ে, সেজন্য ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে, তিনি হলেন 'মালিকিইয়াও মিদ্দীন' অর্থাৎ, তিনি কিয়ামত দিবসের মালিক। এমন এক দিনের মালিক আল্লাহ, যেদিন প্রতিটা কাজের পাই পাই হিসাব নেয়া হবে! আল্লাহ তাঁর দয়াতে যেমন অতুলনীয়, তেমনি তাঁর ন্যায়বিচারও অকাট্য! তিনি মায়ের থেকেও আমাদের বেশি ভালোবাসেন দেখে আমরা যা ইচ্ছা তাই করে পার পেয়ে যাব—সেটা হবে না।

*****

ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈ'ন (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

অর্থ: 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় এভাবে পাওয়ার পর আমরা বান্দারা আল্লার কাছে নিজেদের পুরোপুরি সমর্পণ করে দিই এই আয়াতের মাধ্যমে। যে আল্লাহ আমার রব, রাহমানুর রাহীম, মালিকিইয়াও মিদ্দীন, আমি কীভাবে তাঁর ইবাদত না করে থাকতে পারি? এই আয়াতের প্রথম অংশে ইবাদত করা এবং পরের অংশে সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, কারণ, আমরা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তাঁর ইবাদতটুকুও করতে পারব না। আরবীতে অনেক শব্দই আছে যেটার মানে সাহায্য। কিন্তু এই আয়াতে 'সাহায্য' বোঝাতে আল্লাহ বাছাই করেছেন আরবী শব্দ 'ইস্তিয়ানা।' 'ইস্তিয়ানা'র বিশেষত্ব হচ্ছে, যেই ব্যক্তি সাহায্য চাচ্ছেন, সে নিজে ইতোমধ্যে সাহায্য পাওয়ার জন্য সব রকমের কাজ করে যাচ্ছে। মোটকথা, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টারত থাকা অবস্থায় যে সাহায্য চাওয়া হয়, তাকে বলে 'ইস্তিয়ানা' বা 'নাস্তাঈন।'

আমাদের মনে রাখা জরুরী যে, আল্লাহর সাহায্য এবং হিদায়াত সস্তা না! আমরা নিজেরা কোনো রকমের চেষ্টা না করেই যদি শুধু আল্লাহর কাছে 'দাও! দাও!' করি, সেটা কি ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত হবে? আমাদের দুই হাত তোলার সাথে সাথে নিজেদের লাগামটা আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে। আল্লাহর দিকে এক কদম এগিয়ে আসলে আল্লাহ তাআলা বান্দার দিকে দশ কদম এগিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, এজন্য বান্দাকেই প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে।

*****

ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)

অর্থ: 'আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো।'

আমরা তো আগের আয়াতে বললাম যে 'আল্লাহ, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি।' কিন্তু, এই ইবাদতটা কীভাবে করলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হবেন সেটাও তো জানতে হবে। নিজের মনমতো কাজ করে ফেললেই সেটা ইবাদত হয়ে যায় না। তাই এই আয়াতে আমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দিকনির্দেশনা চাচ্ছি।

'মুস্তাকিমের' পথ চাচ্ছি। 'সিরাত' মানে যেই পথটা সরল, সহজ এবং পরিষ্কার। একটা রাস্তা যখন পুরোপুরি সোজা হয়, তখন দূর থেকেও সেই রাস্তার শেষ মাথার গন্তব্য স্পষ্ট দেখা যায়। মুসলিমরাও তাদের গন্তব্য এবং জীবনে চলার পথের উদ্দেশ্য নিয়ে এমনই স্বচ্ছ ধারণা রাখে। তারা চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত। মাছির পাখার চেয়েও তুচ্ছ দুনিয়ার পিছে তারা ছুটবে না। ফলে দেখা যায় যে, দুনিয়াই তাদের পিছনে ছুটতে থাকে! সুবহানআল্লাহ!

*****

সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থ: 'সেই সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

এর আগের আয়াতে আমরা আল্লাহর কাছে সরল পথের দিশা চেয়েছি, আর এই আয়াতে আমরা চাচ্ছি স্পষ্ট উদাহরণ। আমরা দেখি, গণিত ক্লাসে অঙ্কের সমাধান পুরোটা বইয়ে করে দেয়া থাকলেও একজন গণিতের টিচারের প্রয়োজন হয় যিনি ধাপে ধাপে আমাদেরকে অঙ্ক করাটা প্রথমবার দেখিয়ে দেন। ঠিক তেমনি নবী-রাসূলরা ছিলেন আমাদের শিক্ষক। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে তারা ধাপে ধাপে আমাদেরকে দ্বীন পালনের ব্যাপারগুলো হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

'সেই সমস্ত লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।' এই নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষরা হচ্ছেন নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন, শহীদদের জামাত ও সলিহীন। এরাই ছিলেন সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা প্রথমে সরল পথ প্রার্থনার পর এই আয়াতের মাধ্যমে এও প্রত্যাশা করছি, ইতঃপূর্বে যারা সরল পথপ্রাপ্ত ছিলেন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে পথের দিশা দেন। শেষে আল্লাহর সাহায্যে আমরা নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করতে পারলে দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ পাব ইনশাআল্লাহ।

শুধু সরল পথপ্রাপ্তদের উদাহরণই যথেষ্ট নয়। বরং পাপ ও অবাধ্যতার কারণে যারা অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছে, তাদের অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাওয়া মোটিভেশান হিসেবে কাজ করে। সেজন্য ইতিবাচক দিক প্রার্থনার সাথে সাথে

নেতিবাচক পরিণতি থেকে আশ্রয় চাওয়ারও উদাহরণ আছে আয়াতের পরের অংশে। আমরা আল্লাহকে বলছি যে, 'আমরা তাদের পথ চাই না যাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে।' এরা হচ্ছে সেসমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন, তারপরও তারা আল্লাহকে মানেনি। জেনে-বুঝেও ইসলামকে পালন করেনি। তাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু কোনো সৎকর্ম ছিল না। এরা হলো তৎকালীন ইহুদী জাতি। বিভিন্ন অপকর্মের কারণে আল্লাহ তাআলা এই জাতির উপর তাঁর গযব অবধারিত করেছেন।

'ওয়ালাদ্দোল্লীন' বা 'এবং তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।' এখানে তৎকালীন খ্রিষ্টানদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে সঠিক পথে রাখতে চেয়েছেন। বনী ইসরাইলের একটি দল তার প্রতি ঈমানও এনেছিল, কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আবার কিছু লোক যাদের হয়তো ভালো ভালো কর্ম আছে, কিন্তু তারা সেটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে না। নিজের জন্য, দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে— তাই তারাও পথভ্রষ্ট।

ঈমানহীন কর্ম এবং কর্মহীন ঈমান দুইটাই মূল্যহীন। এই দুইই আমাদের দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে এদের থেকে আশ্রয় চাই।

আপনি কি জানেন ফাতিহার প্রতিটা আয়াতের বিপরীতে আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন?

গা শিউরে উঠছে না এটা ভেবে? এটা সত্যি যে আমাদের মত নগণ্য, নাফরমান-অবাধ্য-পাপে নিমজ্জিত বান্দার পাঠ করা প্রতিটা আয়াতের জবাবও আল্লাহ তাআলা দেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'আমার ও বান্দার মাঝে সালাতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে আমার কাছে চায়।'

যখন বান্দা বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', তখন আল্লাহ তাআলা

বলেন,

> 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

বান্দা যখন বলে, 'আর-রহমানির রহীম', তখন আল্লাহ বলেন,

> 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করেছে।'

আর যখন বান্দা বলে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন', তখন আল্লাহ বলেন,

> 'আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বলেছে।'

যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তা'য়ীন'; 'আল্লাহ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই', তখন আল্লাহ বলেন,

> 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা সেটাই পাবে, যা সে আমার নিকট চায়।'

আর যখন বান্দা বলে, 'ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন'; 'আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দাও, সেই সমস্ত লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।' তখন আল্লাহ বলেন,

> 'এটি আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়।'[৬২]

মহাপরাক্রমশীল রবের সামনে পিপীলিকার চেয়েও নগণ্য এবং গুনাহগার বান্দা আমরা। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতিটা কথার জবাব দেন এবং এখনো দিচ্ছেন!

> সালাত এমনই শক্তিশালী এক ইবাদত। সুবহানআল্লাহ! এখন দেখুন, সূরা ফাতিহা পাঠের সময় অন্তত এই খেয়ালটাও যদি জাগ্রত করি, আল্লাহ আমার তিলাওয়াত শুনছেন, আমার প্রার্থনার জবাব দিচ্ছেন, তাহলে অন্য কিছু খেয়াল করার উপক্রম থাকবে কী?

---

[৬২] মুসলিম, সালাত অধ্যায়

রুকু এবং সিজদা

আমরা রুকু এবং সিজদায় যা যা বলি সেটা নিয়ে কখনো চিন্তা করেছেন?

আমরা রুকুতে বলি,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم

'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।'

অর্থ: 'আমার সুমহান রব অতি পবিত্র (অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনি কতই না পবিত্র এবং আপনি সবচেয়ে শক্তিধর)।'

আমরা সিজদায় বলি,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।"

অর্থ: 'আমার সমুচ্চ রব অতি পবিত্র (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনি কতই না পবিত্র এবং আপনার মাকাম সবচেয়ে উঁচু)।'

নামাজের মধ্যে শারীরিক দিক থেকে সবচেয়ে নড়বড়ে এবং দুর্বল অবস্থানটা হচ্ছে 'রুকু।' রুকুতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি নামাজরত বান্দাকে হালকা করেও একটা ধাক্কা দেয়, তার কিন্তু ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। চমৎকার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যখন নামাজে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকি, তখন বলি, 'আল্লাহ্ আপনি সবচেয়ে মহান (শক্তিশালী)'। আবার, আমরা যখন নামাজের মধ্যে সবচেয়ে নিচু অবস্থানে থাকি, তখন আল্লাহকে বলি যে, 'আল্লাহ্ আপনার মাকাম সবচেয়ে উঁচু।'

সুবহানআল্লাহ! নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও বিনয়ের এই প্রকাশ আমাদের নামাজকে অন্য এক অবস্থানে নিয়ে যায়। নামাজ পড়তে পড়তে যেখানেই মন চলে যাক না কেন, রুকু আর সিজদা দেয়ার সময় মনে পড়ে যায় যে, 'আল্লাহ সবচেয়ে মহান (শক্তিধর) এবং আল্লাহই সর্বোচ্চ।' মনে রাখতে হবে, নামাজে রুকু ও সিজদায় আল্লাহর মহত্ত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদার কথা স্মরণ করতে না পারি, তাহলে দৃশ্যত আমরা রুকু-সিজদা করলেও তাতে প্রাণ থাকবে না।

তারপর রুকু থেকে উঠতে উঠতে আমরা বলি,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه

'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা।'

অর্থ: 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।'

এর পরপরই দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং বলি,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা কেবল তোমারই।'

এই বাক্যদুটি পাঠ অনেকটা এমন, যেন আমাদের কথাগুলি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুনবেন, সেটা নিশ্চিত করে রাখলাম। বলুন তো, ঠিক সিজদায় যাবার আগে কেন এটা নিশ্চিন্ত করে নিলাম যে, আল্লাহ আমার সব কথা শুনবেন? কারণ, **সিজদায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে যায় এবং সিজদা হচ্ছে দুআ করার মোক্ষম সময়**। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'সিজদারত বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং সে সময় তোমরা বেশি বেশি দুআ করো।'[৬৩]

তাই আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের ঠিক আগ মুহূর্তে 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার সিজদায় গিয়ে উজাড় করে চেয়ে নাও। তিনি তোমার সব আকুতি-মিনতি শুনছেন। একটাও মাটিতে

---

[৬৩] সহীহ মুসলিম ৪৮২

পড়বে না। প্রতিটা দুআ রব্বুল আলামিনের দরবারে মেহমান হয়ে পৌঁছাবে, ইনশাআল্লাহ।

রুকু থেকে উঠার দুআ—একটি বিস্ময়কর ঘটনা

রিফাআহ আয-যুরাকি রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবীজির পিছনে সালাত পড়ছিলেন। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু থেকে মাথা তুলে বললেন, 'সামিয়াল্লাহ হুলিমান হামিদাহ (আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা তাঁর প্রশংসা করেছে)।' তখন আমার পিছন থেকে এক সাহাবী বলে উঠলেন,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

উচ্চারণঃ রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি

অর্থঃ হে আমাদের রব্ব! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অঢেল, পবিত্র ও বরকত-রয়েছে-এমন প্রশংসা।

সালাত শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ কথাটি কে বলেছে? সেই সাহাবী বললেন—আমি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> আমি ত্রিশজনেরও অধিক ফিরিশতাকে এর সওয়াব লেখার জন্য হুড়োহুড়ি করতে দেখেছি!

অন্য বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, রিফাআহ আয-যুরাকি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ছিলেন ঐ ব্যক্তি।

পুণ্য লেখার জন্য এই যে হুড়োহুড়ি, এর বিশেষত্ব কী? এর বিশেষত্ব হলো—সেই সাহাবী প্রতিটি বর্ণই সত্যিকার অর্থেই মন থেকে বলেছেন।

ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এই দুআর ব্যাখ্যা করেন, "ফিরিশতাদের সংখ্যার পিছনের রহস্য হলো এই যে, সেই যিকিরের বর্ণসংখ্যা আর ফিরিশতার সংখ্যা

সমান।” মূল আরবীতে কথাটির বর্ণসংখ্যা তেত্রিশ, আর তাই তেত্রিশজন ফিরিশতা এই যিকিরের বদৌলতে নেকি লিখছিলেন সেই সাহাবীর আমলনামায়। ভাবা যায়!

কাজেই, আমরা যখন সালাতে দাঁড়াচ্ছি, দুআ পড়ছি, তা শুধুমাত্র ‘অভ্যাসের-বশে-সালাত’ হয়ে যাচ্ছে না তো? সালাতের সময় বলা দুআগুলো—কথাগুলো বুঝে পড়ছি তো? বুঝে বলছি তো?

সিজদায় অন্যান্য দুআ

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দুআ #১

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ: রব্বিগফির লী, রব্বিগফির লী

অর্থ: হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।[৬৪]

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দুআ #২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া‘আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা‘নী

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।[৬৫]

---

[৬৪] আবু দাউদ ১/২৩১, নং ৮৭৪; ইবনু মাজাহ নং ৮৯৭। আরো দেখুন, সহীহ ইবনু মাজাহ, ১/১৪৮।

[৬৫] আবু দাউদ, ১/২৩১, নং ৮৫০; তিরমিযী, নং ২৮৪, ২৮৫; ইবনু মাজাহ, নং ৮৯৮। আরো দেখুন, সহীহুত তিরমিযী, ১/৯০; সহীহ ইবনু মাজাহ ১/১৪৮।

রুকু / সিজদার দুআ #১

নবীজি রুকু এবং সিজদা, উভয় জায়গায় এই দুআ করতেন;

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ: সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগফির লী

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি আপনার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।[৬৬]

রুকু / সিজদার দুআ #২

سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-'ইকাতি ওয়াররূহ

অর্থ: (তিনি/আপনি) সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্রুটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত; ফিরিশতাগণ ও রূহ এর রব।[৬৭]

রুকু / সিজদার দুআ #৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তবুও আল্লাহর কাছে ছোট-বড় সকল ধরনের পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রুকু এবং সিজদায় ক্ষমা চাইতেন এভাবে;

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী যাম্বী কুল্লাহু; দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউয়ালাহু ওয়া 'আখিরাহু, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন— তার ক্ষুদ্র অংশ, তার বড় অংশ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।[৬৮]

---

[৬৬] মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৪৮৭; আবু দাউদ, নং ৮৭২

[৬৭] মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৪৭৪; আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭২

[৬৮] মুসলিম ১/৩৫০, নং ৪৮৩

তাশাহুদ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু, ওয়াত তইয়িবাতু।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

অর্থ: 'সকল অভিবাদন ও সম্মান আল্লাহর জন্য, সকল সালাত আল্লাহর জন্য এবং সকল ভালো কথা ও কর্মও আল্লাহর জন্য।'

আমরা একজন আরেকজনকে কথার শুরুতে অভিবাদন জানাই সালাম দেয়ার মাধ্যমে।

> কিন্তু আল্লাহকে আমরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে পারি না। কারণ, আল্লাহ নিজেই 'আস-সালাম'—সকল শান্তির মালিক এবং উৎস। তাঁকে আমরা বলতে পারি না, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!' সেজন্য তাশাহুদের প্রথম অংশ উৎসর্গ করা হয়েছে আল্লাহকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করে।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আপনি যখন কোনো রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করবেন, অন্যান্য দশজনকে যেভাবে সম্বোধন করেন, সেভাবে কিন্তু রাজাকে ডাকবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছেন রাজাদের রাজা! সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতি! তাঁর উপরে কোনো রাজা নেই। 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...' হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু অধিপতির জন্য সম্ভাষণ। সকল অভিবাদন, সম্মান, ভালো কথা ও কাজ কেবল আল্লাহরই জন্য।

*****

আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه

অর্থ: 'হে নবী, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।'

এখানে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা আমাদের সালাম ও দুআ দিচ্ছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু আমাদের দুআর মুখাপেক্ষী নন। তিনি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক উঁচু মাকামে পৌঁছে গেছেন। তারপরও আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করি। আসলে এতে লাভটা আমাদেরই হয়। কারণ, আমরা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পাঠালে, আল্লাহ আমাদের জন্য দশবার সালাম পাঠান! সুবহানআল্লাহ! স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম আসাটা গায়ে কাঁটা দেয়ার মতন একটা ব্যাপার!

আমার মনে আছে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী পড়ছিলাম। একবার ফিরিশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূলকে বললেন,

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ যে খাদিজা আসছে। তিনি এলে আল্লাহ এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবেন।'

আমার পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, সুবহানআল্লাহ এও কি সম্ভব? আল্লাহর কাছ থেকে স্বয়ং সালাম পাওয়া? এ কোন পর্যায়ের আনন্দ আর সম্মান? আমার মতন অধম বান্দার কাছে কি কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম আসবে? জি ইনশাআল্লাহ। এই অসম্ভব ইচ্ছাটাই সম্ভব হচ্ছে, নবীজির প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যমে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন।' [৬৯]

কথার নির্যাস হলো, তাশাহুদের প্রথম লাইনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সাদরে সম্ভাষণ জানালাম এবং দ্বিতীয় লাইনের মাধ্যমে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই সম্ভাষণের উত্তর দিলেন আমাদের দরুদ পাঠের মাধ্যমে।

*****

---

[৬৯] সহীহ সুনান নাসাঈ, হাদিস ১২৯৭

আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

অর্থ: 'আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।'

এবার আমরা দুআ করছি নিজেদের জন্য এবং পরের অংশে দুআ করছি আল্লাহর বাকি সমস্ত নেক বান্দাদের জন্য। আমরা শিখছি যেন দুআ করার সময় শুধু নিজের জন্য না চেয়ে সবার জন্য চাই। **'সলিহীন' হচ্ছেন আল্লাহর খুব কাছের এবং নেককার বান্দারা।** যারা আল্লাহর পাঠানো বিধান মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাশাহুদের এই অংশটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

> আমি যদি চেষ্টা করে কোনোভাবে আল্লাহর 'সলিহীন' বান্দাদের মধ্যে একজন হতে পারি, তাহলে পৃথিবীর ১.৯ বিলিয়ন মুসলিমরা যে যখনই নামাজে তাশাহুদ পড়বে, সেটা আমার জন্যও দুআ হিসেবে গণ্য হবে! সুবহানআল্লাহ!

কল্পনা করা যায়—গোটা বিশ্বের মুসলিমরা দিনের মধ্যে পাঁচবার করে আমার জন্য দুআ করবে! এর মধ্যে না জানি আল্লাহর কত প্রিয় বান্দারা আছেন, আল্লাহর বন্ধু আছেন। তাদের সবার দুআ পাওয়া যাবে যদি আমি সলিহীন হতে পারি। এটা আমাদের সবার জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সলিহীন হবার চেষ্টা করার পথে বিশাল এক অনুপ্রেরণা।

*****

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।'

তাশাহুদের শেষে এসে আমরা আবারও আল্লাহর সামনে নিজেদের দাসত্ব স্বীকার করছি। যদি এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে খুশি করার জন্য

এতক্ষণ নামাজ পড়েছি, তাহলে এখানে এসে এটা আবার মনে করিয়ে দিল যে, নিজের ইচ্ছা-লালসা, সোসাইটি, রেপুটেশন—সবকিছুর থেকে আল্লাহ বড়। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করব না। আর এই অনুভূতি রাখতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, নামাজের বাইরে প্রতিটি মুহূর্তে।

তাশাহুদের দ্বিতীয় লাইনে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঁচু মাকাম সম্পর্কে ধারণা পাই। ভেবে অবাক হই, অভাবনীয় চমৎকার মানুষটিও সবার আগে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করেন। এবং আমরাও তাঁরই সাক্ষ্য দিই। যেই মানুষটাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন শেষ নবী হিসেবে, যিনি আল্লাহর সাথে সশরীরে দেখা করে এসেছেন সাত আসমানের উপর থেকে, সেই তিনিও যখন আল্লাহর সামনে কোনো ক্ষমতা রাখেন না, সেখানে আমি আর আপনি কোথায় আছি বলুন? সুবহানআল্লাহ!

দরুদ

আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জীবনের সাথে মিশে না থাকলে আমাদের জীবন কেমন বিদঘুটে হতো? তিনি তাঁর সমগ্র জীবনটাকেই আমাদের জন্য দীপ্যমান উপমা হিসেবে রেখে গেছেন। আপনি জীবনের যেই সমস্যাটার কথাই ভাবুন না কেন, সেই সমস্যা এবং দুঃখ-যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি সেগুলোর সমাধান করেছেন আল্লাহর সাহায্যে। আমাদের জন্য সমাধানগুলো তিনি রেখে গেছেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহকে ভালোবাসতে, আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসতে। মাঝে মাঝে খুব করে মিনতি করি, 'ইয়া রব, জান্নাতে একটু ঠাঁই দিও, তোমার এই অসাধারণ নবীর পড়শি হয়ে তাঁকে চোখভরে দেখতে চাই।'

চলুন আজকে আমরা 'নামাজে মন ফেরানো' সিরিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠের ব্যাপারে আলোচনা করি, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, বিলালের গল্প শুনি। সে নতুন দ্বীনে এসেছে। ইসলামকে নতুন করে চিনতে শিখছে। নামাজে মনোযোগী হবার জন্য দরুদ নিয়ে লেখাপড়া করছে। দরুদ নিয়ে তার মুখেই বিস্তারিত শোনা যাক।[৭০]

দরুদ একটি ফার্সি শব্দ যা পরে উর্দুতে আসার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম—উভয়টিই বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এখানে দরুদ এবং সালাত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[৭০] Baseera Media থেকে এই বর্ণনাটি নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> ‘অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর জন্য সালাত—দরুদ পড়ো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।’[৭১]

এ কী শুনল বিলাল!

শুধু সৃষ্টির সকল ফিরিশতাই নয়, স্বয়ং আল্লাহ—সৃষ্টিকর্তা, এই সৃষ্টি জগতের পালনকর্তার সুন্নাহ হলো আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত তথা দরুদ পেশ করা। বিলালের হাতের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় এটা ভেবে যে, আল্লাহ তাঁর সুন্নাহ আমাদেরকে পালন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এত এত ভুল আর গুনাহ করতে থাকা আমাদেরকেও তাওফিক দিয়েছেন এই পুণ্য অর্জনের!

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর দেয়া সম্মানগুলোর মধ্যে একটি তো বটেই, এটা যে মানবজাতির জন্য কত বড় সম্মান আর সুযোগ সেটা ভেবে বিলালের মনটা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

সূরা আহযাবের এই আয়াতটি পড়ার পর আবু মাসউদ উকবা ইবনু আমীর গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

> ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আদেশ করেছেন আমরা যেন আপনার উপর সালাত আর সালাম পাঠ করি। আমরা তো সালাম প্রেরণ করতে জানি, কিন্তু সালাত কীভাবে পাঠ করব?’

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া ‘আলা আ-লি

---

[৭১] সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৬

মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।[৭২]

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমকে ও তার পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম ও তার পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

> 'আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ' এর অর্থ দাঁড়ায় 'হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপনার সালাত প্রেরণ করুন।' বিলাল জানে যে সালাত শব্দটির অর্থ দুআ বা প্রার্থনা বা কাউকে শ্রদ্ধাভরে ডাকা। তাহলে আল্লাহর সালাত মানে আসলে কী?

বিলাল নিশ্চিত এ প্রশ্নের উত্তর স্কলারগণ অবশ্যই দিয়েছেন। তাকে শুধু একটু পড়াশোনা করে বের করতে হবে। কিছুদিন পড়াশোনা করে এবং আলিমদের বয়ানের মাধ্যমে বিলাল জানতে পারল আল্লাহর সালাত বলতে চারটি বিষয় বোঝায়:

এক.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিরিশতাদের সামনে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের প্রশংসা করেন। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত ছাত্র আবুল আলিয়া রহ. বলেন,

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত মানে হলো, আল্লাহ ফিরিশতাগণের সামনে নবীজির নাম আলোচনা করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন।"

---

[৭২] বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ৬/৪০৮, নং ৩৩৭০

দুই.

আল্লাহর সালাত মানে হলো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত নাযিল করেন।

তিন.

আল্লাহর সালাতের আরেকটি মানে হলো, আল্লাহর মাগফিরাত বা ক্ষমা। ক্ষমার কথা আসতেই বিলালের মনে পড়ল সূরা নাসরের কথা। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন,

> ‘যখন আল্লাহর দেয়া সব কাজ সঠিকভাবে পালন করা হয়ে যাবে, তখন যেন তিনি ইস্তিগফার করেন অর্থাৎ, ক্ষমা চান।’[৭৩]

বিলালের মন হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি ইস্তিগফার করতে বলা হয়ে থাকে বিলালের মতো প্রতিনিয়ত পাপ করতে থাকা বান্দার কী হবে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, আল্লাহ তো গাফুরুর রহিম, তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। বিলাল মনস্থির করে ফেলল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো **সেও দৈনিক ১শ’ বার বা তারও অধিক ইস্তিগফার করবে। ইনশাআল্লাহ প্রতি নামাজের পর ২০ বার করে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার চেষ্টা করবে সে এখন থেকে।**

চার.

সালাতের ব্যাপারে চতুর্থ যে অর্থ বিলাল জানতে পারল তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও সম্মান আরো সমুন্নত করা। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ‘ওয়া রফায়ানা লাক্বা যিকরক।’ অর্থাৎ, ‘আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।’[৭৪]

স্কলারগণ বলেছেন,

---

[৭৩] সূরা নাসর ১১০ : ৩

[৭৪] সূরা আল-ইনশিরাহ ৯৪ : ৪

> ‘এ কথার অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি হলো কিয়ামতের ময়দানে সকল মানুষ আতঙ্কময় চিন্তায় পাগলপ্রায় অবস্থায় সময় পার করতে থাকবে। ততক্ষণে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই জেনে যাবে যে, সত্য আসলে কী। দলে দলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই মিলে একের পর এক নবী-রাসূলদের কাছে অনুরোধ করতে থাকবে, যেন তারা আল্লাহর কাছে বিচার আরম্ভ করার সুপারিশ করেন। কিন্তু সেদিন নবী-রাসূলগণও নিজেদের নিয়ে এত বেশি চিন্তিত থাকবেন যে তারা গোটা মানবসমাজের এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলবেন, ‘ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি।’

একে একে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সবাই আমাদের এই আকুতি প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশ্য ঈসা আলাইহিস সালাম সবাইকে বলবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে। পুরো মানবসমাজ ঈমানদার-কাফির সবাই আসবে সৃষ্টির সেরা মানব হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। আজ দুনিয়াতে শুধু বিশ্বাসীরা তাঁর সরাসরি প্রশংসা করছে। আর সেদিন পুরো মানবসমাজ তাঁর সাহায্য চাইবে আর প্রশংসা করবে।

বিলাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাহ পড়ার সময় জেনেছিল আরবীতে মুহাম্মাদ নামের অর্থ হলো, যিনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত। বিলালের তো মনে হয় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহাম্মাদ নামটি প্রশংসিত হচ্ছে দরুদের মাধ্যমে। আবার মানবজাতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ নির্বিশেষে তাঁর প্রশংসা করবে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর এক মহা অলৌকিক নির্দশন ছাড়া কীই-বা হতে পারে!

তার মানে বিলাল বুঝতে পারল সব মিলিয়ে আমরা যখন বলি ‘আল্লা-হুমা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ’—এর মানে দাঁড়ায়,

> ‘হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ নামটি উচ্চারণ করুন আপনার ফিরিশতাগণের সামনে। হে আল্লাহ, আপনি তাঁর উপর আপনার রহমত বর্ষিত করুন, হে আল্লাহ, তাঁকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ, তাঁকে মর্যাদার শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত করুন।’ সুবহানআল্লাহ!

আমরা দুআ করছি যেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সালাত প্রেরণ করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর।

দুআটির পরের অংশটুকু হলো,

‘ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ।’ (وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)

যার অর্থ হলো, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহালের উপর। এই আহাল শব্দটির দুটি মানে। একটি হলো পরিবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার।

অনেক স্কলার বলেন,

> “এই আহাল শব্দটি এসেছে আরবী শব্দ ‘আলা ইয়া উলু’ থেকে, যার মানে হলো সমর্থক বা অনুসারী। তাই অর্থ হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা। অর্থাৎ ‘ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ’ এর অর্থ দাঁড়ায়, ‘এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার, সমর্থক বা অনুসারীদের উপরও।”

এখানে একটা কথা বলে নেয়া ভালো যে, **এই দুআর ভাগীদার হতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার বা উত্তরসূরিদের ঈমানদার এবং ভালো মুসলিম হতে হবে।** আমরা জানি, নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বাবা, নবী পরিবারের সদস্য হওয়াতেও যেমন লাভ হয়নি, তেমনি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি বা পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ দয়া পাওয়ার অবকাশ নেই। এই দুআ বা বিশেষ দয়া তখনই কাজে আসবে যখন কেউ ঈমান আনবে এবং আল্লাহর দেখানো পথে চলবে।

> এখানে পরিবার মানে হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্য কিংবা উত্তরসূরি।

তাহলে সমর্থক বা অনুসারী কারা?

এই সমর্থক বা অনুসারী হলো তাঁর পুরো উম্মাহ। সুবহানআল্লাহ!

যখন আমরা দরুদ পড়ছি সকল মুসলিম উম্মাহসহ নিজেদের জন্যও দুআ করছি।

বিলাল আত্তাহিয়াত বা তাশাহুদেও এই ব্যাপারটি দেখেছে। কেউ যদি ঈমানদার হয় সে পুরো মুসলিম বিশ্বের তাশাহুদ এবং দরুদে তার ভাগীদার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমরা যখন দরুদ পড়ছি 'আল্লাহুমা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ'; এর মানে দাঁড়াচ্ছে, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি আপনার সালাত প্রেরণ করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার এবং পুরো উম্মাতের উপর।' এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উম্মতের উপর সালাত এসেছে কারণ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী। বিলালের করুণা হতে থাকে সেই সকল মানুষদের নিয়ে, যারা বলে আমরা আল্লাহকে মানি কিন্তু রাসূলুল্লাহকে মানি না। আস্তাগফিরুল্লাহ!

ইসলামিক স্কলাররা বলেন, এই দলভুক্তরা কোনোভাবেই মুসলিম নয়। ইবনু আব্বাস বলেন,

> 'কালেমা থেকে শুরু করে যেখানেই আল্লাহর কথা এসেছে ঠিক তার পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাও এসেছে।'

- লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
- আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
- আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

*****

দরুদের পরের লাইনটি হলো,

'কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামি দুম্মাজীদ'

كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

যার অর্থ হলো: যেমনটি আপনি করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবার ও অনুসারীদের উপর।

দরুদের এই লাইনটি কিছুটা বিলালের মনে কিছুটা কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম বা অবস্থান ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনেক উপরে, তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মতো কেন বলা হচ্ছে? যদিও দুজনেই মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দুজন মানুষ, দুজনেই আল্লাহর খলীল, যার অর্থ হলো বাছাই করে নেয়া কাছের বন্ধু। তারপরও আমরা জানি, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তুলনায় একধাপ উপরে। অনেক হাদিস থেকে এবং পবিত্র কুরআন থেকে আমরা তা জানতে পেরেছি। তাহলে কেন বলা হচ্ছে আল্লাহ আপনার সালাত প্রেরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যেমনটা করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর, যিনি কি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ নন?

এর সমাধান দিচ্ছেন ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। তিনি বলেন,

> ‘এই বিষয়টি বুঝতে একটি ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি থেকে শত শত নবী এসেছিলেন। যার মধ্যে রয়েছিলেন মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের মতো রাসূল। এমনকি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পর আসা প্রত্যেক নবী এবং রাসূল এসেছেন উনারই উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে। আর আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী এবং রাসূল। তাঁর উত্তরসূরির ভেতর থেকে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবে না। কাজেই যখন আমরা বলছি, আল্লাহ সালাত প্রেরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যেমনটা করেছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর, তখন সেই শত শত নবী-রাসূলসহ তাদের পরিবার এবং অনুসারীদের উপর আসা বরকত এই দুআর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।’ সুবহানআল্লাহ!

*****

দরুদের পরের অংশে আমরা একইভাবে দুআ করি শুধু সালাত শব্দটির বদলে বারাকাহ শব্দটি ব্যবহার করি। আমরা বলি,

‘আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়ালা আলি ইবরাহীম’,

অর্থাৎ, 'আল্লাহ আপনার বারাকাহ দিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারের উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর। ঠিক যেমনটা আপনি দিয়েছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, তার পরিবারের উপর এবং তার অনুসারীদের উপর।'

বিলালের মনে প্রশ্ন আসলো বারাকাহ মানে কী? এ ব্যাপারে কিছু পড়াশোনা করে বিলাল জানতে পারল এর তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. কোনো ভালো কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

২. ধারাবাহিকতা অর্থাৎ, সেই বৃদ্ধি অবিরত থাকা।

৩. স্থায়িত্ব অর্থাৎ, সেই ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ার পর যা আসবে তা হবে স্থায়ী।

সুবহানআল্লাহ!

বিলাল চিন্তা করে দেখল, এই দুজনের প্রতি (নবীজি এবং ইবরাহীম আ.) আল্লাহর সালাত এবং বারাকাহ এমনভাবে এসেছে যে, আল্লাহ শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজের খলীল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। দুজনেই আল্লাহর ঘরের সাথে অন্যরকমভাবে সম্পৃক্ত। একজন কাবাঘর নিজ হাতে নির্মাণ করেছিলেন, আরেকজন কাবাকে পরিশুদ্ধ করেছেন, শিরকমুক্ত করেছেন। এই দুজনেই পুরো মানব সভ্যতার সবচাইতে শ্রদ্ধার এবং সর্বোত্তম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন। একজন পুরো মুসলিম উম্মতের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আরেকজন মুসলিমদের কাছে তো বটেই পথভ্রষ্ট ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের কাছেও একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রয়েছেন।

*****

সালাত—দরুদ শেষ হয় 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' বলে। যার অর্থ হলো 'ইয়া আল্লাহ, আপনি হামীদ এবং মাজীদ।'

এখানে আল্লাহর দুটো নাম বিবৃত হয়েছে; হামীদ এবং মাজীদ। বিলালের মাথায় প্রশ্ন আসে আল্লাহর এত নাম থাকতে হামীদ এবং মাজীদ এই দুটো নামই এখানে ব্যবহৃত হলো কেন?

বিলাল আল্লাহর এই দুটো নাম একটু জানার চেষ্টা করে দেখল **হামীদ হলো এমন এক সত্তা যিনি কি না সকল প্রশংসার দাবীদার।** কারো প্রশংসা করা হয় যখন কেউ কোনো কিছু করে। কিন্তু যিনি হামীদ তিনি কোনো কারণ ছাড়াই সকল প্রশংসার দাবীদার। অর্থাৎ, এই প্রশংসার জন্য উনার কিছু করবার প্রয়োজন নেই। উনি শুধু উনার পরিচয়ের কারণে এই চূড়ান্ত প্রশংসার দাবীদার। **আর মাজীদ শব্দের অর্থ হলো মহিমান্বিত, বা মর্যাদাপূর্ণ বা মহান সত্তা। যিনি মানুষকে সম্মান দেন।**

সুবহানআল্লাহ!

কী অপূর্ব উপসংহার! এ যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসার দাবীদার। যেকোনো সৃষ্টির থেকে উনার অবস্থান অনেক উপরে। কিন্তু এই প্রশংসা বা সম্মানের উৎস হলো আল হামীদ, আল মাজীদ অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান যে পেয়েছেন তার কারণ হলো আল হামীদ, আল মাজীদ এই সম্মান তাঁকে দিয়েছেন। আবার ব্যাপারটিকে এভাবেও দেখা যায়—

> মুহাম্মাদ—যিনি বারবার প্রশংসিত হন তাঁর প্রশংসা যেন স্বয়ং আল হামীদও করেন সেটার জন্য আমরা দুআ করছি। যিনি আল হামীদ, আল মাজীদ তাঁর প্রশংসার চাইতে ভালো প্রশংসা আর কী হতে পারে।

বিলাল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত বা দরুদ পেশ করার তাৎপর্যগুলো শিখতে গিয়ে জানল, যখন আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার সালাতের জন্য দুআ করি, তখন আল্লাহ আমাদের উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।

সুবহানআল্লাহ!

একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "যে আমার উপর একবার সালাত পাঠ করল, তার আমলনামায় দশটি ভালো কাজ লিখা হলো, দশটি গুনাহ তার আমলনামা হতে মোছা হলো এবং জান্নাতে সেই ব্যক্তির অবস্থান দশ ধাপ উপরে উঠানো হলো।"[৭৫]

---

[৭৫] নাসাঈ : ১/১৪৫, মুসনাদে আহমাদ : ১/১০২

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "কিয়ামতের দিন আমার কাছে অতি উত্তম হবে ওই ব্যক্তি, যে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করে।"[৭৬]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

> "জমিনে আল্লাহর একদল বিচরণশীল ফিরিশতা রয়েছে, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।"[৭৭]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "আমার প্রতি কেউ দরুদ পাঠ করলে আমি তার উত্তর দিই।"[৭৮]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "কেউ আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলে আমি তা শুনতে পাই। আর দূর থেকে সালাম দিলে আমাকে তা পৌঁছানো হয়।"[৭৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ৭০টি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা তার জন্য ৭০ বার ইস্তিগফার করেন।"[৮০]

উবাই ইবনু কা'ব হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস হতে বিলাল জানতে পারল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৭৬] তিরমিজি

[৭৭] নাসাঈ ও দারেমি

[৭৮] আবু দাউদ, বায়হাকি

[৭৯] বায়হাকি

[৮০] মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত, হাদিস : ৯৩৫

> তাঁর উপর সালাত—দরুদ পড়তে থাকলে সব ধরনের দুশ্চিন্তা চলে যায় এবং গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিলালের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার বৃদ্ধ বাবার কথা চিন্তা করে। বিলাল বাবার সাথে বসে কয়েকবার রাসূলুল্লাহর উপর সালাত—দরুদ পেশ করে ফেলল। অদ্ভুত এক প্রশান্তির ভাব যেন ছেয়ে গেল তার মনের ভেতর।

বিলাল আরো জানতে পারল একদল ফিরিশতা রয়েছেন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানোর জন্য কে কে তাঁর উপর সালাত পেশ করছে। এই যে কিছুক্ষণ আগে বিলাল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনকে শান্ত করতে দরুদ পড়েছে, ফিরিশতারা নবীজির কাছে বিলালের নাম উল্লেখ করে বলেছে যে বিলাল তাঁর জন্য সালাত পেশ করেছে।

বিলালের চোখের পানি যেন আর থামে না। শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ রাসূল, শ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহর হাবীব যার সুপারিশে বিচার দিবসের বিচার শুরু হবে, তিনি বিলালের নাম জানেন! তিনি জানেন বিলাল ভালোবেসে তাঁর উপর সালাত পেশ করেছে। বিলালের আরো মনে পড়ে গেল সেই হাদিসের কথা জেনে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচার দিবসে তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছে থাকবেন যারা তাঁর উপর সর্বাধিক সালাত বা দরুদ পড়েছেন। বিলাল প্রতিজ্ঞা করল এখন থেকে প্রতি নামাজের পর ইস্তিগফার, আয়াতুল কুরসীর পাশাপাশি কমপক্ষে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পেশ করবে। বিলালের অধ্যয়ন তালিকায় আরো একটি জিনিস সংযোজিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাতের বারাকাহ কী কী তা জানা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পেশ করা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বিলাল জানতে পারল কখন এটি পড়া উচিত।

এক.

নামাজের শেষে যে সালাম ফেরানোর আগে দরুদ পড়তে হয় সেটা তো বিলালের আগেই জানা ছিল। তবে বিলাল আরো জানতে পারল, হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সালাতে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাহ। আর শাফিঈ রহ. এটাকে ফরজ বলতেন।

দুই.

বিলাল আরো জানল জানাযার নামাজে দ্বিতীয় তাকবীরের পর অনেকের মতে দরুদ শরীফ পড়া ওয়াজিব।

তিন.

বেশিরভাগ আলিমদের মতে ঈদের নামাজের খুতবা এবং জুম্মার নামাজের খুতবা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হবে না যদি আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ না করা হয়।

চার.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযানের পর তাঁর উপর সালাত পাঠ করবে বা শাফায়াতের জন্য দুআ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। বিলাল সেদিন তার এক প্রবাসী বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় জানতে পারল তারা না কি আযান শুনতে পায় না। কারণ, সেখানে আযান না কি শুধু মসজিদের ভেতরেই দেয়া হয়। একটা মুসলিম পরিবেশে থাকার কারণে যে প্রতি ওয়াক্তে আযান শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের দুআ করে নিজের শাফায়াত নিশ্চিত করার অপূর্ব সুযোগ বিলাল পেয়েছে এটা ভেবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিলালের মন ভরে গেল।

পাঁচ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার। তাই সেদিন আমার জন্য সালাত বা দরুদ বাড়িয়ে দিও।"

ছয়.

যখনি আমরা কোনো দুআ করব তার আগে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পড়ে তারপর দুআ করব। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, এক লোক এই বলে দুআ করছে যে, 'হে আল্লাহ, আমাকে অমুক জিনিস দিন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি তাড়াহুড়ো করছে। এভাবে দুআ কবুল হবে না।'

তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে দুআ করলে সেটা কবুল হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, 'যখনি দুআ করবে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তারপর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, তারপর দুআ করবে।' অর্থাৎ, প্রতিটি দুআর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত—দরুদ পাঠ করাটাই সুন্নাহ।

সাত.

প্রতিবার যখনই কোনো জমায়েত হবে, তা হতে পারে বন্ধুদের সাথে কিংবা আত্মীয়স্বজনদের সাথে, সেখানে সবার থেকে বিদায় নেয়ার পর একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যেখানে কিছু লোক একত্র হলো এবং সেখানে আল্লাহর প্রশংসা এবং আমার কথা আলোচনা হলো না শেষ দিবসে সেই জমায়েত নিয়ে তারা অনুশোচনায় ভুগবে।'

আট.

আরেকটি হাদিস জেনে বিলাল ভয় পেল এবং অনুশোচনায় ভুগল। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন,

> 'তোমারা কি জানো সবচাইতে কৃপণ লোকটি কে?' সাহাবীরা বললেন, 'কে ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, 'যে আমার নাম শুনল, কিন্তু আমার উপর সালাত— দরুদ পড়ল না।' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কত হাজার-লাখবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে বিলালের সালাত পাঠ করা হয়নি, এ হাদিসটি না জানার কারণে। বিলাল প্রতিজ্ঞা করল, ইনশাআল্লাহ এখন থেকে যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনবে সাথে সাথে বলবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বারের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় পরপর তিনবার বললেন আমিন। সাহাবীগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> "আমি মিম্বারে ওঠার সময় জিবরীল এসে আমাকে বললেন, 'যে রমাদান পেল কিন্তু তার গুনাহ্ মাফ করাতে পারল না, সে ধ্বংস হোক।' আমি বলেছি, আমিন। তারপর জিবরীল বললেন, 'যে কি না তার বাবা-মাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেল কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, সে ধ্বংস হোক।' আমি বললাম, আমিন। তারপর জিবরীল বললেন, 'যে ব্যক্তি আপনার নাম শুনল কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পড়ল না, সেও ধ্বংস হোক।' আমি বললাম, আমিন।"

বিলাল দুআ করল, আল্লাহ যেন তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরো বেশি বেশি সালাত পাঠ করার তাওফিক দেন।

আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

দুআ মাসূরা

আমরা নামাজে তাশাহুদের পরে একটা দুআ পাঠ করি যেটা আমাদের দেশে ‘দুআ মাসূরা’ নামে পরিচিত। এই দুআ নিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি চমৎকার ঘটনা আছে।

সেদিন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাইখ হাসিব নূরের ক্লাস করছিলাম। সেদিন ক্লাসে তিনি আমাদেরকে এই দুআটাই পড়াচ্ছিলেন। শেষের দুই লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রীদের দিকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন,

> ‘আমার উপস্থিত ছাত্রীরা, আল্লাহ মাফ করুক, ধরো, তোমাদের স্বামীরা যদি পরকীয়া করে তোমাদের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে। এরপর খুব করে মাফ চায়। কথা দেয় যে আর ঐ পথে যাবে না। কে কে আছো, যারা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে?’

প্রায় ১০০ জনের ক্লাসে ৩০ জনের মতো হাত উঠাল।

শাইখ বললেন, ‘বাহ! তোমাদের মন তো অনেক বড়! আচ্ছা ঠিক আছে, ধরলাম সংসারের সুখের খাতিরে তাকে মাফ করে দিয়েছ। সংসার চলছে ভালোই। কয় মাস পরে আবার টের পেলে যে সে তার পরকীয়ার প্রেমিকাকে ভুলতে পারেনি। এখনও তোমার অজান্তে চুটিয়ে প্রেম চলছে। আবারও সে ধরা খেয়ে তোমার কাছে অনেক মাফ চাইল। আর ঐ কাজ করবে না বলে ওয়াদা দিল। তোমাদের মধ্যে কারা কারা এই পর্যায়ে এসে তার স্বামীকে ক্ষমা করে দিবে হাত তোলো।’

মোটে ১০টার মতো কাঁপা কাঁপা হাত উঠতে দেখা গেল। শাইখ বললেন, ‘তোমাদের ক্ষমা করার ক্ষমতা দেখে আমি আসলেই অবাক!’ এবার শাইখ

বললেন, 'প্রিয় ছাত্রীরা, যদি দ্বিতীয় বারের মতো হাজব্যান্ডকে মাফ করে দেয়ার পরও আবারও ধরা খেয়ে মুখ লাল করে ফিরে এসে সে তোমার কাছে ক্ষমা চায়। তখন তাকে কে কে মাফ করতে পারবে?' দেখলাম এক নিকাবী বোন খুব চাপা করে তার হাতটা ধীরে ধীরে তুললেন। চারপাশে তাকিয়ে আর কোনো হাত দেখতে পেলাম না। পুরো ক্লাসে পিনপতন নীরবতা।

শাইখ এবার কথা শুরু করলেন,

> 'জেনে রেখো, আমাদের রব আল্লাহ হচ্ছেন গফুরুর রহীম। আমরা যেখানে প্রথমবার মাফ করতেই ১০ বার চিন্তা করি আর তৃতীয় বার মাফ করার কথা ভাবতেই পারি না, সেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে যান। ৩ বার, ৩শ' বার, ৩ মিলিয়ন বার—যতবার ইচ্ছা আল্লাহর হক তুমি নষ্ট করে যাও না কেন—তিনি বারবার তোমাকে মাফ করবেন। পরকীয়ার থেকেও জঘন্য গুনাহ বারবার পুনরাবৃত্তি করলেও তিনি মাফ করবেন যতক্ষণ ধরে তুমি খাঁটি তাওবা করে তার দিকে ফিরে আসতে থাকবে। নিঃশ্বাস ফুরোলেই কেবল এই দরজা বন্ধ হবে। এমন একজন রবের কথা অমান্য করতে আমাদের বুকগুলো কি একটুও কেঁপে ওঠে না!'

সুবহানআল্লাহ! এই দুআটার শেষের অংশে 'গফুরুর রহীম' এর এই ব্যাখ্যা আমি কখনো ভুলতে পারিনি। আসুন এখন বিস্তারিত দুআটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন,

> 'ইয়া আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটা দুআ শিখিয়ে দিন, যেটা পড়ে আমি নামাজে আল্লাহকে ডাকতে পারব।'

নবীজি বললেন, নামাজে আল্লাহর কাছে দুআ করে বলবে,

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জলামতু নাফসি যুলমান কাসিরাও, ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলি মাগফিরাতম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনি ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম। [৮১]

---

[৮১] সহীহ বুখারী

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ،
فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি নিজের উপর অত্যধিক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহম করো, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

'জুলুম' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে, কোনো অত্যাচারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার থেকে দুর্বল কারো সাথে অবিচার করছে। এরকম অত্যাচার করাকে আমরা মোটেও ভালো চোখে দেখি না। **অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর সবচেয়ে বড় অত্যাচারটা করি যখন আমরা আমাদের আত্মাকে আল্লাহর হক থেকে বঞ্চিত করি। যতবার আমরা পাপ করি, এর মাধ্যমে নিজেদের উপর অত্যাচার করি। আল্লাহর আদেশ অমান্য করা আত্মার উপর সবচেয়ে বড় জুলুম!** নামাজের এই পর্যায়ে এসে আমরা নিজেদেরকে নিজ আত্মার অত্যাচারী হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি এবং যালিমে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

আমরা যখন যালিম হয়ে যাই, তখন আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। তাই আল্লাহর কাছেই 'মাগফিরাহ' এবং 'রাহমাহ' চাই। আল্লাহর কাছেই ক্ষমা ও রহমত চাই। 'ফাগফিরলি মাগফিরাতান' এবং 'ওয়ারহামনি' এই দুটো শব্দের মানে হলো আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া ও রহমত কামনা করা। কিন্তু এদের মধ্যে খুব সুন্দর একটা পার্থক্য আছে।

এখানে 'মাগফিরাহ' এর তাৎপর্য হলো, বান্দা যত বড় গুনাহই করুক না কেন, আল্লাহ মাফ করতে সক্ষম। আর 'ওয়ারহামনি' এর তাৎপর্য হলো, বান্দা যতবারই গুনাহ করুক না কেন, আল্লাহর রহমত থেকে সে দূরে সরে যায় না।

এটাও কিন্তু শয়তানের ধোঁকা যখন আমরা নিজেদের গুনাহকে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বড় ভাবা শুরু করি। মনে রাখবেন, আপনার গুনাহর পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য যতই জঘন্য লাগুক না কেন, "গফুরুর রহীম" এর রহমত থেকে সেটি বড় নয়। তাই সময় থাকতে আমাদের আল্লাহর ক্ষমার দিকে ফিরে আসা উচিত!

সুবহানআল্লাহ! এই 'গফুরুর রহীম' এর তাৎপর্যটুকু শাইখ হাসিব নূর ভালোভাবেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আশা করি প্রিয় পাঠক এবং

পাঠিকা, আপনাদেরও অন্তরে গেঁথে গেছে।

ইয়া গফুরুর রহীম! ইয়া আল-আফুও! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর থেকে সকল আযাবকে উঠিয়ে নিন, আমরা যে আপনারই ক্ষমা এবং রহমতের ভিখারি। আমিন।

তাশাহুদ এর বিস্ময়কর তাফসীর

মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য ডাকছেন। কল্যাণের পথে ডাকছেন। বিলাল[৮২] সে ডাকে সাড়া দিল। চলে এলো মসজিদে। আল্লাহু আকবার বলে, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা দিয়ে বিলাল সালাত শুরু করল। আল্লাহু আকবার বলে বিলাল ঘোষণা দিল আল্লাহ বিলালের চাকরির চিন্তার চেয়েও বড়। আর্থিক চিন্তার কষ্টের চেয়েও বড়। সন্তানের মৃত্যুর চেয়েও বড়। সন্তানের সর্বোচ্চ সাফল্যের চেয়েও বড়। বিলালের মায়ের হাসি, বাবার আদর, তাদের অসুস্থতার কষ্টের চেয়েও তিনি বড়। দুর্ঘটনায় অঙ্গহানির হবার কষ্টের চেয়েও বড়। বাড়ি কেনা, গাড়ি কেনার চিন্তার চেয়েও বড়। এই মহাকাশ, এই কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়েও বড়। সেই সত্তার কাছে বিলাল মাথা নত করছে, কথা বলছে। আর তিনি বিলালের কথার উত্তর দিচ্ছেন। তাঁর দাসের কথার উত্তর দিচ্ছেন।

কিন্তু বিলাল যে মনোযোগটা ধরে রাখতে পারছে না। অফিসের কথা চলে আসছে মাথায়। মেয়েটার স্কুলে ফোন দিতে বলেছিল। সে ভুলে গিয়েছিল। সেটাও মনে পড়ল নামাজের সময়। এসবের মধ্য দিয়েই নামাজ শেষে বিলাল প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে চেষ্টা করবে কীভাবে নামাজকে আরেকটু ভালো করা যায়। সে ভেবে দেখল, নামাজের সূরাগুলোর মানে নিয়ে কিছুটা জানার চেষ্টা করার কারণে তার সেই অংশগুলোতে মনোযোগ ধরে রাখা কিছুটা সহজ হয়েছে। কিন্তু কিছু অংশ আছে যেখানে খালি কিছু মুখস্থ কথা বলে যাওয়া হয়। বিলাল সেই কথাগুলোর মানে জানার চেষ্টা কখনো করেনি। বাংলাতে যা-ই একটু-আধটু কিছুটা অর্থ

---

[৮২] বিলাল। নতুন দ্বীনে এসেছে। ইসলামকে নতুন করে চিনতে শিখছে। নামাজে মনোযোগী হবার জন্য তাশাহুদ নিয়ে লেখাপড়া করছে। তাশাহুদ নিয়ে তার মুখেই বিস্তারিত শোনা যাক।

পড়েছে, তা মোটামুটি কঠিন এক গদ্যের মতো মনে হয়েছে।

প্রথমেই তার যে অংশের কথা মাথায় আসলো তা হলো 'তাশাহুদ' বা নামাজে সালাম ফেরানোর আগে বসে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতেন সেগুলো। একটু খোঁজ নিয়ে বিলাল জানল, নামাজের শেষ অংশে বসে প্রথমেই যা পড়া হয় তাকে আত্ত্বাহিয়্যাত অথবা তাশাহুদ বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচরকমভাবে এটি পড়তেন। এই পাঁচটি তাশাহুদই কোনো না কোনো সাহাবী জানিয়ে গেছেন।

*****

বিলাল যেই তাশাহুদটি জানে সেটা ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে আসা। ইবনু মাসউদ রা. ছাত্রদেরকে শুধু যে এই তাশাহুদটিই শিখিয়েছেন তা কিন্তু নয়। বরং তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চমৎকার একটি আদব সম্পর্কেও বলেছেন। এই তাশাহুদটি শেখানোর সময় ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুহাতের ভেতরে। এই ব্যাপারটি ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এত প্রিয় ছিল যে, পরে তিনি যখন তার ছাত্র আল-কামারকে এটি শিখিয়েছেন, তিনিও আল-কামার রহিমাহুল্লাহর হাতটি রেখে দিয়েছিলেন তার দুহাতের মাঝেখানে। এরপর একই আদবের সাথে আল-কামার শিখেয়েছেন তার ছাত্র ইবরাহীম আন নাখাঈকে। ইবরাহীম আন নাখাঈ একইভাবে শিখিয়েছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাকে এবং হাম্মাদ ইবনু সালামা একই আদবের সাথে শিখিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহকে।

ইসলামি ইতিহাসের আলিমদের এই চর্চাটি হাবীবুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণগত এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যের আরেকটি উদাহরণ। উত্তম আচরণের এমন কত শত শত উদাহরণ, কত অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে আছে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনজুড়ে। কিন্তু বিলাল যে তা পুরোপুরি মেনে চলতে পারছে না। তার মনে পড়ে গেল, ছোট্ট মেয়েটাকে পড়ানোর সময় অধৈর্য হয়ে কত বকা দিয়েছে। অথচ একটু আদর, একটু স্নেহ, ব্যাপারটাকে কত সুন্দর করে তুলতে পারত। তাশাহুদ নিয়ে এতটুকু জেনে বিলালের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। তার মনে হলো শেখানোর আদব যখন এত চমৎকার, না

জানি এর ভেতরে থাকা অর্থ কত সুন্দর হবে। তার আফসোস হতে থাকল, এত বছর এটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা না করার কারণে।

*****

তাশাহুদ এর বাংলা উচ্চারণ,

'আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বোয়্যিবাত, আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু, আসসালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' [৮৩]

'তাহিয়্যাত' (أَلتَّحِيّاتُ) শব্দের অর্থ হলো অভিবাদন বা সম্ভাষণ। **আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি** (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) মানে হলো আল্লাহর জন্য অভিবাদন বা সম্ভাষণ। ইংরেজিতে এখানে একটি 'The' শব্দ আছে। তার মানে ইংরেজিতে বলতে গেলে 'The greetings are for Allah.' আমরা সাধারণত শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণ জানিয়ে থাকি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে। সালাম বা শান্তি তো আসেই আল্লাহর কাছ থেকে। তাহলে আল্লাহকে যদি শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণ জানাতে হয় তাহলে আমরা কীভাবে আল্লাহকে সম্ভাষণ জানাব! এর উত্তরে আল্লাহকে সম্ভাষণ জানাতেই এই তাশাহুদের ব্যবস্থা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ বিন সালিহাল ইজলি ঠিক করলেন তিনি **আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি** অর্থাৎ, সম্ভাষণ আল্লাহর জন্য এই কথাটির মর্মার্থ আসলে কী তা জানার চেষ্টা করবেন। তিনি প্রথমে গেলেন আল কিসাই নামের তখনকার সময়ের এক বড় ইসলামিক স্কলারের কাছে। তিনি বললেন, এই কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে বারাকাহ বা শুভকামনা। সালিহাল ইজলি রহ. আবার প্রশ্ন করলেন শুভকামনা মানে কী? তিনি বললেন, আমি এতটুকুই জানি। স্বভাবতই উনি এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারপর তিনি গেলেন ইমাম আবু হানিফার শিষ্য, সে সময়ের একজন বড় স্কলার মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আস শাইবানির কাছে। উনি বললেন, এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি, আল্লাহর কাছে নিজের দাসত্ব প্রমাণ করার জন্য। এবারও আব্দুল্লাহ আল ইজলি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

---

[৮৩] বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১/১৩, নং ৮৩১; মুসলিম ১/৩০১, নং ৪০

এরপর তিনি আসলেন ইমাম আশ-শাফিই রহিমাহুল্লাহর কাছে। তিনি ইমাম আশ-শাফিই রহিমাহুল্লাহকে বললেন, আমি অমুক অমুকের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কেউ আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি এর মানে আসলে কী আমাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারেনি। ইমাম আশ-শাফিই রহ. বললেন, উনারা বলতে পারেননি কারণ, উনারা তো কবি নন।

একটি বিষয় ইমাম আশ-শাফিই রহিমাহুল্লাহকে অন্য সব বড় স্কলারদের থেকে আলাদা করে। আর তা হলো তিনি শুধু ইসলামের স্কলারই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষার একজন দক্ষ কবিও ছিলেন। এই দুটি বিষয়ের গভীর জ্ঞান উনাকে দিয়েছিল এক অনন্য পারদর্শিতা।

ইমাম আশ-শাফিই রহ. বললেন, আপনি যদি কোনো রাজার দরবারে যান, আপনি নির্দিষ্ট কিছু কথা বলে রাজা আর তার সাম্রাজ্যের প্রশংসা করেন। আত-তাহিয়্যাত হলো সেই ধরনের এক রাজকীয় সম্ভাষণ বা রয়্যাল কপ্লিমেন্স। এই যেমন ইংরেজিতে Royal Highness, Your Magistrate, Your grateness. **আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি কথাটির মানে হলো শুধু আল্লাহর জন্যই রয়্যাল কপ্লিমেন্স বা রাজকীয় সম্ভাষণ।**

*****

তারপরের কথাগুলো হলো (وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ) ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বোয়্যিবাত।

‘ওয়াস সালাওয়াত’ এর আক্ষরিক মানে হলো সালাত বা নামাজ। আর ত্বোয়্যিবাত এর আক্ষরিক মানে হলো সুন্দর বা আকর্ষণীয় বস্তু। এই শব্দদুটি এখানে যে বাক্য গঠনে এসেছে তাতে কিন্তু ওয়াস সালাওয়াত এর মানে দাঁড়ায় সব ধরনের ইবাদত। আর ত্বোয়্যিবাত মানে দাঁড়ায় সুন্দর আচরণ বা ব্যবহার। অর্থাৎ,

أَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ

‘আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বোয়্যিবাত’ কথাটির মানে দাঁড়াল, সকল ইবাদত এবং সুন্দর আচরণ কেবল আল্লাহর জন্য। সুবহানআল্লাহ!

এটা জানার পরপরই বিলাল প্রতিজ্ঞা করল, যতই কেউ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করুক, তার বিপরীতে সে কারোর সাথেই খারাপ ব্যবহার করবে না। গতকালই

পাড়ার ফলওয়ালার কাছ থেকে কেনা আপেলের অর্ধেকই ভেতরে কালো ছিল। বিলাল ভেবেছিল আজ কড়া একটা ঝারি দিবে। কিন্তু এই **আত-তাহিয়্যাতু** এর মানে জানার পর তার মনে হলো, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কমপক্ষে নয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাশাহুদ পড়তে বলে গিয়েছেন। তা এতদিন অর্থ না জানার কারণে মানা হয়নি। অথচ আজ অর্থ জেনে কীভাবে না মেনে থাকবে!

না কোনোভাবেই খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। যেই আল্লাহ বিলালের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ছোট-বড় অগণিত নিয়ামত যিনি না চাইতেই বিলালকে দিয়েছেন; তার জন্য হলো সুন্দর আচরণ। কী আসে যায় অন্য কেউ তার সাথে কী ব্যবহার করল তাতে! আর তাই বিলাল সিদ্ধান্ত নিল, পরম বন্ধুর মতন সুন্দর ভাষায় ফলওয়ালাকে নাসীহা দিবে যেন আগামী থেকে পচা ফল বিক্রি না করে।

এরপরেই আরেকটি কথা বিলালের মনে পড়ে গেল। ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে বলে ডায়েট শুরু করার কথা ছিল। বিলাল গত বছর ভেবেছিল রোজা তো আসছেই। ইনশাআল্লাহ রোজার মাসেই ইবাদতও হবে, আর ডায়েটটাও আরম্ভ করা যাবে। এখন বিলালের মনে একটা শঙ্কা ঢুকে গেল।

এই যে বলা হলো সব ইবাদত আসলে আল্লাহর জন্য। কিন্তু তার সেই রোজাতে ডায়েট করাটাও উদ্দেশ্য হিসেবে ঢুকে গিয়েছিল। মনের এই শঙ্কা দূর করতে বিলাল ঠিক করল এটা নিয়ে আরো পড়াশোনা করবে এবং মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলবে। প্রতি ওয়াক্তের নামাজে তাশাহুদের প্রথম লাইনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্যের আচরণ আমাদের সাথে যেমনই হোক না কেন, আমি সুন্দর আচরণ তো করব কেবল আল্লাহর জন্য।

*****

এর পরের লাইনটি হলো,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

'আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু।'

অর্থ: হে নবী, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এখানে রাসূল শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু রাসূল নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। সাধারণত সাহাবীগণও তাঁকে রাসূলুল্লাহ বলেই সম্বোধন করতেন। তাহলে তাশাহুদে নবী শব্দটি কেন ব্যবহার হলো?

আলিমগণ বলেছেন আরবীতে নবী নামটি যে শব্দ থেকে এসে থাকতে পারে তা হলো 'নাবা'। যার মানে হলো এমন সংবাদ যা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক। এখানে নবী সম্বোধনটি যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিখিয়ে গেছেন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

এরপর 'ওয়া রাহমাতুল্লাহি' যার অর্থ আল্লাহর রহমতও আপনার উপর বর্ষিত হোক। 'ওয়া বারাকাতুহু' যার অর্থ আল্লাহর বরকতও আপনার উপর বর্ষিত হোক।

আরবী ভাষায় বারাকাহ বা বরকত শব্দটির মানে আসলে শুধু blessings নয়, বরং এটা হচ্ছে সেই ধরনের blessings যা দীর্ঘস্থায়ী। এটা এমন রহমত, যা চিরস্থায়ী, অবিরত বর্ষিত হতেই থাকবে।

অর্থাৎ,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

'আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'

অর্থ: 'হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, তাঁর রহমত এবং দীর্ঘস্থায়ী বরকত বর্ষিত হোক।'

বিলালের মাথায় প্রশ্ন আসলো, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি সম্বোধন করা হচ্ছে আপনার উপর বলে। একথা কি এভাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহর উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং দীর্ঘস্থায়ী বরকত বর্ষিত হোক। বিলাল জানতে পারল, সে একাই কেবল এ প্রশ্ন করেনি। অনেকেই এ প্রশ্ন করেছে এবং আলিমরা এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন। সাহাবীরা সবাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা যেভাবে শেখাতেন ঠিক সেভাবেই গুরুত্ব সহকারে তাশাহুদ শিখিয়েছেন।

স্কলাররা বলেন, ঠিক যেমন কুরআনের সূরা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিকৃতভাবে মুখস্থ করতে হয়। সাহাবীদের কথা, ঠিক তেমনভাবে তাশাহুদকেও

মুখস্থ করতে হবে। কেউ একা একা নামাজ পড়ার সময় সূরা ফাতিহাতে ইয়্যা কানা'বুদুকে ইয়্যাকা'আবুদু পড়তে পারেন না। অর্থাৎ, 'আমরা আপনারই উপাসনা করি' না বলে 'আমি আপনারই উপাসনা করি' বলা যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে তাশাহুদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যেভাবে শিখিয়ে গেছেন, আমাদেরও সেভাবে পড়তে হবে।

*****

এর পরের লাইনটি হলো,

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

'আসসালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন'

এখানে ইবাদ শব্দটির মানে হলো স্রেফ আল্লাহর দাস। আরবীতে আবেদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সাধারণ অর্থে দাস বোঝাতে। ইবাদ তার বহুবচন। কিন্তু এখানে ইবাদ ব্যবহার করে শুধু আল্লাহর দাস বোঝানো হয়েছে। তাহলে তাশাহুদের এই বাক্যটির অর্থ হলো, 'আমাদের উপর এবং সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।' এই একটি বাক্য থেকে আলিমগণ যে কত গভীর এবং অর্থপূর্ণ দুটি পয়েন্ট বের করে এনেছেন তা জেনে এতদিন তাশাহুদের অর্থ না জেনে পড়ার আক্ষেপটা বিলালের মনে আরো বেড়ে গেল।

প্রথমত আলিমগণ বলেন,

এই একবচন তথা আমি ব্যবহার না করে বহুবচন তথা আমরা বলাটা মুসলিম উম্মতের একতা বোঝাচ্ছে। ইঙ্গিত করা হচ্ছে, নামাজ বা সালাত হলো মুসলিম উম্মতের একতা বা ইউনিটির একটি সুশৃঙ্খল প্লাটফর্ম। ধনী-গরিব, সাদা-কালো অফিসের বস থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত, ক্লিনার থেকে শুরু করে বড় কোনো কর্তা, মসজিদ কমিটির প্রধান থেকে শুরু করে একেবারে স্বল্প শিক্ষিত লোক যেমনভাবে পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছে, তেমনি একজন কুরআনের হাফেযও হয়তো এমন একজনের পাশে একই কাতারে দাঁড়াচ্ছে যে হয়তো শুধু একটি সূরাই জানে। এক কাতারে কাঁধে কাঁধ রেখে, পায়ে পা মিলিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে সেই সালাতের ভেতরে ও শুরুতেই সূরা ফাতিহাতে বহু বচনের ব্যবহার দিয়ে মুসলিমদের ভেতর ঐক্যতার যে গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, আবার সালাতের শেষে তাশাহুদেও যেন সেই একই কথা মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত যে পয়েন্টটি আলিমগণ বুঝেছেন তা হলো,

এ লাইনটি প্রতিটি মুসলিমদের জন্য সলিহীন বা আল্লাহর পুণ্যবান দাস হবার বা ইবাদ হবার জন্য একটি চমৎকার মোটিভেশান। প্রতিদিন কমপক্ষে প্রতি ফরজ সালাতে একবার করে হলেও কমপক্ষে পাঁচবার কোটি কোটি মানুষ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের উপর শান্তির জন্য দুআ করছে। সেই নির্দিষ্ট লোকরা কারা—যারা সলিহীন অর্থাৎ, যারা ভালো কাজ করে। বিলাল চিন্তা করে দেখল যে, কেউ যদি আল্লাহর কথা মেনে চলে, ভালো কাজ করে, সময়মতো মনোযোগ দিয়ে নামাজ আদায় করে তারাই এই গ্রুপের মেম্বার হতে পারবে, যাদের জন্য প্রতিদিন কোটি কোটি লোক কমপক্ষে পাঁচবার করে দুআ করছে। সুবহানআল্লাহ।

এ যেন অবারিত এক সম্পদের ভান্ডার পেল বিলাল। সে ঠিক করল এখন থেকে যখনই কিছু তাকে কষ্ট দিবে, বা কোনো বিপদে পড়বে সে আরো আরো ভালো কাজ করা বাড়িয়ে দিবে। যাতে করে সে কোটি কোটি মানুষের দুআর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

*****

তাশাহুদের পরের অংশ হলো,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

যার অর্থ হলো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

এখানে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। 'লা' মানে হলো না বা এক্ষেত্রে নেই। আরবীতে 'লা' শব্দটির মানে কিন্তু যেনতেন 'না' নয়। এই 'লা' বা 'না' হলো স্পষ্ট না। যেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর ইলাহ শব্দটির মানে হলো এমন এক সত্তা যার ইবাদত বা উপাসনা করা হয়। অর্থাৎ, এই কথাটির অর্থ হলো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা নেই যার ইবাদত করা যায়।'

বিলালের মনে পড়ে গেল সূরা কাফিরূনের তাফসীর জানতে যেয়ে আরবীতে ইবাদত শব্দটির মানে সম্পর্কে সে নতুন একটি বিষয় জানতে পেরেছিল। ইংরেজিতে আমরা Warship বা বাংলায় উপাসনা কথাটির অর্থ ধর্মীয় বিশ্বাস

থেকে কিছু কাজ করা বা নামাজ পড়াকে বোঝাই। কিন্তু আরবীতে ইবাদাহ শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। ইবাদাহ শব্দের মানে হলো যেই সত্তার ইবাদাহ করা হচ্ছে তার দাস হিসেবে নিজেকে স্বীকার করা এবং তার উপর বিশ্বাস থেকে কিছু কাজ করা এবং কিছু বিধান পালন করা।

যখন কেউ নামাজ পড়ছে আবার চাকরিতে ঘুষ খাচ্ছে সে আল্লাহর উপাসনা করছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দাস হতে পারেনি। তাই আরবী ভাষায় ইবাদাহ বলতে যা বোঝায় সে তা পুরোপুরি করতে পারেনি। ইলাহ শব্দটির মানে জেনেই বিলালের আবারও মনে পড়ে গেল নামাজ, রোজা, যাকাতের পাশাপাশি আল্লাহর দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে না নিতে পারলে ইবাদত যে সম্পূর্ণরূপে করা হয় না।

*****

তাশাহুদ এর শেষ অংশটি হলো,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

যার অর্থ হলো, 'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দাস এবং রাসূল।'

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির প্রথম পরিচয় হলো তিনি হচ্ছেন আল্লাহর দাস। এই দাসত্ব যে সম্মানের দাসত্ব। এই দাসত্ত্বেই যে চিরশান্তির পথ লুকিয়ে আছে। ভেজা চোখে বিলাল তার বাবার বুক সেলফ ঘাঁটতে থাকে। যদি এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরুদ শরীফের উপর কোনো লেখা পাওয়া যায়!

নামাজ শেষে পঠিত দুআসমূহ

অনেকেই বলেন যে, আল্লাহর কাছে দুআ করতে গিয়ে তিনি কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। সুবহানআল্লাহ! রবকে বলার কত কথাই না আছে! সেজন্য একটা গাইড হিসেবে এখানে বান্দাদের দুআর একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো। এই দুআটি আপনি নামাজের শেষে অথবা যেকোনো বরকতপূর্ণ দুআ কবুলের মুহূর্তে পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ।

দুআর আদব এবং অন্যতম সুন্নাহ হলো, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদের মাধ্যমে দুআ শুরু করা। যেমন, এভাবে দুআ শুরু করা-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰ
اَجْمَعِيْنَ وَصَحْبِه لِه.

অর্থ: সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাথীবর্গের উপর। এটা হলো হামদ (প্রশংসা) ও সালাতের (দরুদের) সংক্ষিপ্ত বাক্য।

একদিনের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়ে দুআ করতে লাগল, “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি দয়া করো।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, “হে মুসল্লি! তুমি তাড়াহুড়া করছো। তুমি যখন নামাজ পড়ে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে, অতঃপর আমার প্রতি দরুদ পড়বে। তারপর দুআ করবে।” বর্ণনাকারী

বলেন, অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়ল। আল্লাহর প্রশংসা করল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়ল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "হে মুসল্লি! তুমি দুআ করো, তোমার দুআ কবুল করা হবে।"[৮৪]

দুআর শুরু এবং শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করুন এবং দুআর মাঝেও কোনো দরুদ পাঠ করুন। বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার আবু সুলায়মান আদ-দারানি রহ. একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

> 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ে দুআ শুরু এবং দরুদ পড়ে দুআ শেষ করুন। কেন? কারণ, নবীর উপর দরুদ পড়লে তা এমনিতেই কবুল হয়। আর আল্লাহ তাআলা কোনো দুআর শুরু ও শেষের অংশ কবুল করে মাঝের অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন—এমনটি হতে পারে না।'

- ইয়া রহমান! ইয়া রহিম! ইয়া রব্বুল আলামিন! আমি আপনাকে ডাকছি আপনার সুন্দর সুন্দর নামগুলো ধরে। আপনার যে নামগুলো আপনি প্রকাশ করেছেন, আপনার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং আপনার সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন অথবা যে নামগুলো আপনি গায়েবের জ্ঞানের মাধ্যমে অপ্রকাশিত রেখেছেন, তার প্রতিটি নাম ধরে আজ আমি আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি ইয়া রব!

- সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দরুদ পাঠ)।

- আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (দরুদ পাঠ)।

- হে আল্লাহ! আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি আপনার উপরই ভরসা করি। আর আপনি মহান আরশের রব।

- হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি—আপনার সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, আপনার নিজের সন্তোষের সমান, আপনার আরশের ওজনের সমান ও আপনার বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)।

---

[৮৪] তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৪৭৬

- হে আল্লাহ! হে গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, হে সব কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার শিরক বা তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের উপর কোনো অনিষ্ট করা, অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেয়া থেকে।

- হে আল্লাহ! আপনিই একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী; যিনি জন্ম দেননি, জন্ম নেনওনি; আর যার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই, যেন আপনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন; নিশ্চয়ই আপনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

- হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই।

- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।

- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই; কারণ, সকল প্রশংসা আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, সীমাহীন অনুগ্রহকারী; হে আসমানসমূহ ও জমিনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী-সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অসদাচরণ, মন্দ কর্ম এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ধবল, মানসিক বৈকল্য, কুষ্ঠ এবং মন্দ রোগব্যাধি থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট থেকে, দুর্ভোগের আক্রমণ থেকে, মন্দ ফয়সালা হতে এবং শত্রুর খুশি হওয়া থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, অভাব-অনটন এবং অপমান-অপদস্থ হওয়া থেকে। এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আমি যেন কারও উপর অবিচার না করি, আমি যেন কারও দ্বারা অত্যাচারিত না হই।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার থেকে আপনার নিয়ামত চলে যাওয়া থেকে, আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে এবং আপনার যাবতীয় অসন্তুষ্টি থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে এবং দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সেই জ্ঞান থেকে যা কোনো উপকারে আসে না এবং সেই হৃদয় থেকে যা আপনাকে ভয় করে না, সেই আত্মা থেকে যা কখনো সন্তুষ্ট হয় না এবং সেই দুআ থেকে যা কবুল হয় না।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুর্বলতা থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষোচিত থেকে, জরাগ্রস্ত ও কৃপণতা থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে এবং ইহকাল ও পরকালের ফিতনা-ফাসাদ থেকে।

- হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, জরাগ্রস্ততা, অন্তরের কাঠিন্য, উদাসীনতা, লজ্জা এবং সহায়-সম্বলহীনতা থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কুফরি, ফাসেকি, বিরুদ্ধাচারণ, মুনাফেকি, কুখ্যাতি এবং লোক দেখানো ইবাদত থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাই বধিরতা, বাকশক্তিহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ ও ধবল থেকে এবং সকল ঘাতকব্যাধি থেকে।

- হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমনটি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য

আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন।

- হে আল্লাহ, আমি সজ্ঞানে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

- হে আল্লাহ, আপনি আমার ইবাদতকে সালেহ তথা বিশুদ্ধ করুন। শুধু আপনার সন্তুষ্টির কারণ বানান এবং তাতে অন্য কারো অংশীদারত্ব রাখবেন না।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের জন্য ক্ষমা, কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমার দোষত্রুটি গোপন রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহে আমাকে নিরাপদে রাখুন। আমার অন্তরে শান্তি দান করুন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন আমার সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে ও উপরের দিক থেকে। হে আল্লাহ, আমি আপনার মর্যাদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটির নিচে ধসে যাওয়া থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কোথাও চাপা পড়া থেকে, উপর থেকে পড়ে যাওয়া থেকে, ডুবে যাওয়া থেকে, পুড়ে যাওয়া থেকে, প্রচণ্ড বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাওয়া থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যেন শয়তান মৃত্যুর সময় আমার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাকে সংশয়ে না ফেলতে পারে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, সারাজীবন আপনার পথে লড়ে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মরে যাওয়া থেকে। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই বিষধর হুল কিংবা সাপে কামড়ে মরে যাওয়া থেকে।

- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কাউকে পথভ্রষ্ট করা থেকে কিংবা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। কাউকে ভুল করানো থেকে কিংবা নিজে ভুল করা থেকে। মূর্খের মতো আচরণ করা থেকে কিংবা অন্য কেউ আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করুক তা থেকে। কারো উপর জুলুম করা থেকে কিংবা অন্য কারও আমার উপর জুলুম করা থেকে।

- হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমন পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার

পাপসমূহ থেকে বরফ, পানি ও মেঘের শিলাখণ্ড দ্বারা ধৌত করে দিন।

- হে আল্লাহ! আমাদের রক্তে আপনি ইসলামকে মিশিয়ে দিন। আমাদের শিরায় আর ধমনীতে ঈমানকে ছড়িয়ে দিন। আমাদের আকল আর নফসকে আপনার নূরে নূরান্বিত করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রিয় না করে দেহ থেকে রুহ আলাদা করবেন না। যদি আমরা অপ্রিয়ও হই, কোনো না কোনোভাবে আমাদেরকে আপনার প্রিয় করে নিন।

- হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার চোখে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডানে নূর দান করুন, আমার বামে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার জন্য নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বাড়িয়ে দিন।

- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রিযিক হিসেবে দিন মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি দিলে তাওবা করার। হে আল্লাহ! হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমার জিহ্বায় শাহাদাতের সাক্ষ্যসহ আমাকে মৃত্যু দিন। আমাকে সর্বাবস্থায় আপনার প্রতি সুধারণা রাখার তাওফিক দিন। আমার জন্য কবরকে প্রসারিত করুন, আলোকিত করুন। আমার কবরের সওয়াল-জওয়াব সহজ করুন।

- ইয়া রব, কিয়ামতের দিন আমাকে ভয়, উদ্বেগ এবং ত্রাস থেকে মুক্ত রাখুন। আমাকে ডানহাতে আমলনামা লাভের তাওফিক দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে আপনার আরশের ছায়া দান করুন। আমাকে মিজানের দাঁড়িপাল্লায় সফল করুন। আমাকে বিদ্যুতের মতো সীরাত পার করিয়ে দিন। বিচারের দিন আমার দোষ অন্যের সামনে প্রকাশ হতে দিয়েন না ইয়া আল-গফুর!

- হে আল্লাহ, আমাকে সুন্দর ধৈর্য (সবরুন জামীল) দান করুন। আমাকে প্রশান্তিতে ভরপুর হৃদয় দান করুন। অন্যকে ক্ষমা করার ক্ষমতা আমাকে দিন।

- হে আল্লাহ, আমাকে কল্যাণকর বাক্য উচ্চারণের তাওফিক দিন। আমার জিহ্বাকে মিথ্যা, গীবত এবং অন্যকে আঘাত করা থেকে রক্ষা করুন। ইয়া

রব, আমার দ্বারা যেন কখনো আপনার বান্দার হক নষ্ট না হয়।

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে সহীহ আকীদা, সুষ্ঠ দলিলের সহিত দ্বীনের জ্ঞান দান করুন। আমার মুখস্থ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিন এবং কুরআনের কথার গভীরতা উপলব্ধি ও আমলের তাওফিক দিন।

- হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।

- হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। ইয়া আল্লাহ, আমার আব্বু-আম্মুকে হিফাজত করুন, তাদেরকে নেক হায়াত দিন, তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করুন এবং তাদের জন্য আমাকে সুসন্তান হিসেবে সাদাকায়ে জারিয়াহ করে কবুল করুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমার আপন ভাই-বোনদেরকে হিফাজত করুন। তাদেরকে দ্বীনের পথে অটল রাখুন। তাদের বৈবাহিক জীবনে আপনার রহমত এবং বারাকাহ দিন। শয়তানকে কখনো আমাদের পারিবারিক বন্ধন ভাঙতে দিয়েন না আল্লাহ।

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে ধনসম্পদ দান করুন এবং সেগুলো আপনার পথে, আপনার সন্তুষ্ট অনুযায়ী ব্যয় করার তাওফিক দিন।

- ইয়া রব, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত আছে, তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। মুসলিম উম্মাহর উপর রহম করুন ইয়া আল্লাহ এবং নিপীড়িতদের বিজয় দান করুন। আমাদের সবাইকে আপনি এক করে দিন, নেক করে দিন ইয়া আল্লাহ।

- আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ, তাদের সুস্থ করে দিন ইয়া আশ-শাফিই! আমাদের মধ্যে যারা নিঃসন্তান, তাদের আপনি নেক সন্তান দিন ইয়া আল-খলিক! আমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদেরকে চক্ষু শীতলতাকারী জীবনসঙ্গী দিন ইয়া আল-ওয়াদুদ! আমাদের মধ্যে যারা হিদায়াত থেকে অনেক দূরে,

তাদের অন্তরকে আপনার হিদায়াতের আলো দিয়ে ভরিয়ে দিন ইয়া আন-নূর!

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে দিন, যেভাবে থাকলে আপনি আমার উপর সবচেয়ে খুশি হবেন। ইয়া আল্লাহ তাআলা, আমার ঈমান, তাওয়াক্কুল, ইয়াকীন বাড়িয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে তাকওয়া, জ্ঞান এবং উত্তম আখলাকে সমৃদ্ধ করুন। আমাকে নিফাকী, লোক দেখানো ইবাদত এবং কুফর থেকে হিফাজত করুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলো ঈমানী শক্তি দিয়ে পার করার তাওফিক দিন।

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে আপনার বিধিবিধান এবং তাকদীরের উপর সচেতন হৃদয় এবং সন্তুষ্টি দান করুন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে মুহসিনীনদের মধ্যে রাখুন, মুত্তাকীন, মুখলিসীনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমাকে আপনার ইবাদত করার জন্য আপনার ঘরের মেহমান হিসেবে নিয়ে যান।

- ইয়া আল্লাহ, আমাদের স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যকার ভালোবাসা এবং বারাকাহর সম্পর্ককে রক্ষা করুন। আমার পরিবারের সদস্যদের একে-অপরের সাথে আচরণকে আরো উন্নত করুন। আমার পার্টনারকে তার প্রচেষ্টার জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের পরিবারকে জান্নাতুল ফিরদাউসে পরম সুখে একত্র করুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমাদের বাচ্চাদের জন্য উত্তম পিতামাতা এবং উদাহরণ হবার তাওফিক দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সন্তানদের আমাদের ভুল শিক্ষা থেকে হিফাজত করুন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের বাচ্চাদেরকে এবং আমাদেরকে সকল ক্ষতি, অসুস্থতা, কুফরী, হারাম এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন।

- ইয়া আল্লাহ, আমাদের পুরো বংশকে জান্নাতুল ফিরদাউসে এক করুন। ইয়া আল্লাহ, আমার পিতামাতা, আমার বোন এবং ভাই, আমার প্রবীণ এবং সমগ্র উম্মাহকে মর্যাদায় উন্নীত করুন।

- হে আল্লাহ, আমাদেরকে হিদায়াত দিন, আফিয়া দিন এবং সুন্দর মৃত্যু দিন (হুসনুল খাতিম)। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সকল দুআর উত্তর দিন। আপনি সামিউল বাসীর, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

দুআ—মুমিনের হাতিয়ার

এত এত দুআ করছি! কিন্তু কবুল তো হচ্ছে না! তাহলে কি আল্লাহ আমার কথা শুনছেন না? কেন তিনি আমার দুআর উত্তর দিচ্ছেন না?"

হ্যাঁ, এমন অনুভূতি আমাদের প্রায়ই হয়!

আর যখনই আমাদের মধ্যে এমন অনুভূতি আসতে থাকে, তখনই আমরা হাল ছেড়ে দেই। খুব মন খারাপ হয় তখন আমাদের! আর দুআ করতে ইচ্ছে করে না। হতাশ হয়ে পড়ি।

কিন্তু জানেন কি? দুআ কখনোই বৃথা যায় না! তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো দুআ কবুল হতে দেরি হতে পারে। আর এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোনো মুসলিম দুআ করে, যে দুআয় কোনো পাপ থাকে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার দুআ কবুল করেন। পদ্ধতি তিনটি হলো,

০১. সে যে দুআ করেছে, হুবহু তাই কবুল করা হয়।

০২. তার দুআর প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

০৩. এই দুআর মাধ্যমে তার উপর আসা কোনো বিপদ দূর করে দেয়া হয়।"

এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন, 'আমরা তাহলে বেশি বেশি দুআ করব।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা যত দুআ করবে, আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি তা কবুল করতে পারেন।'[৮৫]

---

[৮৫] বুখারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> "যে দুআগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন না তা হলো, এক মুসলিম ভাইয়ের জন্য অপর মুসলিম ভাইয়ের দুআ তার অনুপস্থিতে।"

এই সুন্নাহটির কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। আরেক ভাইয়ের জন্য দুআ করলে আমাদের কী কোনো ক্ষতি হবে!

> আর জানেন তো? যখন আমরা মুসলিম ভাইয়ের জন্য দুআ করি তখন একজন ফিরিশতা আমাদের জন্যও দুআ করেন। ফিরিশতা বলেন, 'ইয়া আল্লাহ! যে দুআ করছে তাকেও এটা দান করুন।'

মানুষের জন্য দুআ করলে আমাদের কিছু হারাবার আছে?! আমরা কতটা কৃপণ হতে পারি! আমরা এমনকি অন্যদের জন্যও দুআ করি না, যদিও জানি অন্যের জন্য দুআ করলে সেটা আমরা নিজেরাও পাব।

*****

আল্লাহর কাছে চাওয়াটা যে কত বড় সাওয়াবের কাজ তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আপনি যদি কোনো বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে চান, এটা যে আল্লাহর কাছে কত প্রিয়, কত প্রিয় তা কলমের কালিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতটুকুই বলি, এই চাওয়ার কাজটাই আপনার জন্য প্রতিদান।

বিশ্বাস করুন, এই পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত এর কাজ ছাড়া অন্য কিছুর মূল্য নেই আখিরাতের জন্য। আল্লাহর কাছে চাওয়া বা দুআ করা মুখ্য ইবাদাত এর একটি। যে কারণেই হোক; বিপদে পড়ে হোক, কোনো সমস্যায় পড়ে হোক, আপনি যদি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন—এটাই আপনার সৌভাগ্য। অনেকেই প্রথমে আল্লাহর কাছে চায় না কোনো সমস্যায় পড়লে। বিভিন্নজনের কাছে ঘুরাঘুরি করে। শেষে সবার কাছে চাওয়ার পর ব্যর্থ হয়ে আল্লাহর কাছে চায়।

আপনি যে অন্যকারো কাছে না চেয়ে আল্লাহর কাছে চেয়েছেন, এইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য রহমত।

আপনি যদি আল্লাহর কাছে চাওয়ার পর নামাজে মনোযোগী হন, তাহলে ইতোমধ্যেই আপনি প্রতিদান পেয়ে গেছেন। মনে রাখবেন, ভাল কাজের পর

যদি আরো ভাল কাজ করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী ভাল কাজগুলো আপনার প্রতিদান। এগুলোই আপনাকে বাঁচাবে আখিরাতের কঠিন সময়ে।

অনেক সময় আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন, তাকে দুআর উত্তর দেন না বা দেরি করে দেন, যেন সে বার বার আল্লাহর কাছে চাওয়ার কাজটি করতে পারে। আর যাকে পছন্দ করেন না, তাকে এই সুযোগটিই দেন না যে সে চাইতে পারে। চাওয়ার আগেই দিয়ে দেন যেন চাওয়ার কাজটি করতে না পারে। মনে রাখবেন, দুনিয়া প্রতিদানের জায়গা নয়। দুনিয়া যদি প্রতিদানের জায়গা হতো, তাহলে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ার জীবনের দিকে তাকান। দুনিয়া প্রতিদানের জায়গা হলে তিঁনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে আরামে থাকতেন কোনোরকমের কষ্ট ছাড়া। কত কষ্টের ছিল তাঁর জীবন! তিনবার এতিম হওয়ার কষ্ট, অধিকাংশ সন্তান তাঁর চোখের সামনে ইন্তেকাল হওয়ার কষ্ট, তায়েফের কষ্ট সহ আর কত কী! প্রতিদানের জায়গা আখিরাত।

আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, কোনো দুআই বিফলে যায় না। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বান্দা যখন দুআ করে, এ চারটির যেকোনো একটা হয়। প্রথমত—দুআ কবুল হয়। দ্বিতীয়ত—দুআ কবুল বিলম্বিত হয়। তৃতীয়ত—দুআর কারণে সামনের অজানা বিপদ দূর হয় আর শেষটি—আখিরাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। এই চারটির যেকোনো একটি হবেই।"

তাই যেকোনো বিপদ, সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট যদি আপনাকে আল্লাহর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়, আর দুহাত দুলে আল্লাহর কাছে চাওয়ার পরিস্থিতি তৈরী করে, তাহলে মনে রাখবেন আপনি সৌভাগ্যবানের একজন।

******

দুআ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদিসে "দুআকে ইবাদতের মগজ বলা হয়েছে।"[৮৬]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুআই হলো ইবাদত।"[৮৭]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নিকট দুআর চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ কোনো জিনিস নেই।"[৮৮]

---

[৮৬] তিরমিজি ৩৩৭১

[৮৭] সহীহুল জামি ৩৪০৭

[৮৮] তিরমিজি ৩৩৭০

তিনি আরো বলেন,

> "দুআ মুমিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ, আসমান ও জমিনের নূর।"[৮৯]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "দুআ ছাড়া আর কিছুই তাকদীর বদলাতে পারে না।"[৯০]

হয়তো কারো ভাগ্যে কোনো দুর্ভোগ লেখা ছিল। কিন্তু তার দুআর মাঝে যে একাগ্রতা আর প্রাণ ছিল, আল্লাহ তার ভাগ্য থেকে দুর্ভোগ সরিয়ে দিলেন। ভবিষ্যতে তাই যেকোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে রেহাই পেতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। একমাত্র দুআই পারে আপনার তাকদীরের দুর্ঘটনাকে পালটে দিতে।

> "যত সতর্কই থাকা হোক না কেন, তাকদীরের ব্যাপারে তা কোনো কাজে আসবে না। যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারে, তা থেকে শুধু দুআই পারে নিষ্কৃতি দিতে। দুর্দশার সঙ্গে মোকাবিলা করে বিচারদিন পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে দুআ।"[৯১]

আত্মার চিকিৎসক ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন,

> "দুআ আর তাকদীরের বেলায় তিন ধরনের ফল হতে পারে। দুআর জোর যদি তাকদীরের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ভাগ্যলিখন পুরোপুরি বদলে যায়। দুআ যদি কমজোরি হয়, তাহলে তাকদীরে যা থাকে, তা-ই হয়। তবে দুআর কারণে সে দুর্দশার কিছুটা লাঘব হয় মাত্র। আর দুটো যদি সমান শক্তির হয়, তাহলে একটি আরেকটিকে বাধা দিতে থাকে।"[৯২]

নবীজি বলেন, "আল্লাহ লজ্জাশীল, মঙ্গলময়। তাঁর বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তিনি শূন্য হাতে হতাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[৯৩]

---

[৮৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং : ১৮১২

[৯০] তিরমিজি ১৯৩৯

[৯১] তাবারানি, আওসাত ২৫১৯

[৯২] আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা: ৪২

[৯৩] আবু দাউদ ১৪৮৮

আল্লাহ বলেন,

> "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। অহংকারবশত যারা আল্লাহর ইবাদত করে না, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৯৪]

মানুষের কাছে চাইলে মানুষ রাগ করে, মন খারাপ করে, দরজা বন্ধ করে দেয়, তাড়িয়ে দেয়; কিন্তু আল্লাহ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে না চাইলেই বরং তিনি রাগ করেন! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "যে আল্লাহকে ডাকে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।"[৯৫]

আর তাই আমাদেরকে ভালো অবস্থায়, খারাপ অবস্থায়, বিপদাপদে সব সময় দুআ করে যেতে হবে। এখন দেখে নেয়া যাক, দুআ কীভাবে কাজ করে।

দুআ কীভাবে কাজ করে?[৯৬]

কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে একজন বিশেষ নারীর কথা। আর তিনি হলেন—মারইয়াম সালামুন আলাইহা। একমাত্র নারী কুরআনে যার নামে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন।

আমি তার জীবনের কিছু বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চাই যা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা কুরআনে তুলে ধরেছেন। আজকের আলোচনাটি চলতি সপ্তাহে করা একজনের প্রশ্ন দ্বারা অনুপ্রাণিত। একজন আমাকে জানালেন, "বাল্যকাল থেকে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার সাথে তার গভীর সম্পর্ক। খুব অল্প বয়স থেকে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, এমনকি কিশোরী বয়সেও। যখনই তিনি আল্লাহর কাছে কিছু চাইতেন, আল্লাহ তাকে তা দিয়ে দিতেন। কিন্তু জীবনটা তার মোটেও সহজ ছিল না। অল্প বয়সে বাবাকে হারান। কোনো ভাই

---

[৯৪] সূরা মুমিনুন ৪০ : ৬০

[৯৫] তিরমিজি, সহীহুল জামি ২৪১৮

[৯৬] এই অংশটি নেয়া হয়েছে উস্তাদ নোমান আলি খান হাফিজাহুল্লাহর 'How Duaa Works' লেকচার থেকে। লেকচারটি অনুবাদ করেছে nakbangla ইউটিউব চ্যানেল। সম্পাদক হাসান শুয়াইব এবং অনুবাদিকা এতে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন।

নেই। ফলে বোনটি খুবই একাকিত্বের জীবন কাটিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে থাকবেন।

যখন তিনি এভাবে বড় হতে শুরু করলেন, দেখতে পেলেন আল্লাহ অলৌকিকভাবে তার সকল প্রার্থনার জবাব দিচ্ছেন। তার যেকোনো চাওয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ কখনো জবাব না দিয়ে থাকেননি। এভাবে তিনি আল্লাহর উপর নির্ভরতা এবং নৈকট্য বাড়িয়ে তোলেন। কোনো কিছুর দরকার হলেই তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাইতেন। এটা আসলেই আল্লাহর সাথে তার সুন্দর একটি সম্পর্কের উপমা।

তাহলে, এখানে প্রশ্ন কোথায়? এভাবে চললে তো প্রশ্ন থাকার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সম্প্রতি তিনি জীবনে অপ্রত্যাশিত কিছু কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এর সমাধান হিসেবে তিনি আল্লাহর প্রতি ইবাদতের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দুআর পরিমাণও বাড়িয়ে দিলেন। কারণ, তার সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ভাবছেন, সমস্যা যেহেতু বেড়েছে তাই আল্লাহর কাছে সমাধানের জন্য দুআর পরিমাণও বাড়াতে হবে। সিদ্ধান্তমাফিক তিনি এত বেশি নামাজ পড়লেন যে জীবনে কখনো এত নামাজ পড়েননি। এত বেশি পরিমাণে রোজা রাখলেন যে জীবনে কখনো এত রোজা রাখেননি।

আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করতেন, তাঁর কাছে কান্নাকাটি করতেন, অশ্রু ঝরাতেন, যেভাবে পূর্বে কখনো করেননি। কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকল। পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তখন তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'মনে হয় আল্লাহ আমার উপর খুশি নন। কারণ, আগে আমি দুআ করতাম, আর সব দুআর উত্তর পেতাম। আমার আগে তো এই সমস্যা ছিল না। যখনই আমার কিছু দরকার হতো, আল্লাহর দিকে ফিরতাম আর আল্লাহ আমার সমস্যা সমাধান করে দিতেন। কিন্তু, এখন আমি দুআর পর দুআ করে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। শুধু আরো খারাপ হচ্ছে। এর কারণ কী হতে পারে?' তার মাথায় এই ধারণা ঘুরতে থাকল—

> 'নিশ্চয়ই আমি ভুল কিছু করেছি। আল্লাহ আর আমার দুআর জবাব দিচ্ছেন না কারণ, কোনো কারণে আমি অযোগ্য হয়ে পড়েছি। আল্লাহর ভালো মানুষের তালিকায় আমি আর নেই।' "

*****

আমি এই বোনটিকে নিয়েই খুতবা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ, সমাজে এই ধরনের চিন্তা খুবই কমন যা একজন মানুষের মাথা নষ্ট করে দিতে পারে। আমরা দুআ করি। প্রতিটি মানুষ দুআ করে। আর আমরা আশা করতে থাকি আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আমাদের একটা উত্তর দিবেন। আমাদের প্রত্যাশা থাকে আল্লাহ আমাদের সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

তো, এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে দুআ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

এক প্রকার দুআ হলো, আমরা আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য দুআ করি। আমাদের সমস্যা আছে, কিছু পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে গেছি, আমরা চাই আল্লাহ আমাদের আরো খারাপ কোনো সমস্যায় পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমাদের ভালো যা আছে তা যেন তিনি রক্ষা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর অবশ্যই আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্যও দুআ করি। আমরা নিজেদের জন্য দুআ করি, সন্তানদের জন্য দুআ করি এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারগুলোর যত্ন নেয়ার জন্য দুআ করি। এখন সবকিছু ভালো আছে, ইয়া আল্লাহ। এভাবেই যেন থাকে। আমাদের এখন যা আছে তার সংরক্ষণ করুন।

এই ধরনের দুআগুলো আমরা নিজেদের জন্য করে থাকি। এখানে সবাইকে একটা ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মনে রাখবেন, আপনার দুআর উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাক বা না যাক, এর সাথে আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন কি না, তার কোনো সম্পর্ক নেই। এটার সাথে সে বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দুইটার মাঝে কোনো সংযোগ নেই। আর যদি কোনো সংযোগ থাকত তবুও আপনি জানতেন না। আপনার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় যে কারণটা কী।

*****

আমরা নূহ আলাইহিস সালামের কথা জানি। খুবই স্নেহপরায়ণ পিতা ছিলেন তিনি। স্বজাতিকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন ৯৫০ বছর যাবৎ। কল্পনা করতে পারেন? আপনাদের কি মনে হয় না, তিনি তার সন্তানের জন্য দুআ করেছেন? আপনাদের কি মনে হয় না, তিনি তার স্ত্রীর জন্য দুআ করেছেন এতশত বছর ধরে? না কি তিনি তাদের ব্যাপারে কোনো পরোয়া করেননি? যিনি তার জাতির জন্য এতটা যত্নশীল হতে পারেন...তারা তাকে থুতু নিক্ষেপ করেছে, অপমান

করেছে, তারপরেও তিনি তাদের কাছে গিয়েছেন, তাদের জন্য দুআ করেছেন এভাবে ৯৫০ বছর যাবৎ। আপনাদের কি মনে হয়, তিনি নিজ ছেলেকে উপেক্ষা করেছেন? নিজ স্ত্রীর কথা ভুলে গেছেন? তিনি তাদের জন্য বছরের পর বছর দুআ করে গেছেন কিন্তু তারা নিজেদের পরিবর্তন করেনি। ব্যাপারটা কি এমনই নয়? তিনি কি এভাবে নিজেকে দোষ দিয়েছেন যে মনে হয় আমার দাওয়াতটা ঠিকমত হয়নি? অথবা আল্লাহ হয়তো আমার দুআর প্রতি আর কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না?

আলোচনায় নবীদের উদাহরণ টানছি কারণ, তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম ছিলেন। তাদেরও একই রকম সমস্যা ছিল।

এখানে এমন অনেক পিতামাতা আছেন যারা সন্তানদের জন্য প্রতিনিয়ত দুআ করে যান। কিন্তু, তারা দেখেন সন্তানেরা ধর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারা অন্ধকার পথে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তারা এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। নিয়মিত দুআ করে যাচ্ছেন। কিন্তু দুআর কোনো প্রতিফলন পাচ্ছেন না। ফলে, তারা হতাশ হয়ে পড়ছেন। আমি কি ভুল কিছু করেছি? আল্লাহ কেন উত্তর দিচ্ছেন না?

না, এমন ভাববার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, আপনি একা তো আর এমন পরিস্থিতিতে পড়েননি। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর দুআ করেছেন। আপনার কি মনে হয় না যে তিনি তাঁর চাচার জন্য দুআ করেছেন? তাঁর পরিবারের জন্য? আপনার কি মনে হয় না, তিনি আবু লাহাবের কথা বিবেচনায় নেননি যখন তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য দুআ করতেন? হ্যাঁ, তিনি দুআ করতেন এবং তাঁর সকল আবেগপ্রবণ দুআ সত্ত্বেও আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা তাঁকে বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

> "আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।"[৯৭]

---

[৯৭] সূরা কাসাস ২৮ : ৫৬

আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। এটা আর কেউ বলছেন না, বলছেন হিদায়াতের মালিক আল্লাহ তাআলা। আমাদের মাঝে সন্তানেরা আছেন, যারা আশা করেন, তাদের পিতামাতা বা বড়রা যদি আরেকটু ভালোভাবে আল্লাহর পথে চলত! এমন বহু তরুণ-তরুণীর সাথে আমার কথা হয়েছে যাদের পিতামাতা ভয়ংকর রকম পরিষ্কার হারাম ব্যবসায় জড়িত। তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের বলছে, 'প্লিজ এই ব্যবসা থেকে বের হয়ে আসেন। আমি আপনাদের উপর নির্ভরশীল। আপনারা আমার কলেজের ফি পরিশোধ করছেন। আমাদের খচর বহন করছেন। কিন্তু আপনারা হারাম আয় থেকে আমাদের ব্যয় নির্বাহ করছেন। এই পথ থেকে ফিরে আসুন। কেননা আপনারা ভুল পথে চলছেন!'

তখন সন্তানদের বলা হয়, 'তোমরা পিতামাতাকে অসম্মান করছ। তোমাদের তো পিতামাতার সাথে তর্ক করা উচিত নয়...' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উলটো দেখছি আমরা। সন্তানেরা পিতামাতার হিদায়াতের জন্য দুআ করছেন। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না। যেমন আছে তেমনই। জীবনে এই ধরনের হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এর বাইরেও কারো হয়তো ভয়ংকর রকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। শুধু পারিবারিক সমস্যা নয়, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চরম দুর্দশাও আসতে পারে। অথবা চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত। আর আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছেন। মনে মনে বলছেন, আমি তো গত বছর ইতিকাফও করেছি। আমি দুআ করেই গেছি। সারা রাত সিজদায় পড়ে ছিলাম। এরপরেও আমার সমস্যা রয়ে গেছে। এরপরেও কোনো সমাধান আসেনি।

*****

সবার আগে আমি আপনাদের সবাইকে এবং আমার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সকল নবী আলাইহিমুস সালাম-ই দুআ করতেন। আল্লাহ তাআলা বারবার তাদের দুআর কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একইসাথে আল্লাহ তাদের সমস্যাগুলোর কথাও কুরআনে বারবার তুলে ধরেছেন। একটা সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি,

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তিনি বারোজন সন্তানের পিতা ছিলেন। তিনি তার সব সন্তানের জন্য দুআ করেছেন। বিশেষ করে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারিয়ে

ফেলার পর। আপনাদের কি মনে হয় না, তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিরাপত্তার জন্য দুআ করেছেন যেন তিনি নিরাপদে বাসায় ফিরে আসেন? তিনি যেন তার সুন্দর সন্তানকে আবার দেখতে পান? আমরা জানি তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ

'এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল।'[৯৮]

তিনি ছেলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিই হারিয়ে ফেলেন! তার এত বছরের দুআর কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া গেল না। পাওয়া গেছে, সেটা বহু বছর পর।

আরেকটি উপমা খেয়াল করুন;

মুসা আলাইহিস সালামের আম্মা আল্লাহর নির্দেশে নিজ ছেলেকে পানিতে ভাসিয়ে দেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্রোতের টানে বাক্সটি হারিয়ে যাচ্ছে। বাক্সটি যেকোনো সময় উলটে যেতে পারত। তিনি কীভাবে জানেন যে বাক্সটি ওয়াটারপ্রুফ? কীভাবে জানেন যে এতে পানি প্রবেশ করবে না? কীভাবে জানেন যে এটি পাথরের আঘাতে ভেঙে যাবে না? আপনি নদীতে ফেলে দিচ্ছেন... একটি বাচ্চাকে! নদীতে! আপনাদের কি মনে হয় না যে তখন মুসার মা আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন?

এই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্যটা লক্ষ করুন। মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন আর ঠিক কয়েক ঘণ্টা পর তিনি তার ছেলের সাথে আবার একত্র হন। ঠিক কয়েক ঘণ্টা পর। বাচ্চার পরবর্তী খাবারের সময় হওয়ার মধ্যেই সে আবার তার মায়ের দেখা পায়। আর অন্যদিকে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে, তিনি তার পিতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু বহু বছর যাবৎ তিনি তার পিতার দেখা পাননি। অনেক অনেক বছর যাবৎ। তাহলে কিছু কি বুঝতে পারছেন প্রিয় পাঠক?

*****

আমরা জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হব। সমাধানে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে দুআও করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর কাছে দুআ করার সাথে সাথেই আমাদের

---

[৯৮] সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৪

সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। দুআর বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করুন। দুআর উদ্দেশ্য কী? আমরা প্রায়ই দুআকে তলাবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। আরবীতে তলাব মানে কোনো কিছু তালাশ করা, কোনো কিছু দাবী করা। আর দুআর আক্ষরিক অর্থ হলো, ডাকা, আহ্বান করা। এটাই এর অর্থ। 'দাআওতুকুম' মানে আমি তোমাকে ডেকেছি, আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এটা হলো দুআ। আমরা যখন আল্লাহর কাছে দুআ করি, মাঝে মাঝে আমরা ঐ দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দাবী জানাচ্ছি, এটা সত্য। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারটা ভুলে গেলে চলবে না যে দিনশেষে আমাদের সব অনুরোধ...কী সেগুলো? সেগুলো হলো, আল্লাহর একজন বিনম্র দাস আল্লাহর দিকে ফিরে নিজের সমস্যার সমাধান ভিক্ষা চাচ্ছে।

আপনার সমস্যার সমাধান হওয়ার চেয়েও আপনি যে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করছেন এটাই এখানে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। আপনি যে আল্লাহর সাথে কথাবার্তায় যুক্ত হয়েছেন এটাই দিনশেষে মূল লক্ষ্য। আল্লাহ আপনার সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করে দিবেন কি না সেটা ভিন্ন বিষয়। আর অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক যে সমাধান আপনি আপনার জন্য কল্যাণকর মনে করছেন, তার মধ্যে হয়তো কোনো কল্যাণ নেই। আল্লাহ যা জানেন, আমরা তা জানি না। আমি এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা সংক্ষেপে শেয়ার করতে চাই। পরে মারইয়াম সালামুন আলাইহা নিয়ে কথা বলব।

আমাদের একটি কমন প্রশ্ন

কখনো কখনো কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'এখানে আমার দোষ কোথায়? আমাকে কেন এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে? আমি কী অন্যায় করেছি যে আমার প্রতিই এটা আরোপিত হলো?'

অবচেতনভাবে এমন কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধে আমাদের অন্তরে। এবার আপনাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করি, ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো আট-নয় বছরের এক বালক ছিলেন মাত্র। শিশু মানেই তো নিষ্পাপ। একজন শিশু এমন কী করতে পারে যার জন্য সে কিডন্যাপ হতে পারে? একজন শিশু এমন কী অন্যায় করতে পারে যার কারণে সে বনের মাঝখানে কুয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে? একজন শিশু কী করতে পারে যার কারণে সে শিশু দাস হিসেবে বিক্রিত হবে? ভিন্ন একটি দেশে? আর তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কী অন্যায় করেছেন যার কারণে তাকে

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হবে? মিথ্যা একটি অভিযোগে...তিনি বহু বছর জেলে কাটিয়েছেন। তিনি তো নিজের অন্যায়ের কারণে জেল খাটেননি। তিনি নির্দোষ ছিলেন। অথচ সেই তাকেই এতগুলো বছর জেলে কাটাতে হলো?

তাকে জীবনে এমনসব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন হলে নির্ঘাত বলে ফেলত, 'ভাই জীবন অন্যায্য, কী-বা করার আছে। জীবন অন্যায্য!' কিন্তু একজন বিশ্বাসী এমন করে বলে না। সে বলে না যে জীবন অন্যায্য, সে বলে না আল্লাহ অন্যায্য। সে ভাবে, আল্লাহ অবশ্যই এখানে কল্যাণ রেখেছেন। কারণ, সে জানে আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। আল্লাহ সূরা ইউসুফে বলেছেন, 'আল্লাহ তার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তার সকল সিদ্ধান্তের অভিভাবকত্ব করেছিলেন। ইউসুফের জন্য যত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল আল্লাহ তার সবগুলোতে প্রভাব রেখেছিলেন। অভিভাবকত্ব করেছিলেন।' হ্যাঁ, এটাই সত্য।

কখনো কখনো আমি-আপনি এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হলে ভাবব, আল্লাহ জানেন ভালো কিছু সামনে আসছে। কখনো কখনো ভালো যা কিছু আসছে তা আপনার নিজের জন্য, আবার কখনো-বা অন্য কারো জন্য। কখনো কখনো আপনি জীবিত থাকতেই এর উপকার পাবেন আর কখনো কখনো এই উপকার আসবে আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার পর।

*****

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল? একজন পিতা তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এটা একটা ট্রাজেডি। ঠিক কি না? কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, তার বিরুদ্ধ ভাইয়েরা চালবাজি না করলে তিনি কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হতেন না; আর তিনি যদি কুয়ায় না পড়তেন তাহলে কোনোদিন মিশরে গিয়ে পৌঁছতেন না। আর মিশরে কোনোদিন না গেলে তিনি জেলে নিক্ষিপ্ত হতেন না। আর যদি জেলে না যেতেন তাহলে জেলের ঐ দুই লোকের সাথে তার কোনোদিন সাক্ষাৎ হতো না, যাদের স্বপ্নের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

ঐ দুই ব্যক্তির সাথে যদি কোনোদিন তার দেখা না হতো... তাদের একজন বেঁচে যায় এবং রাজার খেদমতে নিয়োজিত হয়, আর যখন রাজা একটি স্বপ্ন দেখলেন—অদ্ভুত এক স্বপ্ন, ঐ ব্যক্তি তাহলে কোনোদিন বলতেন না যে, হ্যাঁ, আমি এক লোকের কথা জানি, যে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সাহায্য করতে পারবে। আর

এটা যদি কোনোদিন না ঘটত...

জানেন? স্বপ্নটা কী ছিল? দেশে সাত বছর হবে প্রাচুর্যের, আর পরবর্তী সাত বছর দেশে কোনো ফসল ফলবে না, কোনো উৎপাদন হবে না, কোনো ফসল সংগ্রহ করা হবে না, মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যাবে। যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে না যেতেন এবং সেই সময় তাকে মুক্তি দেয়া না হতো ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য, তাহলে দেশ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এক দুর্যোগে পতিত হতো। লক্ষ লক্ষ শিশু দুর্ভিক্ষে মারা যেত।

একজন শিশু কষ্ট স্বীকার করল কয়েক বছরের জন্য, আর এই এক শিশুর কষ্ট স্বীকারের ফলে আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল অগণিত পরিবারকে, অগণিত পিতামাতাকে অনাহারে সন্তান হারানোর বেদনা থেকে রক্ষা করবেন। এই পরিকল্পনার কারণে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে ফিরে এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবেন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিবেন।

*****

আমার এক বন্ধুর নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন, তার নাম রবার্ট ডেভিলা। আমি ঐ বোনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, সে তার কথা শুনেছে। মানুষটা তার শরীরের কোনো অঙ্গ নাড়াতে পারে না, শুধু মুখমণ্ডল ছাড়া। সে কী এমন অন্যায় করেছে যার কারণে এমন অবস্থায় পতিত হলো? কিছুই না। কিন্তু কত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তার এই অক্ষমতার দরুন? কত শত মানুষ এই ঘটনার কথা শুনে আল্লাহর পথে ফেরত এসেছে? কত শত মানুষ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল, যদিও তারা মুসলিম ছিল কিন্তু নামে মাত্র মুসলিম ছিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে কারণ, ঐ মানুষটি একটি বিছানায় শুয়ে আছে? তার কষ্ট, দুর্ভোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য হিদায়াতের কারণে পরিণত হলো। বুঝতে পারছেন?

কখনো কখনো আমি-আপনি কষ্টকর অবস্থায় পতিত হই এবং এজন্য সামান্য ভোগান্তি পোহাতে হয়। কিন্তু বুঝতে হবে, এই সামান্য ভোগান্তি ছিল এমন অসংখ্য কল্যাণ আর উপকারের জন্য, যা একদিন আমার হাতে ধরা দিবে, নতুবা আখিরাতে আমার কাছে আসবে। আল্লাহর কাছে ফেরত যাওয়ার পর আমি এর উপকার ভোগ করব।

*****

এখন, আমি মারইয়াম সালামুন আলাইহা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ঐ বোনটি আমাকে তার সমস্যার কথা বলার সাথে সাথে আমার মারইয়াম সালামুন আলাইহার কথা মনে পড়ল। কারণ, তার আশ্চর্যজনক জন্মের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। খুব বেশি সংখ্যক মানুষের জন্মের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। মা একটি ছেলে সন্তান আশা করছিলেন। কিন্তু তার একটি মেয়ের জন্ম হলো। আর আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

> ওয়া লাইসাস জাকারু কাল উনসা।[৯৯]

যার অনেকগুলো গভীর অর্থ রয়েছে। আমি এখন শুধু একটি অর্থ উল্লেখ করছি। "এই মেয়েটি অন্য কোনো মেয়ের মতো নয়।" এই মেয়েটি স্পেশাল।

আপনাদের মধ্যে সন্তান সম্ভাবনা যারা, তারা অবশ্যই এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। আপনি আশা করছেন, আপনার মা আশা করছে, আপনার বাবা আশা করছে, আপনার চাচাত-খালাত ভাই-বোনেরা আশা করছে, একটি ছেলে শিশুর জন্ম হবে। কিন্তু একটি মেয়ের জন্ম হলো। তখন মনে রাখবেন, আল্লাহ মারইয়াম সালামুন আলাইহার জন্মের মতো কারো জন্মের কথা। মেয়ে সন্তান পাওয়া সম্মানের। মেয়ে সন্তান পাওয়া আল্লাহর একটি উপহার। মেয়ের জন্ম হলে অসন্তুষ্ট হওয়া আসলে মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

> "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে।"[১০০]

মেয়ে সন্তান পাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে আশীর্বাদ এবং সম্মান। মেয়ের জন্ম হলে যদি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন তাহলে আপনি শুধু আল্লাহর উপহারেরই অসম্মান করছেন না, আপনি কুরআনের আয়াতকেও অসম্মান করছেন। এই কথাগুলো মনে রাখবেন।

---

[৯৯] সূরা আলে-ইমরান ৩ : ৩৬

[১০০] সূরা আন-নাহল ১৬ : ৫৮

এবার মূল কথায় আসি।

এই শিশুর জন্ম হলো। একটু বেড়ে ওঠার পর তাকে বিশেষ একটি জায়গা দেয়া হলো, তখনকার সময়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার দেখাশোনা করতেন। কেননা তিনি তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর সূত্র ধরে যখনি তিনি তার খোঁজখবর নেয়ার জন্য আসতেন, দেখতেন অন্য মৌসুমের ফলমূল তার সামনে সাজানো। কুরআনের ভাষায়,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا

> "যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন।"[১০১]

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কোথায় পেলে তুমি? এই ফলগুলোর তো এখানে উৎপাদনও হয় না। এমনকি এগুলো এই সিজনেরও নয়। এইগুলো শীতকালে হয়, আর ঐগুলো গরমকালে ফলে। তুমি এসব ফল কোথায় পেলে?' মারইয়াম উত্তর দিতেন,

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ

> 'এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষভাবে এসেছে।'[১০২]

ভাবতে পারেন এমন একজনের কথা? যার দুআ এমনভাবে কবুল হয় যে, আকাশ থেকে তার জন্য খাদ্য অবতীর্ণ হয়! তাই যখন ঐ বোন আমাকে বলছিলেন তার দুআ কবুল হয়ে যায়, আমি সাথে সাথে মারইয়াম সালামুন আলাইহার কথা মনে করলাম। কী অলৌকিকভাবে আল্লাহ তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন, এমনকি খাদ্যের মতো বিষয়েও! যা আমরা নিজেরাই উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি। তাকে এমনকি সেজন্যও উঠতে হয়নি! স্পেশাল এক কিশোরী। খুবই স্পেশাল এক নারী।

এখন, এই নারী সম্পর্কে যে ব্যাপারটি আজকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে চাই তা হলো, পরে তার জীবনে কী ঘটেছিল। তিনি তখন তরুণী, একদিন তার নিকট এক ফিরিশতার আগমন ঘটল। ফিরিশতা বলল, সে একটি বাচ্চার মা হতে

---

[১০১] সূরা আলে-ইমরান ৩ : ৩৭

[১০২] সূরা আলে-ইমরান ৩ : ৩৭

যাচ্ছে। তার মাথায় প্রথমে আসল, আমি তো বিবাহিত নই, আমি মা হব বলে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?

لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

> 'আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আমার বাচ্চা হবে বলে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ!'

كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ

> 'এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন।'[১০৩]

আমি দুঃখিত, আমরা এসেছি শুধু সংবাদ জানাতে। এটা হবে কি হবে না সে ব্যাপারে পরামর্শ করতে আমরা আসিনি। সেই সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নেয়া হয়ে গেছে, তুমি একটি বাচ্চার মা হতে যাচ্ছ।

এখন তিনি পুরোপুরি আতঙ্কিত। দুশ্চিন্তার অতল থেকে ভাবছেন, 'আমি কী করব!' তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে আশা করতে পারেন এমনটি যেন না হয়। কিন্তু এটা তো ঘটবেই। আপনাদের জন্য আমি পরের কিছু ঘটনা এখন বর্ণনা করছি। যেন উপলব্ধি করতে পারেন এই নারী কেমন এক কঠিন পরীক্ষায় পড়েছিল।

বাচ্চার জন্মের পর, তিনি তার নিজ শহরে ফিরে আসলেন। সমাজের সবাই তাকে দেখত দুনিয়াত্যাগী আল্লাহ ওয়ালা নারী হিসেবে। এমন নারী যিনি আল্লাহর ইবাদতে সব সময় নিয়োজিত থাকতেন। এমন নারী যাকে তাদের নবী যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সমর্থন জানিয়েছিলেন। এমন নারী যিনি যাকারিয়া আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠেন। তো, মসজিদের আশেপাশের সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তিনি একটি বাচ্চা কোলে করে এগিয়ে আসছেন।

সবাই তখন একসাথে তাকে অপমানিত করা শুরু করল। 'কীভাবে তুমি এমন কাজ করতে পারলে? নিজের কী সর্বনাশ করে ফেলেছ তুমি?'

পর্দার অপর পাশে আজকের জুমুআর নামাজে অনেক মহিলাও উপস্থিত আছেন। আপনারা জানেন, কোনো মুসলিম নারী এমন অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারেন না যেখানে তিনি একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর মানুষ বলছে এই বাচ্চা বৈধ নয়। তার পক্ষে এমন ধরনের অপমানের কথা কল্পনায়ও

---

[১০৩] সূরা মারইয়াম ১৯ : ২০-২১

আনা সম্ভব নয়। কোনো মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমরা পুরুষরাও এই ধরনের অভিযোগের কথা কল্পনা করতে পারব না আমাদের বোনের জন্য, আমাদের মায়ের জন্য, আমাদের মেয়ের জন্য। এমন কষ্টের কথা আমরা ভাবতে পারি না। এটা আমাদের চিন্তার বাইরের।

একজন মুসলিমের জন্য আমাদের মান-মর্যাদা অনেক মূল্যবান। আত্মমর্যাদার যে চেতনা আল্লাহ আমাদের দান করেছেন, তা আমাদের কাছে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান। আর তিনি জানতেন তিনি যখন নিজের এলাকায় ফেরত যাবেন তখন লোকজন এমন কথাই বলবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। লোকসম্মুখে তার মুখের উপর কথা বলছে। একেবারে সরাসরি তাকে বলছে।

এখন আমি আপনাদের আবার পেছনে নিয়ে যাচ্ছি যে, তিনি কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করলেন। ভেবে দেখুন, যত দুআই তিনি করেন না কেন আল্লাহর সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাকে সমাজের সামনে এভাবে দাঁড়াতে হবে। তখন তিনি কী করলেন?

যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো, তিনি বলে উঠলেন

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا

> "হায়, আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম!"[১০৪]

তার মন-মস্তিষ্ক পুরোটা এই চিন্তায় চরম আতঙ্কিত। কারণ, সামনে যে অপমান সইতে হবে তার থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে সহজে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কুরআনের অন্য কোথাও কারো মৃত্যু কামনা করার কথা উল্লেখ নেই। শুধু এই জায়গায় উল্লেখ আছে। একবার চিন্তা করে দেখুন। কেন তিনি মৃত্যু কামনা করছেন?

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা স্বীকার করছেন যে, কখনো কখনো মানুষ এমন কঠিন মানসিক আঘাতে জর্জরিত হবে যে মৃত্যু কামনা করে বসবে। এমন পরিস্থিতিতেও মানুষ পড়বে। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এখানে মানুষের মানসিক বিপর্যস্ততায় আসা চিন্তাকেও মূল্যায়ন করছেন। ঠিক এমনই এক চরম পরিস্থিতিতে তিনি পড়ে গেলেন। আর আল্লাহ এটা স্বীকার করলেন এবং কুরআনে উদ্ধৃত

[১০৪] সূরা মারইয়াম ১৯ : ২৩

করলেন,

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا

| "হায়, আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম!"

আমি এটা পড়ার পর প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। কীভাবে তিনি এমন কথা বলতে পারলেন! জানেন তো? আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ

| 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে।'

তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়। আবার কেউ কখনো সহজেই কিন্তু মৃত্যু কামনা করে না। কিন্তু, তিনি এখানে মৃত্যু কামনা করছেন! কেন? এটা অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতি। মারাত্মক এক অবস্থা। তো, তিনি যে অপমানের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন তা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। তাই তিনি বললেন,

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا

| 'হায়, আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম!'

এই কথা কুরআনে উল্লেখ করার কারণ আছে। দুনিয়ার এই জীবনে মানুষ অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়বে। আর এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় চোখে পড়বে না। অনেককে তাদের পরিবারের সম্মুখীন হতে হবে, মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন হবে, অতীতের কোনো ভুলের মোকাবিলা করতে হবে, কে জানে? তাদেরকে এমন ধরনের মানসিক আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে। তখন তারা মারইয়াম সালামুন আলাইহার উদাহরণে সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে যাননি। তিনি বললেন, وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

তার কথাটির সাধারণ অনুবাদ করা হয়, **'হায়, যদি আমি মরে যেতাম, যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'** এভাবেই অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এখানে যে দুইটি শব্দ আছে সেটা উনারা ভুলে গেছেন।

একটা শব্দ **'নাসইয়ান'**। **নাসইয়ান অর্থ কী?**

মারইয়াম আলাইহাস সালাম বাড়িতে অবস্থান করছেন না। তিনি তো মসজিদ থেকে অনেক দূরে, ঠিক না? 'আমি আশা করছি, কেউ যেন কোনোদিন আমাকে অনুভবও না করে।' তারা যেন এই প্রশ্নটাও না করে যে, মারইয়াম কোথায় গেল? আমি যদি অদৃশ্য হয়ে যেতাম, যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম, এই মুহূর্তে। কারো যেন কোনোদিন আমার কথা মনেও না হয়। এটা হলো 'নাসি' এর অর্থ। কারো যেন এই চিন্তাও মাথায় না আসে যে একসময় আমার অস্তিত্ব ছিল।

এমন অনেকেই আছে যারা এত কঠিন হতাশা এবং উদ্বেগের ভেতর দিয়ে যায় যে, ঘর থেকেই বের হয় না। তারা ঘর ছেড়ে বের হয় না। ফোন রিসিভ করে না। টেক্সট মেসেজের কোনো জবাব দেয় না। মানুষের সঙ্গ তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। তারা এত বেশি মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে যে, তাদের ইচ্ছে হয়, যদি তারা মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত। আসলে, কেউ যদি তাদের দরজায় করাঘাত করে, তারা ভাবে, হায়, যদি তারা আমার কথা ভুলে যেত! হায়, যদি আমার কারো সাথে আর দেখা না হতো! তারা সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মাঝেই বাস করতে চায়। **এর নাম হলো, নাসইয়ান।**

তিনি ইতোমধ্যে আশা করছেন যেন তার মৃত্যু হয়, কেউ যেন তার খোঁজ করতেও না আসে। পরে অনেক বছর পার হয়ে গেলে কেউ যেন না জানে তার কী হয়েছিল। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা?

আরেকটি শব্দ **'মানসিইইয়ান'**—সবাই যেন তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। ভবিষ্যতেও তার কোনো উল্লেখ কোথাও যেন না থাকে। আমি আশা করছি, কেউ যেন এই মুহূর্তে আমার কথা মনে না করে এবং আমি ভবিষ্যতেও যেন সবার স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাই।

*****

আমি এই মহান নারীর পরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে চেয়েছি কারণ, ইনি এমন একজন নারী যার দুআ সাথে সাথেই কবুল হয়ে যেত। তাকে এমনকি খাদ্যও চাইতে হয়নি, এমনিতেই তার জন্য ফলফলাদি এসে উপস্থিত হতো। আর আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেললেন। আল্লাহ তাকে এমন পরীক্ষায় ফেললেন। একবার চিন্তা করে দেখুন।

এই জন্য না যে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। এই জন্য না যে, আল্লাহ তার কথা ভুলে গেছেন। এই জন্য না যে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করতে চান। শেষে দেখা যায়, এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ আসলে তাকে অকল্পনীয়ভাবে সম্মানিত করলেন। সবকিছু এই জন্য ঘটেছে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করতে চান।

কোন অপমানের ভয় তিনি করছিলেন?

তার অপমানের ভয় ছিল, মানুষ বলবে, তুমি বিয়ে ছাড়াই এই সন্তানের মা হয়েছ। তোমার এটা হারাম ছেলে। মানুষ এটাই বলবে। আর জানেন তো বাচ্চার নাম কী ছিল? তার নাম ছিল ঈসা। আলাইহিস সালাম। **কুরআনে কোনো নবীর নামের সাথে তার পিতা বা মাতার নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু ঈসা আলাইহিস সালাম ছাড়া**। ঈসা ইবনু মারইয়াম, ঈসা ইবনু মারইয়াম, ঈসা ইবনু মারইয়াম। বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা মারইয়ামের ছেলে। ঈসা মারইয়ামের ছেলে। কুরআনে কোথাও কি আছে, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর ছেলে? কুরআনে কোথাও কি পান ইয়াকুব ইসহাকের ছেলে? ইসহাক ইবরাহীমের ছেলে? ইউসুফ ইয়াকুবের ছেলে? পেয়েছেন কখনো? না, না।

অনেকবার আল্লাহ যখনই এই রাসূলকে সম্মানিত করেছেন, সাথে সাথে তার মাকেও সম্মানিত করেছেন। সুবহানআল্লাহ।

প্রসঙ্গত, বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। আরবরা যখন ইবনু বলে এমনকি সেমেটিক মানুষেরা যখন ইবনু বলে, ইবনু উল্লেখ করার ঠিক পরপরই তারা পিতার নাম উল্লেখ করে। আপনার নামের শেষাংশ আসে পিতার কাছ থেকে। আল্লাহ এই সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, না, তার কোনো পিতা নেই; আর আমি সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে এই মাকে সম্মান দেখাব। ঈসা ইবনু মারইয়াম বলার মাধ্যমে। প্রতিবার।

*****

আল্লাহ এই অপমানের কথা উল্লেখ করেছেন অন্য কারণে। আর এই বিষয়টা বলেই আমার আলোচনার সমাপ্তি টানছি। আমার আলোচনার এক জায়গায় বলেছিলাম, কখনো কখনো আপনার সাময়িক কষ্ট আপনার চিরস্থায়ী মানুষের মুক্তির কারণে পরিণত হতে পারে। আপনি সমস্যায় পড়েছেন, কারণ, এটা আপনার থেকেও বড় কোনো উদ্দেশ্য সাধন করবে। হয়তো আপনার কষ্টের

পর্ব থেকে আরো দশজন মানুষ আলোকিত হবে। আপনি তখন তাদের জন্য সাদকায়ে জারিয়ায় পরিণত হবেন। আপনার কারণে তারা ভালো কিছু অর্জন করবে। সেটা কীভাবে সম্ভব?

এই যে মারইয়াম সালামুন আলাইহার কথাই চিন্তা করুন... প্রতিবার যখন কোনো নারী অপমানিত হবে, প্রতিবার যখন কোনো নারী অপবাদের শিকার হবে, প্রতিবার যখন কোনো নারী কামনা করবে যদি সে মরে যেত পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে—তখন সে মারইয়াম সালামুন আলাইহার কষ্টের মাঝে নিজের জন্য দিকনির্দেশনা এবং সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন।

আর প্রত্যেকবার যখনই কোনো নারী সান্ত্বনা খুঁজে পাবে মারইয়াম সালামুন আলাইহার মর্যাদা এতে আবারও বেড়ে যাবে, আবারও বেড়ে যাবে, আবারও বেড়ে যাবে। সুবহানআল্লাহ।

*****

আমাদের দুআর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করি। আমাদের দুআ এমন কিছু নয় যার মাধ্যমে এই দুনিয়া জান্নাতে পরিণত হবে। পৃথিবীর এই জীবনে পরীক্ষা থাকবেই। আমাদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম মানুষদের জীবনে সমস্যা ছিল। আল্লাহ তাআলা এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

> ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মাঝে।’[১০৫]

কষ্ট-ক্লেশ জীবনের অংশ। দুআর উদ্দেশ্য হলো, আমাকে-আপনাকে এই কষ্টগুলো মোকাবিলায় সাহায্য করা। আর কখনো ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সময় কঠিন যাক বা সহজ যাক। দুআ চেয়েই অস্থির হয়ে যাবেন না। আপনি যেটা চাইছেন, সেটাতেই একমাত্র কল্যাণ—এমনটা ভাববেন না। আল্লাহকে নিয়ে সুধারণা রাখবেন সর্বাবস্থায়। “দুআ কবুল হওয়া” মানেই সমাধান স্বচক্ষে দেখতে পারা—এই ভুল ধারনা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

*****

---

[১০৫] সূরা আল-বালাদ ৯০ : ৪

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আমাদের সেসব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন যারা দুআ করতে ভুলে যায়, আল্লাহকে ডাকতে পারে না, ঈমান হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আমাদের মর্যাদা দান করুন এবং আমাদের এই কথা স্মরণে রাখতে সাহায্য করুন যে, মানুষ আমাদের যতই অপমান করতে চেষ্টা করুক না কেন... মানুষ আপনাকে ছোট করতে চাইবে, মানুষ আপনাকে অপমানিত করতে চাইবে যেভাবে তারা মারইয়াম সালামুন আলাইহাকে অপমান করেছিল, কিন্তু আল্লাহ এখনও আপনাকে সম্মান দান করেন।

লোকে আপনার সম্পর্কে কী মনে করে আর আল্লাহ আপনার সম্পর্কে কী মনে করেন এর মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে। কারণ, আপনি যদি লোকের কথা মানেন তাহলে মারইয়াম ঐ মুহূর্তে ছিলেন সমাজের সবচেয়ে অপমানিত, অপদস্থ ব্যক্তি। আর যদি আল্লাহর কথা মানেন তাহলে তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাবান নারীদের একজন। তাই আমরা আল্লাহর কথা মানব। আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

> 'আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।'[১০৬]

আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে তাঁর নিকট সম্মানিত মানুষে পরিণত করুন, মানুষের নিকট সম্মানিত করার পূর্বে। বারাকাল্লাহু লিই ওয়ালাকুম ফীল কুরআনিল হাকিম। ওয়ানাফা'নিই ওয়া ইইয়াকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকিম।

দুনিয়া ও আখিরাতে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া, সব ধরণের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা এবং সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত ও অকল্যাণ-অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকার একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দুআ। তাই দুআ করবেন মন খুলে! অন্তর উজাড় করে আল্লাহর সাথে কথা বলবেন। মাথা থেকে সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা/ ব্লক এবং "কিন্তু" গুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দুআ করুন! নামাজের ঠিক পরের মুহূর্তটি কিন্তু দুআ করার একটি মোক্ষম সময়!

---

[১০৬] সূরা আল-ইশরা ১৭ : ৭০

নবীদের দুআ থেকে শিক্ষা

[এক].

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম অত্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দুআ করেন,

> "হে আমার পালনকর্তা! বয়সের ভারে আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে আর আমার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। ইয়া রব! আমি তো আপনাকে ডেকে কখনোই অখুশি হইনি! আমি ভয় করছি আমার পরবর্তী উত্তরাধিকার নিয়ে।"[১০৭]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম চিন্তায় পড়ে যান যে, তিনি সন্তানহীন অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে তার দ্বীন প্রচারের মিশনটাকে কে এগিয়ে নিয়ে যাবে? তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান চাইলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন তিনি আল্লাহকে ডেকে কখনো অখুশি হননি! অর্থাৎ এই যে এত বছর ধরে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করে গিয়েছেন, এই পুরো প্রক্রিয়াতে তিনি অখুশি হননি! উত্তর তার মনমতো হোক বা না হোক, তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, তাড়াহুড়া করেননি! আমরা কি এভাবে বলতে পারব যে, "ইয়া রব! সারা জীবন এভাবে তোমার কাছে চেয়ে চেয়ে আমি কখনো অসন্তুষ্ট হইনি! চাওয়াটাই আনন্দ! আপনি যেভাবেই কবুল করুন না কেন!"

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তার দুআ কবুল করলেন এবং তাকে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ভীষণ অবাক! তিনি

---

[১০৭] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৩-৬ ভাবানুবাদ

ভাবছেন, এত বৃদ্ধ অবস্থায় আমার স্ত্রীর জন্য জীববিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্তান ধারণের কোনো অবস্থাই নেই, সেখানে তিনি কীভাবে সন্তানের জন্ম দিবে? আল্লাহ বললেন, আল্লাহর জন্য সবই সহজ। তিনি বলেন "হও" আর এটা হয়ে যায়। সুবহানআল্লাহ!

[দুই].

মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যে, আল্লাহ যেন তার জিহ্বার গিঁট খুলে দেন। তিনি যেন ফিরাউনের সামনে গিয়ে স্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে কথা বলে তাকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারেন। মুসা আলাইহিস সালামের ছোটবেলা থেকেই মুখের কথায় জড়তা ছিল। কিছুটা আটকে যেত তার কথা, অনেকটা Stuttering বা তোতলানোর মতন। তিনি ফিরাউনের কাছে যাবার আগে আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ যেন তার জিহ্বার সেই জড়তা কাটিয়ে দেন। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন,

> "হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন।"[১০৮]

আল্লাহ বললেন,

> "হে মুসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো।"[১০৯]

সুবহানআল্লহ! এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন? যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বা মুসা আলাইহিস সালাম কতটা আদব এবং স্বচ্ছ নিয়তের সাথে আল্লাহর

---

[১০৮] সূরা ত্বহা ২০ : ২৫-৩৫

[১০৯] সূরা ত্বহা ২০ : ৩৬

কাছে ফরিয়াদ করেছেন? তারা আল্লাহর কাছে দুইটা বিশেষ জিনিস চাইলেন। এবং তাদের নিয়ত হচ্ছে, তারা এই কাঙ্ক্ষিত দুআর বস্তু ব্যবহার করে আরো আন্তরিকভাবে যেন আল্লাহর কাজ করতে পারেন! যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার সন্তানের মাধ্যমে তার বংশে আল্লাহর দ্বীনের কাজ জারি রাখবেন। মুসা আলাইহিস সালাম স্পষ্ট কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে ফেরআউনকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন! তারা আল্লাহর জন্য মেহনত করবেন বলে বিশুদ্ধ নিয়তে কিছু চাচ্ছেন। আল্লাহ তাদেরকে সেটাই দিলেন।

আমরা আল্লাহর কাছে যেই জিনিসগুলো চাই—আসলে কেন চাই? শুধু নিজের খায়েস মেটাতে? নাকি এর চেয়ে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য আছে?

নিজের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য চাওয়াটা দোষের কিছু না। তবে, আল্লাহ আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এটাও সত্য। নিজেদের ইচ্ছাগুলোকে আর দুআগুলোকে যখন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী একই রেখায় নিয়ে আসতে পারব, তখন আমাদের অন্তরে না পাওয়ার হাহাকার অনেক কমে যাবে। এই আদর্শটা ঠিক রাখলে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কের হিসাব অনেক সহজ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ!

সেই সাথে আপনি যখন আপনার দুআ নিয়ে পুলকিত এবং আনন্দিত থাকবেন, তখন সেটা আপনার নামাজকেও জীবন্ত করবে! আপনার মনে হবে, ইস! সিজদায় গিয়েই এখন রবের কাছে মন খুলে চাইব। সুবহানআল্লাহ!

নামাজ শেষে যিকির

নামাজটা শেষ হলেই মনে হয় এই মুহূর্তে জায়নামাজ গুটিয়ে দৌড় দিতে হবে! ইস, দুনিয়ার কত কাজ পড়ে আছে! অথচ দুনিয়ার কোন কাজটা আল্লাহর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জায়নামাজে কিছুক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত সময় কাটানোর মাঝপথে আমরা সেই কাজকে দাঁড় করিয়ে দেই?

জায়নামাজে বসে অল্প কিছু মিনিটের যিকির বাকি পুরোটা সময় অন্তরকে ঠান্ডা রাখে। খুব মোলায়েমভাবে আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষ করে অন্তর দুনিয়াবী কাজে ফিরে যায়। এর বিপরীতে ঠাস্ঠুস করে নামাজটা শেষ করেই দুনিয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে পরে ঈমানে, অন্তরে আর শরীরে নামাজের মিষ্টতার আমেজ বজায় থাকে না।

আমরা কি চাই না আল্লাহর পবিত্র ফিরিশতারা আমাদের জন্য দুআ করুক? নিশ্চয়ই খুব করে চাই। কারণ, ফিরিশতারা দুআ করলে সেই দুআ কবুল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই সীমাহীন বরকত আমরা লাভ করতে পারি নামাজের পর একটু খানি সময় নামাজের জায়গায় বসে থেকে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "ফিরিশতাগণ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ করেন, যতক্ষণ সে ওই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে সালাত আদায় করেছে, যতক্ষণ না তার ওযু নষ্ট হয়ে যায়। তারা বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, তার প্রতি সদয় হও'।"[১১০]

---

[১১০] সহীহ বুখারী: ৪৪৫

নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসেই খুব অল্প সময়ে এমন কিছু আমল করে ফেলা যায়। আমি এখানে আমার প্রিয় কিছু আমল উল্লেখ করছি ইনশাআল্লাহ।

*****

এক. আস্তাগফিরুল্লাহ - ৩ বার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন।

এখানে প্রশ্ন হলো, আমরা এইমাত্র নামাজ পড়লাম। নেকীর একটা কাজ করলাম। তাহলে ভালো একটা কাজের শেষে কেন 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলছি? এটার প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা হচ্ছে, প্রকৃত ঈমানদাররা কখনোই কোনো ভালো কাজ করে 'অনেক কিছু করে ফেললাম' এরকম মনোভাব রাখেন না। আমরা ভালো কিছু করেই সেটা নিয়ে অহংকারী হয়ে যেতে পারি না। বরং যেই কাজটা করেছি সেটার মধ্যেও যে নিজেদের অজস্র ভুলত্রুটি রয়েছে—এটা স্বীকার করে নিয়ে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে নিজেদের অপারগতার জন্য ক্ষমা চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতন শ্রেষ্ঠ মানুষ যেখানে নামাজ শেষ হতে না হতেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, সেখানে নামাজ শেষে আমরা কি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবার আরো বেশি মুখাপেক্ষী নই! ব্যস্ততা এবং বাস্তবতার জন্য অনেকের পক্ষে জায়নামাজে বেশিক্ষণ বসে থেকে যিকির করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের মায়েদের জন্য। তবে তিন সেকেন্ডে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে এই সুন্নাহ পালন করাটা কমবেশি সবার জন্য সহজতর হবে ইনশাআল্লাহ।

*****

ইস্তিগফার—যে দুআ সকল মুশকিল আহসান করে দেয়

আল্লাহ তাআলার কাছে কোনোকিছু চাওয়ার আগে, আমাকে এবং আপনাকে তাঁর নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। আমার-আপনার যে প্রয়োজনগুলো আছে সেগুলো চাওয়ার পূর্বে আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আন্তরিকার সাথে ক্ষমা চাইতে হবে। এটা শোনার পর আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্ষমা চাওয়ার জন্য কোন দুআ পড়তে হবে বা ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দুআ কোনটি?

মানুষ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের দুআ করে থাকে। যেমন, একজন সন্তান-সম্ভাবা মা এসে জিজ্ঞেস করেন, কিছুদিনের মধ্যে আমার বাচ্চা হবে, এখন আমার জন্য কোন দুআ করলে ভালো হবে? অথবা কেউ একজন এসে জিজ্ঞেস করল, আমি চাকরীর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, কোন দুআটি আমি এখন করতে পারি? আমাকে বিশেষ সময় উপলক্ষ্যে বিশেষ দুআ বলে দিন। এমন আবদারের প্রেক্ষিতে আমরাও বিশেষ দুআর কথা বলে থাকি।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি।

বিশেষ সময়ের ঐ দুআগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেগুলো পবিত্র এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে সেগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, করতে বলেছেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন, এমন কোনো দুআ কি আছে, যেটা আমরা সকল সমস্যার সমাধানে পড়তে পারব? বলব হ্যাঁ; সকল সমস্যার ক্ষেত্রে কমন (সার্বজনীন) দুআ হলো—আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যে একটি দুআ আপনার সকল সমস্যা দূর করবে তা হলো, সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন ৯০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তিনি তার জাতিকে অবিরাম দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তিনি তাদের নিকট শুধু একটি বার্তা নিয়ে যাননি। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে শুধু একবার বা দুইবার কথা বলেননি। তিনি বলেন, "হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি।"[১১১]

তিনি দিনের পাশাপাশি রাতেও কোনো বিরতি নেননি। প্রতিনিয়ত তাদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। পবিত্র কুরআনে তার নামে একটি সূরা নামকরণ করা হয়েছে। সূরা 'নূহ'। এই সূরাতে তিনি তার সম্প্রদায়কে গোটা সময় ধরে যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন তার একটা সারমর্ম তুলে ধরা হয়েছে। এখানে নূহ আলাইহিস সালামের ভাষ্য হলো; আমি গোটা সময় ধরে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ইয়া রব। আল্লাহ বলেন—

> "আর আমি প্রতিটি সময় তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি এই বিশ্বাসের পথে আসতে, যাতে ইয়া রব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।"[১১২]

---

[১১১] সূরা নূহ ৭১ : ৫

[১১২] সূরা নূহ ৭১ : ৭

ঠিক এই কথাগুলো আমি তাদেরকে বারবার বলেছি। বারবার বলেছি। অতঃপর বলেছি, "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"[১১৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হলেন এমন সত্তা, যিনি বারবার, বারবার এবং বারবার ক্ষমা করতে থাকেন।

এরপর তিনি যা বলছেন, তা খুবই অসাধারণ। এর আগে আমি চাই আপনারা এই বিষয়টা উপলব্ধি করুন যে, তিনি কোন ধরনের মানুষদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। তিনি ইতিহাসের অন্যতম মন্দ একটি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কথা বলছিলেন। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে পৃথিবীর অন্যতম চরম অবাধ্য জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আজ জারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ফলে গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তারপর সূরা আন-নাজম এ যখন নূহ আলাইহিস সালামের জাতির কথা আসলো; তখন তিনি বললেন, "এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল অতিশয় সীমালঙ্ঘনকারী (জালিম) ও চরম অবাধ্য।"[১১৪]

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হলো; অন্যান্য নবীর উম্মতের মতো তাদের শুধু এক প্রজন্মের জন্য নবী ছিলেন না নূহ আলাইহিস সালাম। প্রতি শতাব্দীতে, তিন-চার প্রজন্ম মানুষের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের একজনই নবী ছিল। প্রতি বিশ বছর পর পর নতুন নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে আর নূহ আলাইহিস সালাম এটা দেখেছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে! তিনি চল্লিশ-পঞ্চাশ কিংবা তার বেশি প্রজন্মের মানুষদের দেখেছিলেন আর তারা সবাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তিনি সকল প্রজন্মকে একই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে বারবার তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন? তিনি বলেছেন—"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

কিন্তু তার প্রস্তাব এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি তার জাতিকে বলেন, যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আসমানের

---

[১১৩] সূরা নূহ ৭১ : ১০

[১১৪] সূরা আন-নাজম ৫৩ : ৫২

দরজা খুলে দিবেন। আর এটা তোমাদের উপর অঝোর ধারায় করুণা বর্ষণ করবে। এর দ্বারা বৃষ্টিও বোঝানো হতে পারে। পরিহাসের বিষয় হলো, এখানে বৃষ্টি দ্বারা বন্যার ইঙ্গিত করা হয়নি। যদিও শেষমেশ তারা বন্যা কবলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

এই আয়াতে আল্লাহ ভিন্ন ধরনের বৃষ্টির কথা বলেছেন। যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, যে বৃষ্টি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই বৃষ্টি হতে পারত তাদের জন্য জীবন আহরণকারী। তোমরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করো, আকাশের দরজা তোমাদের জন্য খুলে যাবে আর তা বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকবে। আকাশ শুধু বৃষ্টি নয়, রহমতও বর্ষণ করতে পারে। আকাশ থেকে আসে ক্ষমা, আকাশ থেকে প্রশান্তি আসে, বিশ্বাস আসে, রিযিক আসে। সমস্যার সমাধান আসে আসমান থেকে। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ খুলে দিবেন। আর আকাশের সকল সম্পদ তোমাদের উপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হবে। এতদিন তোমরা রহমতের ভাগিদার হতে পারছিলে না, কারণ তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করোনি। তাই, এখন ক্ষমা চাইলে এটা খুলে যাবে।

আপনি সাধারণত একটা একটা করে আপনার সমস্যাগুলোর কথা আল্লাহকে বলেন। আপনার এমন সমস্যাও থাকতে পারে যার কথা আপনি নিজেও জানেন না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আপনি আর আমি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারি, তাহলে সেই অজানা সমস্যাগুলোও স্বর্গীয় হস্তক্ষেপে সমাধান হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানু তাআলা এখানেই থেমে যাননি! আল্লাহ বলেন,

> "যদি তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তাহলে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিব।"[১১৫]

তিনি ধন-সম্পদ এবং সন্তান দিয়ে আপনাদের জীবন সমৃদ্ধ করে দিবেন। এমন সম্পদ নয় যা আল্লাহর কাছ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দিবে; কারণ, এই সম্পদ দেয়ার কথা এসেছে আপনার ক্ষমা চাওয়ার প্রেক্ষাপটে। তিনি আপনাকে ভালো সম্পদ দিবেন, যা আপনার জন্য দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ নিয়ে আসবে। তিনি আপনাদের ভালো সন্তান দান করবেন, যারা আপনাদের জীবিত থাকা অবস্থায় ভালো কাজ করবে। তারা আপনাদের সম্মান করবে, ভালোবাসা

---

[১১৫] সূরা নূহ ৭১ : ১২ [ভাবানুবাদ]

দেখাবে, আনুগত্য করবে, আপনি তাদের দেখে গর্বিত হবেন। তারা জীবিত থাকা অবস্থায় আপনাকে সুখী করবে। এমনকি আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেও ভালো কাজ করতে থাকবে, যা সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে আপনার আমল নামায় যুক্ত হতে থাকবে। আল্লাহ আপনাকে এই সবকিছু দান করবেন।

প্রসঙ্গত এই দুই শব্দ; সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি এই সূরার শেষের দিকে একটি আয়াতেও এসেছে। আল্লাহ বলেন—"নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।"[১১৬]

এই আয়াতে বলা হচ্ছে; ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ক্ষতির উপকরণ। কিন্তু আপনার ক্ষমা চাওয়ার পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আসবে, তা আপনার জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে। একই সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, পার্থক্য হলো এখন তাদের উপর আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত আছে। বিষয়টা এমন, যেন তারা দূষিত হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে তাদের পরিশুদ্ধ করে দেন।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও।" আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আপনি কী কী সুবিধা পাবেন? আল্লাহ আপনার জন্য আকাশের দুয়ার এমনভাবে উন্মুক্ত করে দিবেন যা আপনার জন্য অকল্পনীয়।

- আপনি সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবেন।
- আপনার বুঝ-ব্যাবস্থার উন্নতি হবে।
- আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
- আপনাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন।
- এটাই শেষ নয়, আল্লাহর আরো বলছেন, "তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দিবেন আর দিবেন নদী-নালা।"[১১৭]

এসব আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ আপনাকে এই সব দিবেন যদি আপনি শুধুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা পারেন। আপনি যেকোনো কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন

---

[১১৬] সূরা নূহ ৭১ : ২১

[১১৭] সূরা নূহ ৭১ : ১২

অথবা শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন, তাহলে আপনার সব চাওয়া পূরণ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

*****

একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর কাছে সমস্যা নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি আসলো।

একজন বলল, হুজুর ক্ষেতে ফসল, ফল-ফলাদি আগের তুলনায় অনেক কম হচ্ছে। কী আমল করলে সুফল পাব? হাসান বসরি রহ. বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, বেশি বেশি ইস্তিগফার করো। লোকটা চলে গেলো।

আরেকজন এসে বলল, হুজুর বিপদে আছি। অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা পিছু ছাড়ছে না। কী পরামর্শ দিবেন? তিনি রহ. বললেন, বেশি বেশি ইস্তিগফার করো।

আরেকজন এসে বলল, হুজুর আমাদের এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে না। আমরা কি করতে পারি? তিনি বললেন, বেশি বেশি ইস্তিগফার করো।

আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে না। কী আমল করলে আল্লাহ সন্তানাদি দান করবেন? তিনি রহ. বললেন, বেশি করে ইস্তিগফার করো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর খাদিম একরাশ বিস্ময় আর কোতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর, চারজন ব্যক্তি আসলেন ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা নিয়ে। আপনি সমস্ত অভিযোগ ও অনুযোগের চিকিৎসার জন্য একই কথা বলে দিলেন এর কারণ কি? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

তিনি বললেন দেখো; এই সমাধান আসলে আমি দিইনি। বহুমুখী সমস্যার বিপরীতে এই একটি সমাধান দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ বলেন—

> "তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (তোমরা তা করলে) তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।"[১১৮]

---

[১১৮] সুরা নূহ ৭১ : ১০-১২

দুই. শান্তির দুআ

নামাজ শেষে তিন বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম।"

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনিই শান্তি, আপনার কাছ থেকেই শান্তি আসে। আপনি বরকতময়, পরাক্রমশালী এবং মর্যাদা প্রদানকারী।'[১১৯] .

*****

তিন. আয়াতুল কুরসী

ব্যাপারটা কেমন দারুণ হবে বলুন তো, যদি আপনার এবং জান্নাতের মাঝে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পর্দাই না থাকে? সুবহানআল্লাহ! এই অসম্ভব সাফল্য অর্জন সম্ভব প্রতি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠের মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে যাওয়া থেকে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছুই বাধা দিতে পারবে না।"[১২০]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু লাইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আল হাইয়ুল কাইয়ূমু লা-তা'খুযুহূ ছিনাতুওঁ ওয়ালা-নাওমুন লাহূ মা-ফিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদি মান

---

[১১৯] মুসলিম ১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১, তিরমিজি ১/৬৬

[১২০] মুসলিম, নাসাঈ

যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূইল্লা-বিইযনিহী ইয়া'লামুমা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খালফাহুম ওয়ালা-ইউহীতূনা বিশাইইম মিন 'ইলমিহীইল্লা-বিমা-শাআ ওয়াছি'আ কুরছিইয়ুহুছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা ওয়ালা-ইয়াঊদুহু হিফজু হুমা-ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ূল 'আজীম।

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আরশ সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোর সুরক্ষা দান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।'[১২১]

*****

চার. দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার দুআ

মনে পড়ে ২০২০ সালের শুরু কথা? করোনার ভয়ে সবাই তটস্থ। চাকরি হারিয়ে, প্রিয়জন হারিয়ে, জানাযা দিতে না পেরে সবাই অস্থির, এলোমেলো! জীবনে যেন বিভীষিকা নেমে এলো! আমরা অনেকেই এই কঠিন সময়ে কমবেশি ঈমান এবং তাওাক্কুলের পরীক্ষা দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই পরীক্ষারত অবস্থায় যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে, আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয়ের জায়গাগুলো কোথায়? তাহলে ঘুরেফিরে উত্তর পাব; চারপাশে এত বিশৃঙ্খলা, ফিতনা এবং অনিশ্চয়তার ভয়, মৃত্যুর ভয়, কবরের ভয় এবং শেষ পরিণাম হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়!

জানেন এই ভয়গুলি নিয়েই খুব প্রাসঙ্গিক এবং পাওয়ারফুল একটা দুআ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নামাজে তাশাহুদের পর এই দুআটি পাঠ করতেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১২১] সূরা বাকারা ২ : ২৫৫

বলেছেন,

> "তোমাদের কেউ যখন তাশাহুদ পাঠ করবে তখন সে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষাগুলি এবং দাজ্জালের কুফলসমূহ, তারপরে সে যা চায় নিজের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।"[১২২]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া মিন 'আযা-বি জাহান্নামা, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে।'

করোনা ভাইরাসে ভীত হয়ে মানুষের যে পরিমাণ মানবিকতা লোপ এবং বিশৃঙ্খলার নজির দেখছি, দাজ্জালের ফিতনার সময়ে যে কী বিশৃঙ্খলা হবে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের বেশি বেশি এই দুআটি পাঠ করে আল্লাহর কাছে ভয়ংকর পরিণাম থেকে পানাহ চাওয়া উচিত।

*****

পাঁচ. মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুআ

ভাবুন তো, আল্লাহর খুব প্রিয় কোনো বান্দা যদি আপনার হাত তার হাতের মাঝে রেখে আপনাকে একটা দুআ শিখিয়ে যায় সেই দুআটার একটা অন্যরকম গুরুত্ব থাকবে না? ঠিক তেমনটাই হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে!

মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার

---

[১২২] নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, ১২৯৩

হাত ধরে আমাকে বললেন,

> 'হে মুয়ায, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমিও আপনাকে ভালোবাসি।' তিনি বললেন, 'মুয়ায, তুমি প্রত্যেক নামাজের শেষে এই দুআটি পড়া থেকে কখনো বিরত থেকো না।'

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা আ-ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।'[১২৩]

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনার যিকির করতে, আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন।'

*****

ছয়. জান্নাতের রত্নভান্ডার পাবার দুআ – ১ বার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওহে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস, আমি কি জান্নাতের এক রত্নভান্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না?"

আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস বললেন, "নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।"

তিনি বললেন, "তুমি বলো,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ: লা-হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।'"[১২৪]

*****

---

[১২৩] মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত

[১২৪] বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২১৩, নং ৪২০৬; মুসলিম ৪/২০৭৬, নং ২৭০৪

সাত. সাগরের ফেনারাশি সমতুল্য গুনাহ মাফের দুআ – ১ বার

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার 'সুবহানআল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ', ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১শ' বার পূর্ণ করার জন্য একবার 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমতুল্য হয়।"[১২৫]

প্রত্যেকটি ৩৩ বার,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার।

অর্থ: 'আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

তারপর একবার,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর।

অর্থ: 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

*****

আট. সবকিছু চাওয়ার দুআ

শেষের দুআটা আমার খুব প্রিয়। আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে একটা মানুষ যা যা চাইতে পারে, তার সবকিছুর নির্যাস একটি কথায় প্রকাশ করা হয়েছে এই দুআটাতে। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[১২৫] মুসলিম ১২২৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ফজরের নামাজের সালাম ফেরানোর পরে নিয়মিত এ দুআটি পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন্ ওয়া রিয্কান ত্বায়্যিবান ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান।

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন জ্ঞান চাই যেটা কল্যাণকর, এমন রিযিক চাই যা পবিত্র ও হালাল এবং এমন আমল করার তাওফিক চাই যা তোমার দরবারে কবুল হবে।'[১২৬]

সুবহানআল্লাহ! জীবনের ১৫ থেকে ২০ বছর চলে যায় ডিগ্রি অর্জন করে ভালো একটা চাকরির পেছনে ছুটতে ছুটতে! এত সাধনার সেই জ্ঞান যদি শেষ দিবসে আমাদের উপকারী না হয় এবং সেই জ্ঞানলব্ধ রিযিক যদি পবিত্র ও হালাল না হয়, তাহলে ভয়ংকর লোকসান! এবং এই দুই অর্জনের মধ্যবর্তী সময়ে যা যা আমল করছি সেটাও যদি লোক দেখানো, হিংসা-গীবত দিয়ে ধ্বংস করে ফেলি, আর আল্লাহর দরবারে দেউলিয়া-ফকির হয়ে উপস্থিত হই, তাহলে দুনিয়া-আখিরাত দুইটাই বরবাদ! সেজন্যই এই দুআটা আমার কাছে সেরা, অনন্য। এক দুয়াতেই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিচ্ছি ভালো জ্ঞান, আমল এবং হালাল রিজিক।

আল্লাহ আমাদের নামাজ, দুআ এবং ইবাদতগুলোর মাধ্যমে আমাদের জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দিন, আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত কবুল করে নিন। আমিন।

সায়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দুআ) – বেহেশত লাভের দুআ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সত্তরের অধিকবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।"[১২৭]

---

[১২৬] ইবনু মাজাহ ৯২৫, নাসাঈ, সুনানে কুবরা ৯৯৩০

[১২৭] বুখারী, ফাতহুল বারীসহ, ১১/১০১, নং ৬৩০৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

> "হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক ১শ' বার তাওবা করি।"[১২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "যে ব্যক্তি নিচের দুআটি বলবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়।"[১২৯]

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হাল 'আযীমল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কায়্যূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি

অর্থ: 'আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক। আর আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "রব একজন বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় রাতের শেষ প্রান্তে। সুতরাং, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হও, তবে তা-ই হও।"[১৩০]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

---

[১২৮] মুসলিম, ৪/২০৭৬, নং ২৭০২

[১২৯] আবু দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭; তিরমিজি ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৭; আল-হাকিম এবং সহীহ বলেছেন, তার সাথে ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন, ১/৫১১, আর শাইখুল আলবানীও সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহুত তিরমিজি ৩/১৮২, জামেউল উসূল লি আহাদীসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪/৩৮৯-৩৯০, আরনাঊত এর সম্পাদনাসহ।

[১৩০] তিরমিজি নং ৩৫৭৯, নাসায়ী, ১/২৭৯ নং ৫৭২; হাকেম ১/৩০৯। আরো দেখুন, সহীহুত তিরমিজি, ৩/১৮৩; জামে'উল উসূল, আরনাঊতের তাহকীকসহ ৪/১৪৪

> "একজন বান্দা তার রবের সবচেয়ে কাছে তখনই থাকে, যখন সে সিজদায় যায়। সুতরাং, তোমরা তখন বেশি বেশি করে দুআ করো।"[১৩১]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

> "নিশ্চয়ই আমার অন্তরেও ঢাকনা এসে পড়ে, আর আমি দৈনিক আল্লাহর কাছে ১শ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[১৩২]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

> "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে ভালো দুআ হলো সায়্যিদুল ইস্তিগফার। যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা এটি (সায়্যিদুল ইস্তিগফার) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পড়বে, সে ঐ দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।"[১৩৩]

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুকা।

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা।'

وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

উচ্চারণ: ওয়া আনা 'আলা 'আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু।

---

[১৩১] মুসলিম, ১/৩৫০; নং ৪৮২

[১৩২] মুসলিম, ৪/২০৭৫, নং ২৭০২ ইবনুল আসীর বলেন, «لُيغان على قلبي» এর অর্থ হচ্ছে, ঢাকা পড়ে যায়, পর্দাবৃত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া; কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা যিকির, নৈকট্য ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকতেন। তাই যখন কোনো সময় এ ব্যাপারে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটত অথবা ভুলে যেতেন, তখনি তিনি এটাকে নিজের জন্য গুনাহ মনে করতেন, সাথে সাথে তিনি ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনার দিকে দ্রুত ধাবিত হতেন। দেখুন, জামে'উল উসূল ৪/৩৮৬।

[১৩৩] বুখারী, ৭/১৫০, নং ৬৩০৬।

অর্থ: 'আর আমি আমার সাধ্যমতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।'

أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ

উচ্চারণ: আবূউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী।

অর্থ: 'আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ।'

فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: ফাগফির লী, ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: 'অতএব, আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না।'

তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল-তাহমীদ পাঠের ফযিলত

কিছু দরিদ্র সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তো সব সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন সালাত আদায় করি, তারাও করে। আমরা যেমন সিয়াম পালন করি, তারাও করে। কিন্তু তারা তাদের উদ্বৃত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।"

নবীজি উত্তরে বললেন, "কিন্তু আল্লাহ কী তোমাদেরকে তা দান করেননি যা তোমরা সাদাকাহ করতে পারো?"

- প্রতিটি তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ'—'আল্লাহ পবিত্র' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;
- প্রতিটি তাকবীর ('আল্লাহু আকবার'—'আল্লাহ মহান' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;
- প্রতিটি তাহলীল ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' —'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;

- প্রতিটি তাহমীদ ('আলহামদুলিল্লাহ'—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ;[১৩৪]

কাজেই, যারা সম্পদে আমাদের থেকে এগিয়ে, ইচ্ছে করলেই বেশি বেশি তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল-তাহমীদ পাঠ করে আমরা তাদের সমকক্ষ হতে পারব সওয়াবের দিক থেকে, ইনশাআল্লাহ।

দুআ কুনুতের অর্থ

সবাই মিলে একটা ছোট্ট জিনিসের চর্চা করি চলুন। নিচে তিনটা দুআ উল্লেখ করছি। আমরা দুআগুলো পড়ার সময় প্রতিটা শব্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করব। আমরা খেয়াল রাখব যে, আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলবার সময় আমাদের অন্তরগুলো কি নরম হচ্ছে? চোখ দুটো কি আর্দ্র হচ্ছে? চলুন শুরু করি, বিসমিল্লাহ...

দুআ ১:

হে আল্লাহ, আপনি যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও হিদায়াত দিন, আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপত্তা দিন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ করুন, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন। আপনি যা ফয়সালা করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ, আপনিই চূড়ান্ত ফয়সালা দেন, আপনার বিপরীতে ফয়সালা দেয়া হয় না। আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন সে অবশ্যই অপমানিত হয় না (এবং আপনি যার সাথে শত্রুতা করেছেন সে সম্মানিত হয় না), আপনি বরকতপূর্ণ হে আমাদের রব্ব; আর আপনি সুউচ্চ-সুমহান।

দুআ ২:

হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই, আর আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আর

---

[১৩৪] সহীহ মুসলিম

আমি আপনার নিকটে আপনার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গুনতে সক্ষম নই; আপনি সেরূপই, যেরূপ প্রশংসা আপনি নিজের জন্য করেছেন।

দুআ ৩:

হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি; আপনার জন্যই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি; আমরা আপনার দিকেই দৌড়াই এবং দ্রুত অগ্রসর হই; আমরা আপনার করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে আক্রান্ত করবে। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই, আপনার কাছে ক্ষমা চাই, আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার সাথে কুফরি করি না, আপনার উপর ঈমান আনি, আপনার প্রতি অনুগত হই, আর যে আপনার সাথে কুফরি করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

*****

কেমন অদ্ভুত প্রশান্তি লাগে না দুআগুলো পড়ে? অথচ অর্থ না জানলে অজানা ভাষায় দুআ পাঠ করলে সেটা নিছক শব্দমাত্র হয়ে ঠোঁটের উপর রয়ে যায়। অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

এই তিনটি দুআ বিতর নামাজের 'দুআ কুনুত' প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত হয়েছে 'হিসনুল মুসলিম' বইটিতে। দুআগুলোর সূত্র সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের দুআ এবং ইবাদতগুলোকে অন্তর থেকে নিঃসারিত হয়ে আবার অন্তরেই ফিরে আসার তাওফিক দিন। আমিন।

দুআ কবুল না হবার কারণসমূহ

আল্লাহর কাছে চাওয়ার কিছু আদব আছে। আমরা হাত তুলি আর হুটহাট করে চেয়ে বসি। আল্লাহর কাছে দুআ করা অনলাইনে কিছু কেনার মতো না যে, আপনি চাইলেন আর দুতিন দিনের মধ্যে আল্লাহ তা দিয়ে দিবেন।

'আমি এখন আর নামাজ পড়ি না', কারণ অনেক দুআ করেছি কিন্তু কোনো দুআই কবুল হয়নি।

আমি অনেক দুআ করেছি কিন্তু পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি; আর তাই নামাজ পড়ি না।

'আপনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন', কারণ 'আপনি ঠিকঠাক লেখাপড়া করেননি।' 'আপনি ফেল এজন্য করেননি' যে, আপনি দুআ করেছেন আর আল্লাহ আপনার অর্ডার ঠিকমতো ডেলিভারি করেননি। আল্লাহর উপর এভাবে দাবী আরোপ করার আমরা কে?

আল্লাহর প্রতি আমাদের মনোভাব হয়ে গেছে অনেকটা কাস্টমারের মতো। আমরা আল্লাহকে এমন কারো মতো মনে করি, যে আমাদের কাছে ঋণী।

আমাদের দুআও হয়ে গেছে অহংকারপূর্ণ। আপনারা খেয়াল করেছেন বিষয়টা? আল্লাহর কাছে আমাদের চাওয়ার ধরনও হয়ে গেছে অহংকারপূর্ণ। অথচ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন কীভাবে চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা নিজের প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।'[১৩৫]

---

[১৩৫] সূরা আরাফ ৭ : ৫৫

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' মানে 'আমার বান্দারা, তোমরা আমার কাছে চাও, দুআ করো, আমি কবুল করব।'[১৩৬] আল্লাহ তাআলা এখানে বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস দিচ্ছেন, সাথে অনুপ্রাণিত করছেন, আমরা যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। জীবনের প্রয়োজন যেন আল্লাহর কাছেই পেশ করি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে বলেন,

> "আল্লাহ তোমার দুআর জবাব দেবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আল্লাহকে ডাকো। জেনে রাখো, গাফেল (অমনোযোগী ও অসাড়) অন্তরের দুআর জবাব দেয়া হয় না।"[১৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একদিন বলেছেন,

> 'ভাইটি আমার, কোনো কিছু চাইতে হলে কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইবে।'[১৩৮]

আর তাই, আমাদেরকে জানতে হবে আল্লাহর কাছে কীভাবে চাইব। অন্যভাবে বলতে পারি, কোন কোন বিষয়গুলো দুআ কবুলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

এক) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।"[১৩৯]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

---

[১৩৬] সূরা মুমিনুন ২৩ : ৬০

[১৩৭] সুনানে তিরমিজি : ৭৪৭৯

[১৩৮] সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬

[১৩৯] সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬ , আলবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন

> "আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[১৪০]

দুআ কবুল হবার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোনো দুআ কবুল হবে না, কোনো আমল গৃহীত হবে না।

অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মৃত ব্যক্তিদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে ডাকে। তাদের ধারণা, যেহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মর্যাদা নেই; তাই এসব নেককার লোকেরা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিয়ে দিবে এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করবে। এ বিশ্বাসের কারণে তারা এদের মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এ মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকে।

অথচ আল্লাহ বলেছেন,

> "আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী। দুআকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।"[১৪১]

দুই) দুআর ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়ো না করা: তাড়াহুড়ো করা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। হাদিসে এসেছে,

> "তোমাদের কারো দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়ো করে বলে যে, 'আমি দুআ করেছি; কিন্তু, আমার দুআ কবুল হয়নি।'"[১৪২]

সহীহ মুসলিমে[১৪৩] আরো এসেছে,

> "বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোনো

---

[১৪০] সূরা জিন ৭২ : ১৮

[১৪১] সূরা বাকারা ২ : ১৮৬

[১৪২] সহীহ বুখারী : ৬৩৪০ ও সহীহ মুসলিম : ২৭৩৫

[১৪৩] সহীহ মুসলিম : ২৭৩৬

> পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দুআ করে। বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাড়াহুড়ো বলতে কী বোঝাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'যখন কেউ বলে যে, আমি দুআ করেছি, কিন্তু আমার দুআ কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দুআ করা ছেড়ে দেয়।'"

তিন) হারাম থেকে বেঁচে থাকা: আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন।"[১৪৪]

এ কারণে যে ব্যক্তির পানাহার ও পরিধেয় হারাম সে ব্যক্তির দুআ কবুল হওয়াকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপরাহত বিবেচনা করেছেন। হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করেছেন, মাথার চুল উশকোখুশকো হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন, 'ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব!' কিন্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম; তাহলে এমন ব্যক্তির দুআ কীভাবে কবুল হবে?[১৪৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'হারাম ভক্ষণ করা দুআর শক্তিকে নষ্ট করে দেয় ও দুর্বল করে দেয়।'

চার) আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা: আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা নিয়ে দুআ করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন।"[১৪৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে এসেছে,

---

[১৪৪] সূরা মায়িদা ৫ : ২৭]

[১৪৫] সহীহ মুসলিম : ১০১৫

[১৪৬] সহীহ বুখারী : ৭৪০৫ ও সহীহ মুসলিম : ৪৬৭৫

> "তোমরা দুআ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করো।"[১৪৭]

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করে আল্লাহ তার উপর প্রভূত কল্যাণ ঢেলে দেন, তাকে উত্তম অনুগ্রহে ভূষিত করেন, উত্তম অনুকম্পা ও দান তার উপর ছড়িয়ে দেন।

পাঁচ) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা: 'কোনো মুসলিম দুআ করার সময় কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দুআ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে এ তিনটির কোনো একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন, (৩) অথবা তার কোনো অকল্যাণ বা বিপদাপদ তার থেকে দূর করে দেন। সাহাবীরা বলেন, 'তাহলে তো আমরা অনেক বেশি দুআ করব।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন।'[১৪৮]

ছয়) দুআয় পূর্ণ মনোযোগ না থাকা: আল্লাহ অবচেতন মনের দুআ গ্রহণ করেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করো। জেনে রেখো, আল্লাহ অমনোযোগী ও অসাড় মনের দুআ কবুল করেন না।' [১৪৯]

দুআ কবুলের ব্যাপারে মনে কোনো দ্বিধা রাখা যাবে না। সংশয় রাখার কোনো কারণও নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা শয়তানের দুআও কবুল করেছেন। শয়তান দুআ করেছিল, তাকে যেন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়। (ইবলিস) বলল, 'আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।' (আল্লাহ) বললেন, 'তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৫০]

এমনকি অবিশ্বাসীরাও (মুশরিক) বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে এবং তিনি তাতে সাড়াও দেন।

---

[১৪৭] সুনানে তিরমিজি। আলাবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন।

[১৪৮] আত-তারগীব : ১৬৩৩

[১৪৯] তিরমিজি : ৩৪৭৯

[১৫০] সূরা আরাফ ৭ : ১৪-১৫

> "আর যখন তারা কোনো জলযানে আরোহণ করে, তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন নিরাপদে তাদের স্থলে পৌঁছে দেন, তারা তাঁর সঙ্গে শরিক করতে থাকে।"[১৫১]

আল্লাহ জানেন যে, তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেয়ার পর তারা আবারও শিরক করবে। তারপরও তাদের দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন। কারণ, তারা ক্ষণিকের জন্য হলেও আল্লাহকে ডেকেছে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সঙ্গে। এই উপায়ে দুআ করলে যদি মুশরিকের দুআও কবুল করা হয়, তাহলে তাওহীদের অনুসারীদের দুআ ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই দরকার ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।

সুতরাং, মুমিন-মুসলমানের জন্য বাঞ্ছনীয়, রাতারাতি দুআ কবুল না হলেও ক্রমাগত দুআ করতে থাকা। হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং দুআর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। এমনটি বলা যাবে না যে, আমি এত দুআ করলাম, অথচ আল্লাহ কবুল করলেন না। এভাবে বান্দা মূলত নিজের দুআকে নিজেই ধ্বংস করে ফেলে।

সালাফদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ ২০ বছর ধরে একটি জিনিস চেয়ে পাননি, তারপরও তারা আশা ছেড়ে দেননি। অবিরত দুআ করে গেছেন এই আশায় যে, একদিন আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করবেন।

সাত) ফরজ আমল বাদ দিয়ে দুআতে মশগুল না হওয়া: যেমন, ফরজ নামাজের ওয়াক্তে ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে দুআ করা কিংবা দুআ করতে গিয়ে মাতাপিতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা। খুব সম্ভব বিশিষ্ট ইবাদতগুজার জুরাইজ রহিমাহুল্লাহর কাহিনী থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ জুরাইজ রহ. তার মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। ফলে মা তাকে বদদুআ করেন; এতে করে জুরাইজ রহ. আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইমাম নববী রহ. বলেন, আলিমগণ বলেছেন, এতে প্রমাণ রয়েছে যে, জুরাইজের জন্য সঠিক ছিল মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া। কেননা তিনি নফল নামাজ আদায় করছিলেন। নফল নামাজ চালিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে—নফল কাজ; ফরজ নয়। আর মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব এবং মায়ের অবাধ্য হওয়া হারাম।[১৫২]

---

[১৫১] সূরা আনকাবুত ২৯ : ৬৫

[১৫২] সহীহ মুসলিম : ১৬/৮২

উল্লেখ্য, কবুল হওয়ার জন্য দুআর শুরু ও শেষে এবং মাঝখানে দরুদ পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আবু সুলায়মান আদ-দারানি রহ. সুন্দর একটি কথা বলেছেন—

> "নবীজির প্রতি দরুদ এমনিতেই কবুল হয়। আর আল্লাহ কোনো দুআর শুরু এবং শেষ অংশ কবুল করবেন, আর মাঝখানের অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন, এমনটি হতে পারে না।"

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুআ কবুলে প্রতিবন্ধক অভ্যাসগুলো ত্যাগ করে যথাযথ নিয়মে একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে দুআ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফিরিশতারা যাদের জন্য দুআ করেন

ফিরিশতারা হলেন আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের দুআ পাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা নিষ্পাপ ও পূত-পবিত্র। সর্বদা তারা মহান আল্লাহর তাসবীহ ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হন না। সুতরাং তাদের দুআ কবুলের সম্ভাবনা খুব বেশি।

মানুষের জন্য ফিরিশতাদের দুআ করার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন, এটা জানা কথা যে, 'ফিরিশতাদের দুআ কবুল হয়।'[১৫৩]

এক. ওযু করে ঘুমানো

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযু করে রাত্রিযাপন করে, তার শিয়রে একজন ফিরিশতা রাত্রিযাপন করেন। সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় (কোনো কোনো বর্ণনা মতে, যতবার ঘুমের ভেতর নড়াচড়া করে) তখন ওই ফিরিশতা বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! অমুককে মাফ করে দিন। কেননা তিনি পবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছেন।'[১৫৪]

দুই. মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করা

বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা রহমতের দুআ করেন।'[১৫৫]

---

[১৫৩] শারহু সহীহুল বুখারী ৩/৪৩৯

[১৫৪] সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ১০৫১

[১৫৫] ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৯৮৭

তিন. কাতারের ডান দিকে নামাজ পড়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা রহমতের দুআ করেন, যারা কাতারের ডান পাশে সালাত আদায় করে।'[১৫৬]

চার. কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা পূরণ করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতারা রহমতের দুআ করেন, যারা কাতারের সঙ্গে মিলিত হয়ে সালাত আদায় করে। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে, আল্লাহ এর কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।'[১৫৭]

পাঁচ. নবীজির উপর দরুদ পড়া

আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবিয়া তার পিতা (আমের) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পেশ করবে ফিরিশতারা তার জন্য দুআ করবে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাকবে যতক্ষণ সে দরুদ পেশ করতে থাকে। সুতরাং কম হোক বেশি হোক—যার ইচ্ছা সে দরুদ পড়তে পারে।'[১৫৮]

ছয়. মুসলিম ভাইয়ের জন্য দুআ করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে তখন নিযুক্ত ফিরিশতা বলে, আমিন। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ (তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে আল্লাহ তোমাকেও তা দান করুন)।'[১৫৯]

---

[১৫৬] আবু দাউদ, হাদিস : ৫৭৮

[১৫৭] ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৯৮৫

[১৫৮] সহিহুল জামে, হাদিস : ৫৭৪৪

[১৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদিস : ৮৮

নামাজকে মধুর করার কিছু কলাকৌশল

নামাজের বাইরে আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণ না করলে, নামাজের ভেতরেও সেটা আসবে না—এই সহজ সূত্রটা আমরা অনেক সময় বুঝি না। এবার আমরা পর্যায়ক্রমে এমন কিছু অনুশীলনের কথা জানব যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের নামাজকে আরো মধুর করবে ইনশাআল্লাহ।

নামাজের আগে

- নামাজ শুরু হবার দশ-পনেরো মিনিট আগে থেকেই নিজ নিজ কাজ থেকে উঠে নামাজের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করা। কারণ, দেখা যায়, তুমুল চিন্তার ঝড় নিয়ে দুনিয়াবী একটা কাজ করছি। আযান শুনে কোনোমতে সেই কাজ থেকে উঠে ফট করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। অথচ তখনও মাথায় ঐ দুনিয়াবী কাজের কথাই ঘুরছে! নামাজ শুরুর ১০ মিনিট আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে লগ-আউট করুন, লিখার কলমটা নামিয়ে ফেলুন, বই বন্ধ করে ফেলুন, মজলিস থেকে উঠে পড়ুন। চলে যান ওযু করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে। নামাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করবার জন্য নামাজের বাইরের অন্য সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরী।

- নামাজের জন্য প্রস্তুত হবার সময় আমাদের উচিত সুন্দর একটা কাপড় পরা। আমরা বাসার মসলা-ময়লা মাখানো ত্যানা গোছের পুরানো কাপড়টা পরেই নামাজে দাঁড়িয়ে যাই। নামাজে মনোযোগ না থাকার এটাও একটা কারণ। যেকোনো অফিসের মিটিং এ আমরা কত সুন্দর পরিপাটি হয়ে যাই। অথচ এটা হচ্ছে আমাদের আল্লাহর সাথে মিটিং; দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং!

পরিপাটি হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেয়াটাও অন্তরের উপর একটা রূহানী প্রভাব ফেলে।

- আমার শিক্ষিকা কিছু সুন্দর সুন্দর নতুন লম্বা জামা এবং বোরকা আলাদা করে রাখতেন শুধু নামাজের সময় পরার জন্য। এই জামাগুলো ছিল সবচেয়ে ভালো মানের, দামি এবং দেখতেও বেশ! এগুলো তিনি অন্য কোথাও পরতেন না। কেবল আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় পরতেন। এতে মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুত হতেন যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারো সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! এতেও নামাজের মনোযোগ বেড়ে যেত।

- ওযু করা এবং নতুন ও সুন্দর নামাজের কাপড় পরিধান পর্ব শেষ। এবার জায়নামাজে বসে একটু যিকির করা যায়। নামাজ শুরুর আগেই দুই তিন মিনিটে এই যিকিরটুকু আমরা সহজেই করতে পারি। সহজভাবেই বলুন, 'আল্লাহ, আমি আপনার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি! আমাকে নামাজের মিষ্টতা অনুভব করার তাওফিক দিন।'

- যেই সূরাগুলি নামাজে পড়া হবে এই সময়ে সেগুলো ঠিক করে নেয়া যায়। সময় থাকলে সেই ছোট সূরাগুলোর অর্থ পড়ে নেয়া যায়। আজকের যুগে মুঠোফোনে কুরআনের অনেক ভালো ভালো অ্যাপ পাওয়া যায়। কেউ চাইলে ফোন থেকেও চট করে সূরাগুলোর অর্থ দেখে নিতে পারেন। ফোনে অর্থ পড়তে গিয়ে অন্য অ্যাপে গিয়ে অমনোযোগী হবার সম্ভাবনা থাকলে বাসার কুরআনের হার্ডকপি থেকে সূরাগুলোর অর্থ দেখে নেয়া যায়। তাহলে সূরা পাঠের সময় নামাজে মনোযোগ থাকবে এবং কোন সূরার পর কোনটা পড়ব এটা নিয়ে নামাজের মাঝে চিন্তা করতে হবে না।

- সাধারণত যে সব সূরা, তাসবীহ, দুআ ইত্যাদি নামাজের মধ্যে পড়ে থাকি, সেগুলোর অর্থ অবশ্যই সময় করে মুখস্থ করে নিবেন। সেজন্য 'নামাজে মন ফেরানো' বইয়ের অধ্যায়গুলো আপনারা নিয়মিত রিভিউ করবেন। যতবার আপনার মনে হবে শয়তান নামাজ থেকে মনকে সরিয়ে দিচ্ছে, ততবার এই বইয়ের লেখাগুলোর কাছে ফিরে আসুন। আবার বলছি এটা এমন একটা বই যেটা একবার পড়েই আপনি বইয়ের তাকে ফেলে রাখতে পারবেন না। এই অধ্যায়গুলো বার বার পড়ুন, পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলুন। নিজে শিখুন

এবং আপনার প্রিয়জনদেরকেও শিখিয়ে দিন। তারাও যেন নামাজে মধুরতার স্বাদ পায়। আপনার সন্তানকে নামাজ শেখানোর সময় এই বইটা "টেক্সটবুক" হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা মুসলিম প্রধান দেশে থেকেও কয়জন মুসলিম নামাজে কী পড়ছি সেটার অর্থ শিখে বড় হয়েছি? তাই আপনি এটা অন্যকে শিখাবেন, ইনশাআল্লাহ। যখন আপনি কোনোকিছু অন্যকে শেখাবেন, সেটা আপনার মাথায় গেঁথে যাবে দৃঢ়ভাবে।

- জায়নামাজে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার আগে চিন্তা করা, 'এটাই যদি আমার জীবনের শেষ নামাজ হয়, তাহলে আমি নামাজটা কীভাবে পড়তাম?' দেখবেন নামাজের মান অন্যরকম স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে।

- মানুষের জীবন থেকে ব্যস্ততা কখনোই ফুরোবে না। কেউ যদি মনে করে একটু ফ্রি হয়ে নিই, তারপর ইবাদতে মন দিব, তাহলে সে কোনোদিনই ইবাদতের জন্য সময় বের করতে পারবে না। মনে রাখবেন, আমাদের অর্থাৎ আদম সন্তানের পেট কখনোই ভরবে না। একটার পর একটা চাহিদা লেগেই থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত (অর্থ কবরের মাটি ব্যতীত) অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না।"[১৬০] এই হাদিসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- কাজেই, ব্যস্ততাকে অজুহাত বানাবেন না। একে নিয়ন্ত্রণ করুন। যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগির জন্য সময় বের করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা তার পুরো সময়কে এমন ব্যস্ততায় ভরে দিবেন যে, তার অভাব ও ব্যস্ততা কখনোই শেষ হবে না। আমরা যদি ইবাদতের জন্য ফ্রি সময় বের করতে না পারি, সেটা আমাদের জন্য ভয়াবহ এলার্মিং। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি নিজের অবসর সময় তৈরি করো এবং ইবাদতে মন দাও, তাহলে আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাতকে ব্যস্ততায় ভরে দিব এবং

---

[১৬০]বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৩

তোমার অভাব কখনোই দূর করব না।"[১৬১] মনে রাখবেন, আল্লাহর স্মরণই মানুষকে সব কাজে সুন্দর ও সঠিক পথ দেখায় এবং কল্পনাতীত জায়গা থেকে উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দেয়। আর তাতে সুন্দর ও উত্তম জীবন লাভ করে মুমিন।

নামাজের মধ্যে

- নামাজের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হাত-পা নাড়ানো উচিত নয়। যত কম অহেতুক নাড়াচাড়া করবেন, তত বেশি নামাজে মনোযোগ বাড়বে। মাঝে মাঝে বোনেদেরকে দেখি, নামাজের মধ্যে বারবার মাথার ঘোমটা বা হিজাব ঠিক করছেন। আমাদের বোনেদের উচিত হিজাবটা সুন্দর করে টাইট করে বেঁধে তবেই নামাজে দাঁড়ানো। যেন নামাজের মধ্যে বারবার হিজাব ঠিক করতে না হয়। এমন কাপড়ের হিজাব আমরা পরব না যেটা পিচ্ছিল বা সিল্ক জাতীয় এবং এর ফলে বারবার মাথা থেকে হিজাব পড়ে যেতে চাইবে এবং নামাজের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাবে।

- নামাজের মধ্যে চোখের দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে স্থির রাখা উচিত। আড়চোখে এদিকে-সেদিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা নামাজের খুশু বাড়িয়ে দিবে।

নামাজ শেষে

- নামাজ শেষ করে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে একটু যিকির করা। নামাজ শেষে পড়ার জন্য দুআ-যিকির নিয়ে আমরা দুআ এবং যিকির অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

- নামাজ শেষে নিজেকে জিজ্ঞেস করা, যেই নামাজটা মাত্র পড়লাম এটা কি আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতন? এই নামাজ কি কবরে আমার জন্য আলো হয়ে আসবে? না কি যারা নামাজের হক আদায় করতে পারেনি তাদের নামাজের মতন আমার নামাজকেও দুর্গন্ধময় কাপড়ে পেঁচিয়ে আমার মুখে ছুড়ে ফেলা হবে? আমি পরেরবার আমার নামাজকে আরো সুন্দর করতে কী করতে পারি?

---

[১৬১] ইবনে মাজাহ ৪১০৭, আহমাদ ৮৬৮১, সহীহ তারগীব ৩১৬৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয়?' তিনি বলেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারপর কোনটি?' উত্তরে তিনি বলেন, 'মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করা।' আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারপর কোনটি?' উত্তরে বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'[১৬২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তুমি বেশি করে আল্লাহর জন্য সিজদা-সালাত আদায় করতে থাকো। কারণ, তোমার প্রতিটি সিজদার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন।'[১৬৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্যই তা কঠিন কিন্তু বিনীত বান্দাদের জন্য নয়। যারা ধারণা করে যে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।'[১৬৪]
>
> 'মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভীতির সাথে দণ্ডায়মান হয়।'[১৬৫]
>
> অতঃপর বলুন, 'আর যারা তাদের সালাতে যত্নবান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ; যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে।'[১৬৬]

ইয়া রব্বুল আলামিন, আমাদেরকে এমনভাবে সালাত আদায়ের তাওফিক দিন যেটা আমাদের দ্বীন, দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণের উৎস হয় এবং আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের উসিলা হয়। আমিন।

---

[১৬২] বুখারী : ৪৯৬

[১৬৩] মুসলিম : ৭৩৫

[১৬৪] সূরা বাকারা : ৪৫-৪৬

[১৬৫] সূরা মুমিনুন ২৩ : ১-২

[১৬৬] সূরা মুমিনুন ২৩ : ৯-১১

নামাজ এবং বাস্তবতা

একবার ইসলামিক সমাবেশে একজন উস্তাদকে এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করল, 'আমি কীভাবে আমার নামাজের প্রতি আরো মনোযোগী হতে পারি?' উস্তাদের উত্তরটা ছিল ভিন্নধর্মী কিন্তু চমৎকার! তিনি বললেন, 'দিনের রুটিনগুলোকে গোছানোর শুরুতে সব সময় নামাজকে সবার আগে প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দিবেন।' কিন্তু আমরা করি উল্টো। আমরা অফিস, স্কুল, রান্নাবান্না ইত্যাদি সব কাজের সময়গুলো দিনের রুটিনের মধ্যে বসিয়ে সামান্য একটু সময় বাকি থাকলে সেটা নামাজের জন্য রেখে দিই।

অথচ আমাদের উচিত নামাজের সময়গুলোকে সবার আগে দিনের রুটিনে বসিয়ে, এরপর যে সময়টুকু বাকি রইল সেখানে দিনের অন্য সব কাজ, দায়-দায়িত্বের অংশগুলো সেট করা। Make your daily routine around the salah, do not make your salah go around your daily routine.

(অর্থাৎ নামাজকে ঘিরে আপনার প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করুন, আপনার রুটিনকে ঘিরে নামাজের সময় কোনোমতে বের করবেন না।)

খুব পাওয়ারফুল একটা কথা! আমরা যদি ছোটবেলা থেকে সবার আগে নামাজের জন্য পাঁচটা সময় নির্ধারণ করতাম অথবা দিনে নামাজের বাইরের সময়টাতে অন্যান্য কাজগুলো ভাগ করে দিতাম, তাহলে আমরা নামাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া শিখতাম। এবং কখনোই আমাদের কাছে নামাজকে কোনো অতিরিক্ত কাজ বলে মনে হতো না। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন!

সন্ধ্যার সময়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম আর মাগরিবের নামাজটা কাযা হয়ে গেল। 'বাসায় গিয়ে পড়ে নিব' এই ধোঁকায় নামাজের সময় শেষ! একটা বিয়ের দাওয়াতে গেলাম আর এশার নামাজটা কাযা করে আসলাম। যদি ভ্রমণের মধ্যে

থাকি তাহলে ক্লান্তি এবং ঘুমে জড়িয়ে সবার আগে নামাজের কথা ভুলে যাই। কোনো পাবলিক প্লেস, শপিং মল, পিকনিক অথবা মার্কেটে গেলে কেনাকাটার ফাঁকে নামাজের ওয়াক্ত কোন ফাঁকে শুরু হয়ে কোন ফাঁকে শেষ হয়ে যায় সেটা টেরই পাই না। নামাজটা আমাদের কাছে যেন ঐচ্ছিক কিছু, আস্তাগফিরুল্লাহ। যেহেতু আমাদের এই ভিত্তিটাই নড়বড়ে, সেহেতু আমাদের জীবনের সবগুলো অধ্যায়ই নড়বড়ে অবস্থায় রয়ে যায়। নামাজ কায়েম করতে হবে এটা সবাই জানি। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেন আমরা নামাজকে ধারণ করার সময়ে আমরা পিছিয়ে যাই। সেক্ষেত্রে দৃঢ়তা বজায় রাখতে কিছু বাস্তবিক চর্চার কথা বলছি, ইনশাআল্লাহ;

- **এক.** সব সময় নিজের সাথে একটা বহনযোগ্য ছোট জায়নামাজ নিয়ে রাখা। এখন দেশীয় বিভিন্ন অনলাইন শপগুলোতে ছোট কাপড়ের জায়নামাজ পাওয়া যায় যেগুলো ছোট রুমালের মতো ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়। দোকানে পাওয়া না গেলেও নিজের জন্য একটা ছোট জায়নামাজ বানিয়ে নেয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। অথবা জায়নামাজ না থাকলে ছোট একটা পরিষ্কার কাপড় বা ওড়না ব্যাগের মধ্যে রাখলেও চলবে। যেন যে যখন যে অবস্থাতেই থাকি না কেন নামাজের সময় হলে সেটা বিছিয়ে নামাজ পড়া যায়।

- **দুই.** যেকোনো সাপ্তাহিক/মাসিক রুটিন করার সময়, কোনো আয়োজন বা অনুষ্ঠান অথবা বাইরে বের হবার পরিকল্পনা করার সময়, নামাজের কথা সর্বপ্রথম মাথায় রাখা এবং সবার আগে নামাজটা কোথায়, কখন, কীভাবে পড়া হবে সেটা ঠিক করে নেয়া। ওযু করে নেয়া অথবা কোথায় ওযু করা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া। অনেকে বুদ্ধি করে সকাল সকাল বের হয়ে কাজ সেরে চলে আসেন যেন কোনো নামাজের ওয়াক্ত পথের মধ্যে না পড়ে যায়।

- **তিন.** একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, এখন বাংলাদেশের বেশ কিছু শপিংমল এবং মার্কেটে মহিলাদের এবং পুরুষদের জন্য আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সেজন্য যদি কোনো কাজে মার্কেটে যেতে হয় তাহলে এমন মার্কেট অথবা শপিংমল বাছাই করে নেয়া যেখানে আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

- **চার.** আমার এক পরিচিত ভাই আছে যিনি যখনই কোনো নতুন প্রজেক্ট অথবা চাকরিতে একটা নতুন কোনো গ্রুপের সাথে কাজ করা শুরু করেন, তিনি

সবার আগে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, আমি মন লাগিয়ে পুরোটা সময় কাজ করব। কিন্তু যখন নামাজের সময় আসবে তখন আমাকে আপনারা পাবেন না। নামাজ পড়া শেষ করে তবেই আমি আবার কাজে ফেরত আসব ইনশাআল্লাহ। সুবহানআল্লাহ! শুধু তার এই ইতিবাচক মানসিকতা ও দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ তাআলা তার রিযিক, জীবন এবং চাকরিতে যে পরিমাণ বরকত এবং রহমত দিয়েছেন তা আমার নিজের চোখে দেখা আলহামদুলিল্লাহ। তিনি এ ব্যাপারে সব সময় অটল এবং অনড় ছিলেন দেখে সব ক্ষেত্রে মানুষও তাকে সম্মান করতেন। যখন আপনি দুনিয়ার মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, তখন আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই সম্মান দিবেন।

- **পাঁচ.** আপনি নতুন চাকরীতে জয়েন করেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, এই পরিস্থিতিগুলোতে সবার আগে খুঁজে বের করুন নামাজের কোনো ঘর আছে কি না? একটু খোঁজ খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তাগাদা সহকারে। এই জায়গাটা খুঁজে রাখলে, ওয়াক্ত হলে সহজেই সেখানে গিয়ে নামাজ পড়া যাবে।

- **ছয়.** যদি একান্তই কোনো "নামাজ ঘর" এর মতন জায়গা পাওয়া না যায়, তাহলে যতটুকু সম্ভব একটি কর্নারে কোনো মানুষের কাজের মধ্যে অথবা যাওয়া-আসা পথের মধ্যে না পড়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবেন। তবুও নামাজ বাদ দেয়া যাবে না।

- **সাত.** আমাদের দেশে বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতার নামের যে পরিমাণ অবাধ্যতা এবং নির্লজ্জতার উৎসব চলে সেখানে সব কিছু করার কথা মনে থাকলেও নামাজের কথা ভুলে যাওয়া হয়। এমন কোথাও বিয়ের যাওয়ার আমন্ত্রণ থাকলে আগে থেকেই হলরুমে অথবা সেন্টারে কোনো নামাজের জায়গা আছে কি না সেটা কাউকে জিজ্ঞেস করে নিবেন। অথবা ওয়াক্তের মধ্যে পড়লে বাসা থেকে আগেই নামাজ পড়ে তারপর বের হবেন।

- যদি বিয়েটা নিজেরই হয়, সেক্ষেত্রেও নানান ব্যস্ততার এবং হুলস্থুলের মধ্যে আপনি যেন আপনার নামাজের ওয়াক্ত মোটেও ভুলে না যান সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

সোনামণিদের নামাজ

ছোট বাচ্চারা অনেকটা কাদামাটির মতো। আপনি যেভাবে তাদেরকে গড়ে তুলবেন, তারা ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

সেজন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের অন্তরে নামাজের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অনেক মা-বাবাই বাচ্চাদের পড়াশোনা এবং কর্মজীবনের সাফল্য নিয়ে ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড সচেতন থাকেন। কিন্তু তাদের নামাজ, কুরআন, দ্বীন শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে ঠিক ততটাই গাফেল রয়ে যান। দেখা যায় স্কুলের পড়াশোনার জন্য তাদের একের পর এক কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচার, টিউটর ইত্যাদির কাছে ভর্তি করিয়ে দেয়া হচ্ছে। সকাল ছয়টায় উঠিয়ে বাচ্চাদের কোচিংয়ের জন্য, স্কুলের জন্য রেডি করে দিচ্ছে। কিন্তু ঠিক একই সময়ে যদি ফজরের জন্য তাদেরকে উঠতে বলার কথা ওঠে, সেক্ষেত্রে মা-বাবারাই গড়িমসি করেন। উলটো মা-বাবারাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে, 'থাক আজকে, একটু ঘুমাক। এখন তাদের পরীক্ষা চলছে!'

সুবহানাল্লাহ! আপনি কখনো সহ্য করতে পারবেন যদি আপনার চোখের সামনে আপনার সন্তানকে আগুনে ছুড়ে ফেলা হয়? তাহলে কীভাবে তাদের নামাজের ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে আমরা এতটা গাফেল থাকতে পারি? যে রকমের গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়ে স্কুলের জন্য রেডি করা হয়, ঠিক একই রকমের গুরুত্ব দিয়ে যদি তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই ফজরের নামাজের জন্য রেডি করা হতো, তাহলে সেই ছোটবেলা থেকেই বাচ্চারা বুঝত যে, দুনিয়ার থেকে দ্বীন বড়!

কিছু প্রাক্টিক্যাল টিপস

- বাচ্চারা তাদের চোখ দিয়ে শোনে অর্থাৎ, তারা চোখে মা-বাবাকে যেটা করতে

দেখবে সেটাই তারা কান দিয়ে অর্ডার হিসেবে শুনবে এবং অনুকরণ করবে। সেজন্য বাচ্চাকে যদি নামাজের প্রতি মনোযোগী করতে চাই সবার আগে মা-বাবাকে নামাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে উদাহরণ হিসেবে বাচ্চাকে দেখাতে হবে।

- মা-বাবা যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন ছোট বাচ্চাটাকে একপাশে নিয়ে দাঁড়াবে। যদি বাচ্চা দাঁড়াতে না চায় অন্তত বাচ্চাকে আশেপাশে রাখবে যেন বাচ্চা সবসময় মা-বাবাকে নামাজ পড়তে দেখতে দেখতে বড় হয়।

- রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে রূপকথার আকাশ-পাতাল গল্প না শুনিয়ে বাচ্চাদেরকে সাহাবী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈমানদীপ্ত দ্বীনের খেদমত, সাহসিকতা এবং নামাজের গল্প শোনাবেন। যেটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে, সেই অনুযায়ী বাচ্চাদের সাথে নামাজের বিভিন্ন তাসবীহ, সূরা ইত্যাদি মুখস্থ করাতে করাতে রাত্রিবেলা ঘুমাতে যাবেন।

- একটা সত্য ঘটনা বলি। এক পরিচিত ভাইয়ের ৬ বছরের বাচ্চা একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল। সকাল আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে কিছুতেই তার কান্না থামানো যাচ্ছে না। কেন কাঁদছে জিজ্ঞেস করতে সে বলল যে, তার ফজরের নামাজ কাযা হয়ে গিয়েছে। এইজন্য সে পাগলের মতো কাঁদছে। তার ভয়াবহ রকমের কান্না দেখে মা এবং দাদি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। দাদি বউমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি আমার বাচ্চাকে কী সব শুনিয়ে ভয় দেখিয়েছ? এরকম অসুস্থ বাচ্চার মতো কাঁদছে কেন?' মা নিজেও কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বুসোনা, তুমি কি আসলেই নামাজের জন্য এভাবে কাঁদছ? না কি অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে? আমাকে বলো।' তখন বাচ্চাটা তার মাকে বলল যে, 'আমি অবশ্যই নামাজের জন্য এভাবে কাঁদছি। কারণ, আমি যখন আমার বাবাকে একদিন ফজরের নামাজ কাযা হয়ে যেতে দেখেছিলাম, তখন বাবাও এভাবেই কেঁদেছিলেন।' সুবহানআল্লাহ! এই বাচ্চাটা তার নিজের চোখ দিয়ে যা দেখেছে সেটা তার সারা জীবন রিমাইন্ডার হিসেবে মনে থাকবে। তার বাবার এই আন্তরিক অশ্রু ঝরানোর দৃশ্য তার অন্তরে যেভাবে নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে দাগ কেটে দিয়েছে, সেভাবে অন্য কোনো শাসন হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না!

নামাজের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আল্লাহ আমাকে এমন একজন বান্ধবীর সঙ্গ দিলেন; যে ছিল আমার "নামাজ পড়ার সঙ্গী"। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা একজন আরেকজনকে ডেকে ডেকে নামাজ পড়তাম। যদি নামাজ পড়ার পর্যাপ্ত সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে পাওয়া না যেত, তাহলে হাঁটার পথের একটা ছোট কর্নারেই নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম। এভাবে নামাজ পড়তে হলে, একজন আরেকজনের নামাজ পড়ার সময় পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতাম, যেন আরেকজন স্বাচ্ছন্দ্য মতন নামাজ পড়তে পারে।

*****

আমি দেশের বাইরে পড়াশোনা করেছি। যে শহরে পড়াশোনা করেছি, সেখানে তুলনামূলকভাবে মুসলিমদের সংখ্যা কম। এমন পরিবেশে সবসময়ই নামাজের জন্য চিন্তিত ছিলাম! অনেক দুআ করেছি আল্লাহর কাছে তিনি যেন আমার নামাজ পড়াটা সহজ করে দেন, সুন্দর করে আল্লাহর ইবাদত করার তাওফিক বাড়িয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে কখনো নিরাশ করেননি। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সুপারভাইজার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা দিয়েছেন যাদের বেশিরভাগই নামাজের ব্যাপারে আমাকে প্রচুর সাপোর্ট দিয়েছেন। আমি কাজের/ক্লাসের ফাঁকে নামাজের জন্য যাবার অনুমতি চাইলে তারা বলতেন, 'অবশ্যই তুমি নামাজ পড়বে, এবং আমার জন্য দুআ করতে ভুলবে না।' তাদের হিদায়াতের জন্য অনেক দুআ করি! অথচ মুসলিম প্রধান দেশের বাঙালী ছেলেমেয়েরা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে প্রচুর নামাজ কাযা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের শিক্ষক-ছাত্রদের প্রথম চিন্তা আর যাই হোক—নামাজকেন্দ্রিক নয়। বিকেলে ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট করতে

করতে যদি আসর গড়িয়ে মাগরিব হয়ে যায়, কার মাথা ব্যাথা?

একবার আমার একা একা লাইব্রেরির কোনায় নামাজ পড়তে ভয় লাগছিল। আমার সুপারভাইজার ভদ্রমহিলা আমাকে এসে বললেন, 'তুমি আজকে নামাজ পড়তে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ো। আমি তোমার পাশে বসে থাকতে চাই!' এই পঞ্চাশোর্ধ ভদ্র মহিলা তার কাজ বাদ দিয়ে পুরোটা সময় আমার পাশে বসেছিলেন যখন আমি নামাজ পড়ছিলাম। তিনি বসে ছিলেন যেন আমি নির্বঘ্নে নামাজ পড়তে পারি। কেউ মাঝখানে এসে ডিস্টার্ব করতে না পারে! সুবহানআল্লাহ!

নন-মুসলিম সহপাঠীদের সাথে গ্রুপ করছি পরীক্ষার আগের দিন। আমার সালাতের ওয়াক্ত হবার কিছুক্ষণ আগে থেকেই তারা জিজ্ঞেস করছে, 'তোমাকে না একটু পরে প্রার্থনা করতে হবে? আসো আমরা তোমাকে নামাজ পড়ার একটা জায়গা খুঁজে দেই!'

*****

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় আলাদা কোনো নামাজের ঘর ছিল না। দেখা যেত প্রায়ই আমরা ২-৩ জন মুসলিম বান্ধবীরা মিলে যেখানেই একটু পরিষ্কার, শান্ত জায়গা পাচ্ছি, সেখানেই নামাজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। প্লাস্টিকের বোতলে পানি ভরে ওযু করতে চলে যাচ্ছি। পাবলিক ওয়াশরুমে ওযু করার জন্য পা বেসিনে তুলে দিচ্ছি! আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সব সহজ করে দিয়েছেন। কখনো নামাজ পড়াকে বাড়তি কোনো কাজ বলে মনে হয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ পর্যন্ত এরকম কখনো হয়নি যে, আমি কারো কাছে নামাজ পড়ার জন্য একটু জায়গা বা সময় চেয়েছি এবং সে সেটার ব্যবস্থা করে দেয়নি! সুবহানাল্লাহ! দেশে-বিদেশে, রেস্টুরেন্টে, পার্কিং লটে, হাসপাতালে, এয়ারপোর্টে, পার্কে, গ্যাস স্টেশনে, লাইব্রেরিতে, প্রফেসরের অফিসে—যেখানে যাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করে বলেছি, "আমার দশমিনিট লাগবে প্রার্থনা করতে, একটু দেখবেন কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না?" দেখা গিয়েছে উত্তরে হয় সে ব্যক্তি নিজে নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, না হলে আগেই ব্যবস্থা করা ছিল এবং তিনি আমাকে নামাজ-ঘরের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে না পারলে অন্যকে ডেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! একটা সময় ছিল যখন

এভাবে নামাজ পড়তে ভয় পেতাম। আমাকে নামাজ পড়তে উঠে যেতে হবে, এটা কাউকে বলতে অস্বস্তিকর লাগত! আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভয় কাটিয়ে দিয়েছেন। আসলেই নামাজের জন্য কোনো অজুহাত যে নেই! শুধু আল্লাহর সামনে শান্তিতে সিজদাহ দিতে পারাটাই একটা বিশাল নিয়ামত!

*****

একবার লাইব্রেরিতে কোনো ফাঁকা স্টাডি রুম পাচ্ছিলাম না যেখানে নামাজ পড়তে পারি। এদিকে পরের ক্লাস শুরু হতে বেশিক্ষণ বাকি নেই! নিরুপায় হয়ে হল-ওয়ের এক কোনায় আসর নামাজ কোনোমতে পড়লাম। নামাজ শেষ করে ক্লাসে দৌড় দিব, এমন সময় লাইব্রেরিয়ান একজন ভদ্রমহিলা এসে বললেন, 'তুমি চাইলে আমাদের অফিসে এসে প্রার্থনা করে যেতে পারো, ঐদিকের রুমটা সাধারণত খালি থাকে!' সে চলে যেতে যেতে আবার বললেন, 'এভাবে তোমাকে প্রার্থনা করতে দেখে আমার বেশ ভালো লাগল!'

আরেকদিন নামাজ পড়ছি তিন তলায় লিফটের পাশে একটু খালি জায়গা—সেখানে। এমন সময় একজন স্টুডেন্ট একটা ছোট চিরকুট রেখে গেল। নামাজ পড়া শেষ করে দেখি সেখানে লেখা ছিল—"In a world full with hate and bigotry, when I saw you praying, I felt some sort of peace!" (ঘৃণা এবং মূর্খতায় ভরা এই পৃথিবীতে, যখন আমি আপনাকে নামাজ পড়তে দেখি, এক ধরনের শান্তি অনুভব করি।) উল্লেখ্য, তারা সবাই অমুসলিম–খ্রিষ্টান না হলে নাস্তিক! আমি দুআ করি আল্লাহ যেন তাদের প্রত্যেককে হিদায়াত দেন এবং উসিলা হিসেবে আমার নামাজ পড়ার দৃশ্যকে কবুল করে নেন। আমিন।

*****

আবার অনেক সময় অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় নামাজ পড়তে গিয়ে! আল্লাহর রহমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন মহোদয়ের কাছে আমরা মুসলিম ছাত্ররা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে নামাজ পড়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট "নামাজ ঘর" পাই আলহামদুলিল্লাহ!

এই ঘটনাগুলো থেকে আমার কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার, নামাজকে সবার উপরে রাখলে এটা আদায় করার জায়গা এবং সময় খুঁজে পাওয়া কোনো ব্যাপার না! যে আল্লাহর কাছে আসতে চাইবে আল্লাহ তার রাস্তা অবশ্যই সহজ করে

দিবেন। আমরা অনেকেই নামাজ পড়তে চাই, কিন্তু ক্লাস বা কাজের মধ্যে থাকি—কীভাবে পড়ব ভেবে আর নামাজ পড়া হয় না। আমার উস্তাদা বলতেন, তিনি শিক্ষা জীবনে ক্লাসের জন্য রেজিস্টার করার আগে ভাবতেন, কোন ক্লাসটা নিলে আমার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পথে ঝামেলা কম হবে।

তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন, যেন তিনি সব সময় সালাত ধরে রাখতে পারেন। মুয়াজ্জিন দিনের মধ্যে ১০ বার করে ডাকেন, 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ; 'নামাজের দিকে আসো, সাফল্যের দিকে আসো।' আল্লাহ তাআলা এখানে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মানবজাতির সাফল্য নিহিত সালাতের মধ্যে। সালাতেই আছে ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি। এই নামাজ বাদ দিয়ে দুনিয়াবী/আখিরাতের সাফল্য অর্জন কীভাবে সম্ভব?

*****

কিয়ামতের দিন সবার আগে জিজ্ঞেস করা হবে নামাজ সম্পর্কে। ৬ ফিট কবরের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বান্দার জন্য আলো হবে তার ইবাদত—নামাজ। যে ব্যক্তি দিনে পাঁচবার নামাজের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারে, সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে।

ধ্যানের সেশনগুলোতে যে শারীরিক সুস্থতার জন্য অঙ্গভঙ্গিগুলো বেশি সুপারিশ করা করা হয়, এগুলো অলরেডি একজন মুসলিম দিনে পাঁচবার সালাতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ করে থাকে। নামাজ ঠিক তো সব ঠিক। ইয়া রব্বুল আলামিন, আমাকে, আমার পরিবারকে, আমাদের সবাইকে এমনভাবে সালাত আদায় করার তাওফিক দিন, যেন এই সালাত আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ এবং সাফল্যের উৎস হয়। আমিন।

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাকো। আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব, আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো।'[১৬৭] [১৬৮]

---

[১৬৭] সূরা ত্বহা ২০ : ১৩-১৪

[১৬৮] শারিন সফি অদ্রিতা

ফোন আসছে

[এক]

নুসরাত মেসেঞ্জারে ঢুকেছিল একটা কাজে। স্ক্রল করে যেতে যেতে হঠাৎ রূপার একটা মেসেজ দেখে আঁতকে উঠল! এই মেসেজটা সে এক সপ্তাহ আগে দেখে উত্তর না দিয়েই রেখেছে। ভেবেছিল পরে রিপ্লাই দিবে কিন্তু নানা ব্যস্ততায় তা আর হয়ে ওঠেনি। পরে অন্যান্য মেসেজের ভিড়ে রূপার মেসেজটা হারিয়ে যায়। পরে সে নিজেও বেমালুম ভুলে গেছে এটার কথা। নুসরাত আর একটা সেকেন্ডও দেরি না করে তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দেয়া শুরু করল, 'দেরি করে রিপ্লাই দেয়ার জন্য অনেক দুঃখিত দোস্ত ...।' আল্লাহই জানে রূপা কী ভাবল! দেখেও তো মেসেজ ইগনোর করার মেয়ে নুসরাত না।

[দুই]

ভাইয়ার সাথে বসে গল্প করছিল আয়িশা। হঠাৎ ভাইয়ার ফোন বাজা শুরু হলো। 'ভ্রুম ভ্রুম' করে ভাইব্রেশনে দেয়া ভাইয়ার ফোনটা বেজেই যাচ্ছে তো যাচ্ছে, কিন্তু সে তো আর তার ফোন খুঁজে পায় না। ভাইয়াটাকে নিয়ে আর পারি না, কোথায় ফোন রাখছে, সেদিকে খেয়াল রাখে না। ঘরের দৃশ্য তখন দেখার মতন! ভাইয়া হন্যে হয়ে ফোন খুঁজতে খুঁজতে বিছানা, বালিশ, কম্বল, চাদর সব উলটে ফেলে দিচ্ছে। ফোন যে কীসের নিচে আছে কে জানে। ছটফট করতে করতে একবার নিচে দেখছে, টেবিলের উপরের সব জিনিস ঠাসঠুস ফেলে দিচ্ছে, 'আরেহ ধ্যাত্তিরি! ফোনটা গেল কই?' এই করতে করতে ফোন বাজতে বাজতে বন্ধই হয়ে গেল। 'দরকারি কোনো ফোন হতে পারে, তোর ভাবির কিছু লাগতে পারে ধ্যাৎ!' বিড়বিড় করে বলতে বলতে চেয়ারের উপর রাখা কোটের পকেটে

হাত দিতেই ফোনটা পেয়ে গেল! সাথে সাথেই বউয়ের ফোন ব্যাক করে বলল, 'এই, কী খবর? সরি ফোন ধরতে পারি নাই, ওই যে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বুঝছ...'

[তিন]

সামিয়ার সামনে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। অকূল পাথারের মতন এই সিলেবাসেরও কোনো কূলকিনারা নেই। ফাইনাল প্রজেক্টটা শেষ করতে একসাথে সব বন্ধুরা মিলে পড়াশোনা করতে বসেছে। রূপা, নুসরাত, আয়িশা; সবাই সামিয়ার বাসায় এসেছে, পড়াশোনায় মগ্ন। এর মধ্যে কাছেই একটা মসজিদ থেকে ভেসে এলো মুয়াজ্জিনের আযান, 'আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার... ।' এত সুন্দর মায়া লাগে আযানের ডাকটা শুনে মুহূর্তেই সামিয়ার পরীক্ষার টেনশানটা যেন একটু কমে এলো। আযান শেষ হতে হতেই সে চেয়ার থেকে উঠে গেল, 'নামাজ পড়তে কমন রুমে যাচ্ছি, আমার সাথে কে যাবে?'

রূপা কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলল, 'হায়রে হুজুরনী! আযান তো মাত্র শেষ হলো, এখনই কীসের নামাজ? পাঁচটা মিনিট তো যেতে দিবি না কি?'

নুসরাত এর মধ্যে বলে দিল, 'তোরা যা নামাজে, আমার এখনও অনেক রিভিশান দেয়া বাকি, আমি বাসায় গিয়ে নামাজ পড়ে নিবনে।'

সামিয়া বলল, 'বাসায় গিয়ে পড়ে নিবি? নুসরাত তুই এক ঘণ্টা পরে রওনা দিলে তোর বাসায় যেতে কমসে কম ৪০ মিনিটের জ্যামে বসে থাকতে হবে। তোর মাগরিবের ওয়াক্ত কি তখনও থাকবে?'

রূপা কী জানি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওর ফোন বেজে উঠল, কথা থামিয়ে সে ফোন ধরল...

*****

সামিয়া কমন রুমের দিকে হাঁটা দিতে যাবে, তখন আয়িশা বলল, 'সামিয়া, দাঁড়া দাঁড়া। আমি আসছি, তোর সাথে নামাজ পড়ব।' সামিয়ার চোখেমুখে হাসির ঝিলিক। আয়িশা বলতে থাকল,

> 'দেখ, আমাদের প্রিয় কেউ আমাদেরকে কল করলে, আমরা সাথে সাথে সাড়া দেই। । কোনো কারণে তখনই ধরতে না পারলে অস্থির লাগতে

থাকে। প্রথম সুযোগটা পাওয়ার সাথে সাথে কল ব্যাক করি। যাদেরকে ভালোবাসি তাদের মেসেজের রিপ্লাই দিতে দেরি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিও টেনশন শুরু হয়ে যায়। রিপ্লাই দেয়ার পর শান্তি লাগে। আর এখানে? এখানে তো আল্লাহ আমাকে কল করছেন! আল্লাহ স্বয়ং আমাকে ডাকছেন! আর আমার কোনো ভাবনা নেই? একটুও তাড়া নেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার? কোনোভাবে নামাজ পড়লে পড়লাম, না পড়লে না পড়লাম, এটা আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি কেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে? যে আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, আমাকে সবচেয়ে বেশি দেখভাল করলেন, তিনি ডাকছেন নামাজের দিকে, কল্যাণের দিকে আর আমি এভাবে সেটা উপেক্ষা করব? আমি তো আমার প্রিয় কাউকে এভাবে অগ্রাহ্য করার কথা ভাবতে পারি না। তাহলে আল্লাহকে নিয়ে সেটা কীভাবে ভাবি বল তো?'

সুবহানআল্লাহ, আয়িশা! তুই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিস! আমি হয়তো এতটা গুছিয়ে বলতে পারতাম না। সামিয়া রীতিমতো হাততালি দেয়া শুরু করল! আয়িশার কথা আর কেউ কি শুনেছে? সেটা তো খেয়াল করিনি!

তবে একটু পরে দেখা গেল সুর সুর করে নুসরাত আর রূপাও ঢুকছে নামাজ পড়ার জন্য! আলহামদুলিল্লাহ!

সবাই মিলে মাগরিবের নামাজটা শেষ করল, আলহামদুলিল্লাহ![১৬৯]

---

[১৬৯] শারিন সফি অদ্রিতা

রিসেট, রিস্টার্ট, রিভাইভ!

বেশ উত্তেজনা নিয়ে নতুন একটা কোর্সের ট্রেইনিং করছি। হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই চোখের সামনে কম্পিউটারের মনিটরটা দপ করে নিভে গেল। মুহূর্তেই সবকিছু কালো হয়ে গেল। স্ক্রিনে ভেসে ওঠল, "No Signal Detected." তিন সেকেন্ড পরে এই লিখাও উধাও! ভাবছি কী ব্যাপার, শর্ট সার্কিট হলো? না কি শখের কম্পিউটারের হায়াত এতটুকুই ছিল?

ইস্তিগফার করতে করতে সব প্লাগগুলি চেক করলাম। সিপিইউ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম। কম্পিউটারের চালু হলো না। । আল্লাহর নাম জপতে জপতে সবগুলি প্লাগ সকেট থেকে খুলে ফেললাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার প্লাগগুলি যার যার জায়গায় লাগালাম। এবার পাওয়ার অন বাটনে টিপ দিতেই কম্পিউটার চালু হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ! স্ক্রিনে কম্পিউটারের চিরচেনা হোমপেজ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

*****

আরো কয়েকমাস আগের কথা। আমার ফোনটা বেশ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় অনেক ধীরগতিতে কাজ করছে। সবকিছুতেই যতটুকু সময় লাগার কথা তার চেয়ে বেশ সময় লাগছে। একটা অ্যাপ চালানোর জন্য ১০ মিনিট ধরে বসে আছি। তারপরও ফোনের স্ক্রিনে কিছুই ভাসছে না। ফোনটা রিস্টার্ট করলাম। অর্থাৎ পুরোপুরি বন্ধ করে আবার চালু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক হয়ে গেল!

আবার, গত কয়েকদিন ধরে বাসার ইন্টারনেট সংযোগেও কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যাচ্ছিল। “লোডিং” এর গোল চাকা ঘুরতেই থাকে তো ঘুরতেই থাকে! আমার স্বামী শেষ পর্যন্ত ওয়াইফাই রাউটারটা রিস্টার্ট দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ,

ইন্টারনেট আবার আগের স্পীডে চলে আসলো।

*****

একজন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলছিলাম। হঠাৎ তার ফোন এলো এবং শুনলাম যে সে ফোনে অপরপক্ষকে বলছে, 'কী ব্যাপার? মেশিন অন হচ্ছে না? সবকিছু বন্ধ করে আবার চালু করে দেখো তো কাজ করে কি না...'

সুবহানাল্লাহ! ভাবছি ভালোই তো মজা! সমস্যাগুলোর একই ধারার সমাধান– 'বন্ধ করে আবার চালু করা!'

কিন্তু কেন? কারণ, বেশির ভাগ মেকানিক্যাল মেশিনগুলি একই সময় এত বেশি ইনফরমেশন প্রসেস করে থাকে যে মাঝে মাঝে সিস্টেম জ্যাম হয়ে যায়। তখন সে আর ফাংশন করতে পারে না। আবার টার্ন অফ করে একটু রেস্ট দিয়ে অন করলেই ঠিক হয়ে যায়। কারণ, পুরো সিস্টেমটা তখন রিলোড হবার সুযোগ পায় এবং নতুনভাবে ফ্রেশ করে শুরু করতে পারে।

> আমাদের ব্রেইনও কিন্তু একটা হাই-পাওয়ার মেশিনের চেয়ে কম না। প্রতি সেকেন্ডে একটা নিউরোন (ব্রেইন সেল) প্রায় ২০০ বার করে ফায়ারিং করে। তাহলে কি স্বাভাবিক না যে আমাদের ব্রেইন এবং হার্টও এত কিছু প্রসেস করতে করতে প্রায়ই জ্যাম হয়ে যায়? তাই আমাদের নিজেদেরও মাঝে মাঝে রিসেট বাটনের প্রয়োজন হয় পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রাণসঞ্চার করে নিতে। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মানসিক আর আত্মিক সুস্থতার জন্য দিনের মধ্যে পাঁচবার করে রিস্টার্ট করার অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মুসলিমদের রিস্টার্ট বাটন হচ্ছে সালাত—নামাজ। নামাজের ওয়াক্ত শুরু হলে যে যেই কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, সেটা 'টার্ন অফ' করে নামাজের জন্য দাঁড়াতে হয়। নামাজ শেষ করে আবার ওই কাজে ফিরে যাবার জন্য নিজেদের ব্রেইনকে 'টার্ন অন' করতে হয়।

*****

মেধার কার্যকারিতার সুন্দর একটা উপমা মনে পড়ল। অফিসে এসে অনুবাদের কাজ করি। দ্বীনি প্রকাশনী। তাই দ্বীনি পরিবেশ এখানে কাজ করবে এটাই

স্বাভাবিক। আমরা জামাতে নামাজ পড়েই যেহেতু অভ্যস্ত এবং জামাতের জন্য সময় নির্ধারিত, তাই আযানের সাথে সাথে নামাজের জন্য কাজ থেকে বিরত হই না। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেকবার এমন হয়েছে যে, একটা লাইনের অনুবাদ আমি কোনোভাবেই উদ্ধার করতে পারছি না। বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঘামালাম, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। খুব খাটলাম, নামাজের আগেই একটা সমাধান করব বলে। কিন্তু হলো না। জায়গাটা ওভাবে রেখেই নামাজে গেলাম।

নামাজের পর কাজে বসে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতায় নত হলাম। এবার মাথা ঘামাতেই হলো না। খুব সহজেই সমাধান হলো। আমি নিজেই অবাক হচ্ছি! আর ভাবছি এটা সালাতের বারাকাহ। অনুবাদ করতে করতে ব্রেইনে জ্যাম লেগেছিল। সালাতের বিরতির মাধ্যমে এই জ্যাম কেটে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

> এই পুরো প্রক্রিয়ায় মনের অজান্তেই আমাদের অনেক বড় একটা উপকার হয়ে গেল। 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথেই অন্তর রিমাইন্ডার পেয়ে গেল যে 'জীবনের সব সমস্যার থেকে আল্লাহ বড়!' বুঝে বুঝে নামাজ পড়লে প্রতিটা ধাপে আল্লাহর পক্ষ থেকে আশা, পুরস্কার আর সমাধানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। রাকাত শেষে সিজদায় লুটিয়ে পড়লে নিজের সমস্ত সমস্যা, মিনতি আর না বলা কথাগুলি আল্লাহর দরবারে সমর্পিত হয়ে যায়। একেবারে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ! পরিপূর্ণ ভরসার জায়গায় নিজেকে সঁপে দেয়া!

সিজদার সময় ব্রেইন যে পজিশনে থাকে, এতে ব্রেইনে আরো বেশি রক্ত সঞ্চালিত হওয়ার সুযোগ পায়! ব্রেইন অবকাশ পায়, অন্তর ঠান্ডা হয়। আমাদের শরীর-মন নতুন উদ্যম ফিরে পায়। নামাজ শেষ করে আমরা নতুন করে তৈরি হই জীবনের পরবর্তী অভিযানগুলো জয় করতে। কয়েকঘণ্টা কাজ করে যখন আবার হতাশা আর অবসাদ জেঁকে ধরে, আবারও তখন পরের ওয়াক্তের নামাজের সময় হয়ে যায় নিজের মন-মগজকে উদ্বেলিত করে নেয়ার!। 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন আবারও আত্মাকে আর মনকে উদ্যমী করে নিই। এভাবে দিনের মধ্যে পাঁচবার। এরপর আর ব্রেইন হ্যাং হবার অথবা মন নিথর হয়ে থাকার কোনো সুযোগ থাকে না, আলহামদুলিল্লাহ।

*****

পড়াশোনায় মন বসছে না?

ক্যারিয়ারের চিন্তায় মাথা নষ্ট?

বাচ্চার কান্না থামাতে থামাতে দিন শেষ?

নানা ঝামেলায় মন অস্থির?

ওযু করে, জায়নামাজ বিছিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ...রিসেট! রিস্টার্ট! রিভাইভ! প্রাণসঞ্চার করে নিন নিজ মগজে এবং অন্তরে![১৭০]

[১৭০] শারিন সফি অদ্রিতা

পারফিউম কথন এবং নামাজ

আমার বিয়ের সময় আমি বেশ কিছু পারফিউম গিফট পেয়েছিলাম। তবে ইসলামিক অনুশাসন মেনে নিজের সম্ভ্রম এবং লজ্জাকে হিফাজত করতে পারফিউম অথবা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া আমার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। এটা সত্য যে, এত সুন্দর সুন্দর পারফিউমের বক্স এবং শিশিতে ভরা আকর্ষণীয় সুগন্ধী দেখে আমারও দিতে ইচ্ছা হতো।

একদিন আমার এক কুরআন শিক্ষিকার ক্লাসে শুনলাম যে, তিনি নামাজ পড়ার আগে সবচেয়ে সুন্দর জামাটা পরে এবং সুগন্ধী মেখে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তারপর নামাজে দাঁড়াতেন। সেখান থেকেই মাথায় আইডিয়া আসলো তাহলে আমিও তো নামাজে দাঁড়ানোর আগে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আল্লাহর জন্য সুগন্ধযুক্ত পারফিউম লাগিয়ে নামাজে দাঁড়াতে পারি। (অবশ্যই এমন পরিবেশে যেন কোনো নন-মাহরাম পুরুষ সেই গন্ধ না পায়)। এবং অদ্ভুত ব্যাপারটি হচ্ছে এই ছোট্ট কাজটি করার পর থেকে আমার মনে হলো যে, নামাজে আমার মনোযোগ বেড়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা হলেও মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হচ্ছে। আমি কল্পনা করি যে, ফিরিশতারাও আমার চারপাশে সুন্দর সুগন্ধীর সাথে ভিড় জমাচ্ছে! সুবহানআল্লাহ!

*****

আমরা যখন কোনো ভালো জায়গায় যেতে চাই যেমন বিয়ের অনুষ্ঠান, অফিসের মিটিং, চাকরীর ইন্টারভিউ; তখন সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরে, অনেক সময় নিয়ে আমরা নিজেদেরকে সাজাই। কারণ, আমাদের কাছে সেই অনুষ্ঠানে অথবা আয়োজনে সুন্দর দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। অথচ নামাজ পড়াটা এবং আল্লাহর

নৈকট্য লাভের এই ইবাদত যা কি না দিনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ! তখন সর্বোত্তমভাবে নিজেকে আল্লাহর সামনে তুলে ধরাটা কী আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না? এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের বাসার ময়লা কাপড়, মসলা মাখানো, ঘামের গন্ধযুক্ত জামাটা নিয়েই নামাজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি!

কোনোমতে নামাজটা শেষ করেই বের হয়ে আসছি। যার জন্য নামাজটা আমাদের কাছে একটা গড়পড়তা কাজের মতো হয়ে যায়। এটা আমাদের অন্তরে গাঁথে না। কিন্তু যদি আমরা মাত্র ৫ মিনিট সময় নিয়ে একটা ভালো কাপড় পরি। নামাজের আগে নিজেদেরকে একটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিই, তাহলে এই কাজটা করার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রশংসা করবেন এবং আমাদের নামাজে এবং জীবনে প্রকৃত সাফল্য এবং খুশু আসবে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমার গিফট বক্সের শেষ পারফিউমটিও কয়দিন আগে শেষ হয়ে গেল। জিনিসটা ঘরে বেকার পড়ে রইলো না বরং একটা ইবাদতে পরিণত করে কাজে লাগানো গেল আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরও উচিত সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরে, সুন্দরভাবে নিজেকে গুছিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে তারপর আল্লাহর সামনে নামাজের জন্য দাঁড়ানো। **আল্লাহ আল-জামিল, সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।**

*****

মাঝে মাঝে কাজের চাপে খুব অস্থির লাগে। মনে হয় দশ দিক থেকে আমাকে টানা হচ্ছে আর মাঝখানে আমি বজ্রের আঘাত খেয়ে বসে আছি। কোনো দিকেই যেতে পারছি না! তখনই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনি নামাজের আহ্বান, 'আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার...' আমাকে ডাকতে থাকে, 'নামাজের দিকে আসো, কল্যাণের দিকে আসো।' আযান শোনার পর দিশাহীন এই অগোছালো আমি অন্তত একটা দিকে যাবার পথ খুঁজে পাই। এলোমেলো টেবিলটা ওভাবেই ফেলে চলে যাই রবের কাছে নিজের আত্মাকে গুছিয়ে নিতে। এটা যে কতটা উপকারী এবং শক্তিশালী অনুশীলন যে কোনোদিন এর স্বাদ পায়নি তাকে বোঝানো কঠিন।

*****

মুহাম্মাদ ফারিস তার 'প্রোডাক্টিভ মুসলিম' বইতে নিজের জীবনের এমন একটা ঘটনা লিখেছিলেন। ঘটনাটা এমন... একবার তাদের এলাকায় বড় ধরনের বন্যা হয়, যার ফলে তাদের বাড়ির অনেকটা অংশই ডুবে যায়। লেখক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে নিজের সাজানো ঘরটাকে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেতে দেখতে থাকেন। এরকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা দায়!

ঠিক ওই সময় তিনি শুনলেন যে আযান পড়ছে। সাথে সাথে তিনি মসজিদের দিকে হাঁটা দিলেন। ওই ওলটপালট অবস্থা থেকে বের হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে মনটা শান্ত করে নিলেন। মাথা ঠান্ডা হলে পরবর্তী কাজ সম্পাদনের একটা দিশা পেলেন।

যখন প্রচণ্ড মন খারাপের দিনে কিছুই করতে ইচ্ছা করে না, হতাশায় শুধু মনে হয় ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে থাকি, তখনই একজন মুসলিম নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ায় রবের কাছে গিয়ে নিজেকে গুছিয়ে আনতে। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই নামাজ একজন মুসলিমের মনোবল চাঙা করে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রতিটা কথা আমার নিজের জন্য সবার আগে রিমাইন্ডার।[১৭১]

---

[১৭১] শারিন সফি অদ্রিতা

মদ না দুআ?

রেজাউল করিম

অ্যালকোহল (মদ)? দুআ? সালাত? ডিপ্রেশন? অ্যানক্সাইটি (বিষণ্ণতা)? সিজদায় দুআ?

আজ আপনাদের বলব, কেন মানুষ মদ খায়। সমগ্র বিশ্বেই এক রীতি, শুধু মুসলিম বিশ্ব ছাড়া, তাই না? মদ কিন্তু খেতে খুব বেশি স্বাদের না। কিন্তু খাবার পর শরীরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেজন্য মানুষ মদ খায়।

আসলে মানুষ প্রাণীটা বানর-সিংহ-কুকুর-বাঘের মতন না। যদিও দেখতে অনেক মিল আছে। আসলে মানুষ প্রাণীটা খুব সাইকোলজিক্যাল অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক জগতের ব্যাপক প্রভার রয়েছে আমাদের আচরণে। আমাদের মন স্বপ্ন, টেনশন, আতঙ্ক, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশন (বিষণ্ণতা) এসবে পূর্ণ। সে অকারণ টেনশন করে করে যাবতীয় খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। সে চুরি-বাটপাড়ি, ধোঁকাবাজি, দুর্নীতি সবকিছু করে ভবিষ্যতে কী হবে এই ভেবে। 'শুধু ভবিষ্যতে আমার কী হবে?' এই টেনশনে সে শেষ।

তো এসব দুশ্চিন্তার একটি 'হারাম' সমাধান হলো মদ খওয়া। এটা খেলে যাবতীয় টেনশন, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশন (বিষণ্ণতা) সাময়িকভাবে চলে যায়... দেহ-মন শান্ত হয়। এজন্য জাতি মদ খায়। এটা হলো মূল কারণ। মদ না খেলে ওদের সুইসাইড করার মতন অবস্থা হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম তো মদ হারাম করে দিয়েছে। সব নেশাজাতীয় ক্ষতিকর বস্তু বর্জনীয়। তাহলে সমাধান?

টেনশন, আতঙ্ক, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশনের কী হবে?

হ্যাঁ, সমাধান হলো, মানুষ আল্লাহর কাছে দুআ করবে, সে চাইবে। মনভরে সে দুআ করবে। সে দুআ করলেই (প্রতিনিয়ত) তার সব দুশ্চিন্তা চলে যাবে। যখন আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় যে, "দুআ কবুল হয় না", তখনও।

এজন্যই সালাত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া একটি অনন্য গিফট। কারণ সালাতটাই আসলে দুআ। ইংরেজিতে প্রেয়ার বলে না? প্রেয়ার শব্দের বাংলা কী? দুআ। মানে আল্লাহর কাছে চাওয়া। আর কিছু না। আর কিছু করতে হবে না। শুধু চাইবেন আর পাবেন। সহজ সমাধান। মন খুলে যে আল্লাহর কাছে চাইতে পারছেন যখন ইচ্ছা তখন, এটাই অনেক বড় মানসিক ভরসার জায়গা! কিন্তু আমরা কি সেই পর্যায়ে আমাদের নামাজ এবং দুআকে নিয়ে যেতে পেরেছি?

*****

তো, আসুন দুআর ভেতরে আর একটু গিয়ে দেখি, যে দুআটা কী? আসলে দুআ আসতে হয় হৃদয়ের গভীর থেকে, এটা আবৃত্তি করার বিষয় নয়।

আপনার কী দুঃখ, কী সমস্যা? ক্ষুদ্র সমস্যা বা বড় সমস্যা? আপনি আল্লাহকে সব খুলে বলুন। আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন, তাঁর কাছেই নিজেকে নিবেদন করুন এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিন। ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করুন আল্লাহর কাছে। ছোট্ট বাচ্চা যেভাবে মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতেই থাকে (যথার্থ উদাহরণ দেয়া সম্ভব না) সেভাবে কাতর হয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলুন।

দুআর ধরন হবে নবীদের মতন। আপনি দেখবেন কুরআনের বড় একটা অংশ নবী বা বিশুদ্ধ বান্দাদের দুআ। এগুলো দিয়ে আল্লাহ আমাদের শেখাচ্ছেন যে কীভাবে দুআ করতে হয়। নাহলে আবার বেয়াদবি করি তো আমরা। বেয়াদবের মতন না। আদব রক্ষা করে।

আর এই দুআটাই হলো মূলত সালাত। আর কিছু না। সালাত বা নামাজ দিনে ৫ বার না? দিনে ৫ বার বলার সুযোগ। তবে আপনি দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেকোনো সময় আল্লাহকে ডাকতে পারেন। তাহাজ্জুদের সময় রাতের এক

তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখনও আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে থাকেন বান্দার একান্ত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য!

দুআটা করবেন সিজদায়। মানে নামাজের সিজদায়। যখন সিজদায় থাকবেন, তখন বান্দা তাঁর রবের সবচেয়ে কাছে থাকে, তাই তখন করতে হয়। এটা হলো সুন্নাহ।[১৭২]

সালাতে দুআ করার তিনটা সময়। দুই সিজদার দুই সময় (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা বলার পরে), দুই সিজদার মাঝখানে যখন বসবেন তখনও। আরেকটা সময় রুকু থেকে ওঠার পরে। এই দুআটা বাংলাতেও করতে পারেন।[১৭৩] আরবী করাটা বাধ্যবাধকতা না। বাংলায় না করলে মন উজাড় করে আসবে না। রিসাইট বা আবৃত্তি হবে কেবল, ফায়দা কম। নিজেই জানিনা কি চাচ্ছি এমন একটা অবস্থা, তাই নয় কি?

এটা হলো সত্যিকারের সালাত, যা মানুষের সব সমস্যার সমাধান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই করতেন। এটা করলেই সালাতের মধ্যে সত্যিকারের মজাটা পাবেন। দেখবেন, সব দুশ্চিন্তা মিলিয়ে গেছে। ভারতীয় মুসলিমরা নিজেদের জন্য আরবী ভাষায় দুআটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে, সে অতি ডিসিপ্লিনড (নিয়মমাফিক) হতে গিয়ে নিজের ভাষাটা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছে। মুখস্থ দুআ পড়তে গিয়ে সে নিজেই জানে না যে সে কী চায়? সে কেবল দুআটা আবৃত্তি করে মাত্র। দুআটা আবৃত্তি করার বিষয় না রে ভাই/বোন, এটা মন উজাড় করে চাওয়ার বিষয়।

*****

এখন দুআ করবেন কীভাবে? দুআর ধরন কী হবে? একটু

---

[১৭২] সিজদার সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু দুআ প্রমাণিত আছে, তবে এগুলো নফল সালাতে। তিনি নফল সালাত দীর্ঘ সময় নিয়ে আদায় করতেন, সিজদাতেও দুআ করতেন প্রাণ খুলে। ফরজ সালাত জামাতের সাথে আদায় করতে হয়, সেখানে সব ধরনের মুসল্লিদের দিকে লক্ষ করে সঙ্গত কারণেই সিজদা দীর্ঘ করা যায় না। ফলে এখানে দুআর আবেশও আসবে না।

[১৭৩] হানাফীদের মতে ফরজ নামাজ ছাড়া সুন্নাত কিংবা নফল নামাজে বাংলায় তথা মাতৃভাষায় দুআ করা যাবে।

সংক্ষেপ করছি।

দুআ শুরু হবে, আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে। আল্লাহ যে আপনাকে দিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় দ্বারা। খুঁজে খুঁজে বের করবেন, আল্লাহ আপনাকে কী কী দিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় করবেন। এরপর নিজেকে অনুশোচনায় দগ্ধ করবেন, নিজের গুনাহ এবং অপরাধের জন্য। আল্লাহ আপনাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, সেটা উপলব্ধি করবেন। এরপর আপনি কী চান, সেটা ভদ্রভাবে বলবেন। এভাবে নিজেকে ছোট করা, আল্লাহকে বড় করা এবং নিজের সমস্যাগুলো বিস্তারিত খুলে বলা। এরপর পানাহ চাওয়া। একটা সুতা থেকে শুরু করে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত যা মন চায়, (হালাল) তাই চাইবেন।

কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি:

এক. দুআয়ে ইউনুস, 'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

দেখুন, দুআয় নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম সরাসরি কিন্তু বলেননি যে তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তি চান। বরং বিনয়ের সাথে নিজের অসহায়ত্বের কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।। শুরু করেছেন আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে, ভুল তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। এভাবেই শেষ তার দুআ। কী সুন্দর না? এটার নাম বিনয়। এটা আসে অন্তর থেকে।

দুই. আইয়ূব আলাইহিস সালামের দুআ। অভাবের একটা পর্যায়ে এসে আইয়ূব আলাইহিস সালামের স্ত্রী মাথার চুল বিক্রি করে দেন সংসারের ব্যয়ভার চালানোর জন্য। এদিকে তার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। গোটা শরীর পচে পোকা ধরেছিল। এখন সেই পোকা ধরেছে জিহ্বায়। এই নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি আর থাকতে পারেননি। তিনি বলে ওঠেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দুরারোগ্য ব্যাধি স্পর্শ করেছে, আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'[১৭৪]

দেখুন, এখানেও আইয়ূব আলাইহিস সালাম কিন্তু সরাসরি মনের কথা প্রকাশ করেননি। তিনি শুধু নিজের কষ্টটা পেশ করলেন, এরপর সেই আল্লাহর প্রশংসা। কী সুন্দর না! এটাকেই বলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা।

এবার আরেকটা দুআ দিচ্ছি। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। বুখারীতে বর্ণিত। আল্লাহর

---

[১৭৪] সূরা আম্বিয়া ২১ : ৮৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

> ‘হে আল্লাহ, আপনিই আমার রব। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনারই দাস। আপনার বিধিবিধান আমি যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করছি। আমি যা করেছি, তার অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি আমাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা স্বীকার করি। আমার গুনাহকে স্বীকার করছি। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ, আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার মতো আর কেউ নেই।’

খেয়াল করে দেখবেন, এ দুআটা আসলে দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন বা আস্তাগফিরুল্লাহর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ। এভাবে দুআ করতে হয়। হুট করে শুরু না করে এরকম পূর্ণ অলংকরণসহ দুআ করবেন সিজদায়। এরকম বারবার...

আমি আবারও বলছি, তোতাপাখির মতো এই দুআটার আরবীটা মুখস্থ করে আবৃত্তি করবেন না। বরং বাংলা বুঝে, হৃদয়ে ব্যাকুলতা নিয়ে করবেন। দুআ মন্ত্রের মতো না পড়ে উপলব্ধির সাথে করার চেষ্টা করুন।

এবার সবচেয়ে মজার দুআটা বলব। সেটা হলো প্রতিদিন সালাতে আমরা পড়ি। আসলে আমরা তোতাপাখির মতন আবৃত্তি করি, যেটা যথাযথ না। বরং হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাহলে ফায়দা হবে।

দুআর মূল কথাটা হলো, ‘হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল পথ দান করুন। তাদের পথ, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন, তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনি রাগান্বিত হয়েছেন বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।’ এই দুআ কবুল হলে জীবনে আর কিছু লাগে না।

এই দুআটাই তার পূর্ণ অলংকরণসহ এরকম হয়:

১. ‘পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। ২. সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। ৩. পরম করুণাময়, অতীব দয়ালু। ৪. বিচার দিবসের মালিক। ৫. আমরা শুধু আপনারই দাসত্ব করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য কামনা করি। ৬. আমাদের সরল পথ প্রদর্শিত করুন। ৭. তাদের পথে, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের পথে নয় যারা আপনার ক্রোধের শিকার

ও পথভ্রষ্ট। আমিন।

সূরা ফাতিহা, তাই না? আল্লাহ আমাদের শেখাচ্ছেন এরকম করে দুআ করতে হয়। জীবনের সবকিছু এই নীতি অনুযায়ী চাইবেন। প্রথমে যে মহান রবের কাছে চাচ্ছি, তাঁর প্রশংসা করব, যথার্থ প্রশংসা। তারপর তুলে ধরব নিজের আর্জি আর আকুতি।

সালাতের মূল একটি কাজ হলো এই দুআটি বারবার হৃদয়ঙ্গম করা। আবৃত্তি করাটা উদ্দেশ্য না। এজন্য সালাত পড়ার সময় যখনই আমরা সূরা ফাতিহা পড়ব, অন্তরে এটা চাইব। এটা কিন্তু সহজ, তাই না? শুধু অর্থটা মুখস্থ করে ওই সময় মনে আনতে হবে।

আসলে সিজদায় দুআ এবং সূরা ফাতিহা; এখানে দুআকে অন্তর দ্বারা চাইলে দেখবেন, আপনার দুঃখ-কষ্ট বেদনা সবকিছু এক নিমিষেই শেষ। আর দুআ আসলে এভাবেই করতে হয়। এটা অরিজিনাল নিয়ম।

তবে সালাতের বাইরেও আলাদাভাবে দুআ করা সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু সিজদার সময়টা মিস করবেন কেন? সেটাই তো আসল সময়। রবের সবচেয়ে কাছে না?

বিশেষ সতর্কবার্তা

আদব-কায়দা নেই এমন ব্যক্তির মতন দুআ করবেন না। বেয়াদবের বৈশিষ্ট্য হলো, সে আল্লাহর শোকর করে না, আল্লাহকে দোষারোপ করে, বিরক্তি প্রকাশ করে, নিজেকে ছোট করতে পারে না। বরং নিজেকে বড় হিসেবে জাহির করে। উদাহরণ হলো বনী ইসরাইলের কিছু লোকের দুআ। আল্লাহ আমাদের দেখিয়েছেন, শেখানোর জন্য। যাতে আমরা এমনটা না করি। সূরা বাকারা, আয়াত ৬১;

> ‘আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়—তরকারি, কাকড়ি, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি।’

এখানে বনী ইসরাইলের ভুল হলো, তারা মান্না এবং সালওয়ার জন্য শুকরিয়া আদায় তো করেইনি বরং তারা বিরক্তি প্রকাশ করছে এবং আল্লাহকে দোষারোপ

করছে যে কেন তিনি তাদের মান্না-সালওয়া দিলেন, আর কিছু দিচ্ছেন না, যেন আল্লাহর ঠেকা পড়ছে, আস্তাগফিরুল্লাহ। দুআর টোনটা দেখেন, প্রকাশের ভঙ্গিটা বোঝেন। ঔদ্ধত্য, অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে।

যদি তারা এভাবে বলত?

> 'হে আমাদের প্রভু, সকল প্রশংসা আপনার। আপনি আমাদের উত্তম খাদ্য মান্না এবং সালওয়া দান করেছেন। এত সুস্বাদু খাদ্য আহরণ করতে আমাদের কোনো কষ্টই করতে হয় না। এ তো আপনার দেয়া এক বিশেষ নিয়ামত। কিন্তু আপনি জানেন, আদম পেট কিছুতেই ভরে না। আপনি যদি মান্না ও সালওয়ার সাথে সাথে জমিতে উৎপন্ন খাদ্য সামগ্রীর মতন সামগ্রীও দান করতেন, আমাদের খুব ভালো লাগত, সেগুলো খেতেও আমাদের খুব মন চায়। হে আমাদের রব, মান্না ও সালওয়ার সাথে সাথে আমাদের এইসব খাদ্যও দান করুন। আমিন।'

এরকম বললে সুন্দর হতো না? কিন্তু আমরা? আমরা কি বনী-ইসরাইলের মতো হয়ে যাচ্ছি? অজ্ঞ এবং বেয়াদবের মতন দুআ করি। কী দুঃখজনক! মুখের ভাষাটা অন্তর থেকে আসে। অন্তরে শোকর এবং বিনয় থাকলে সেটাই মুখ দিয়ে বের হয়। এজন্য অন্তর পরিষ্কার রাখা খুব জরুরী।

এভাবে শোকরগুজার হয়ে আদবের সাথে দুআ করতে হবে।

খেয়াল করে দেখবেন, মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েও দুনিয়ার সব পাপই করছে। তাদের কি সালাত হচ্ছে? সন্দেহ আছে। কারণ, সালাত সকল পাপ থেকে বিরত রাখে একথা আল্লাহ বলেছেন। তার মানে আমাদের মুসলিমদের সালাত ঠিকমতন হচ্ছে না বোধ হয়, কী বলেন? এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়!

আসলে সালাত হলো দুআ হৃদয়ঙ্গম এবং কুরআন তিলাওয়াতের একটি সমন্বয়। কুরআন তো তিলাওয়াত করব ঠিক আছে, কিন্তু দুআটা বাদ দিলে হবে না, বা দুআটাও না বুঝে তিলাওয়াত করলে হবে না। বরং প্রতি ওয়াক্ত সালাতকে দুআয় পরিণত করতে হবে। তাহলে আপনার দুআও কবুল হবে। এবং অন্তর হবে টেনশনমুক্ত, শঙ্কামুক্ত, ঝরঝরে, আতঙ্কহীন, নো অ্যানক্সাইটি, নো ডিপ্রেশন ওয়ালা প্রশান্ত। কোনো গুনাহে ঝুঁকে যেতে হবে না। কোনো মদ অথবা নেশার প্রয়োজন হবে না। গত ১৫০০ বছর ধরে উম্মাহ এটা প্রমাণ করেছে যে আমাদের

অ্যালকোহল লাগে না। কারণ, আমরা আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক করতে চেষ্টা করি।

একটি দারুণ পর্যবেক্ষণ!

এ কথাটি না বলে পারলাম না। আপনি নিজের সমস্যার কথা মানুষকে বললে দেখবেন, বেশিরভাগ মানুষ সহজে শুনতে চায় না কিংবা সে বিরক্ত হয়। আবার এক্ষেত্রে মানুষের কাছে ক্ষেত্রবিশেষে আপনার মর্যাদাও কমে যায় তাই না?

আসলে হয়তো আল্লাহ ইচ্ছে করেই মানুষকে এমন বানিয়েছেন, যাতে আপনি মানুষের কাছে না চান (আল্লাহই ভালো জানেন)।

মজার ব্যাপার না? আসলে আল্লাহ খুশি হন, যখন আপনি তাঁর কাছেই চান। কাজেই শুরু করে দিন। সালাতের মধ্যে সিজদায় দুআ। জিন্দা করুন এই সুন্নাহ।

অবশ্যই আমরা সামাজিক উম্মত হিসেবে একে অপরের পাশে দাঁড়াব। সাহায্য করব, চাইব এবং হাত বাড়িয়ে দিব। তবে চূড়ান্ত সাহায্যের জন্য যেন একে অপরের উপর নির্ভরশীল না হই। যিনি অমুখাপেক্ষী, সাহায্য করার মালিক, তাঁর উপরেই নির্ভরশীল থেকে নিজেদের আত্মমর্যাদা ধরে রাখি।

সালাত—কী অপূর্ব এক দুআ! উম্মাহ বুঝবে কবে? উম্মাতের সব সমস্যার আসল সমাধান। জাযাকুমুল্লাহ।[১৭৫]

---

[১৭৫] অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই আলোচনাটি নেয়া হয়েছে রেজাউল করিম ভাইয়ের ওয়াল থেকে।

সালাত: অজানা মনোজগতের হারানো চাবি

ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

ইসলাম কী বলে? ইসলাম বলে, মন বা রূহ হলো অবস্তু, আল্লাহর আদেশ। আমার রূহটাই বস্তুত আমিত্ব সৃষ্টি করে আমাদের মাঝে। 'আমার দেহ', এই 'আমি'টা কে? আমিটা হলো রূহ। রূহের আলোচনায় দেকার্ত[১৭৬] অবশ্য খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। substance dualism-এ তিনি কিছুটা এমনই বলেছিলেন। রূহই দেহের পরিচালক, রূহ সিদ্ধান্ত নিয়ে দেহ দ্বারা বাস্তবায়ন করে। রূহ চলে গেলে পড়ে থাকে দেহ, খেয়ে নেয় পোকায়।

ইসলাম ফিতরাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। মনকে নিয়ন্ত্রণ। স্রষ্টানুভূতি (তাকওয়া), জান্নাতের শখ, জাহান্নামের ভয় দিয়ে এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আত্মশুদ্ধির নামে মনকে লাগামবদ্ধ করা শেখায়। নামাজ-যিকির-তাদাব্বুর ইত্যাদি বিভিন্ন আমলের মধ্য দিয়ে মনকে বশীভূত করা হয়। যে যত উত্তম মুসলিম, যত প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, তার মন তত বশীভূত। আর বশীভূত মনের সুফল যেন পোষ মানা ঘোড়ার মতোই, কাজের জিনিস। যার সুফল আপনি অনুভব করবেন প্রতি মুহূর্তে। উল্টো করে বললে, যার মন যত নিয়ন্ত্রণে, সে তত ভালো

---

[১৭৬] রেনে দেকার্ত একজন ফরাসি দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের প্রথম আধুনিক দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি একজন দ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি জ্যামিতি ও বীজগণিতের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করেন, যার দ্বারা বীজগণিতের সাহায্যে জ্যামিতিক সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়।

মুসলিম, আল্লাহর কাছে তত প্রিয়।

মনকে যেখানে রাখবেন সেখানে থাকবে। যেখান থেকে বের করে দিবেন, সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ বসে থাকতে বলবেন সেখানেই বসে থাকবে। কী মজা, না? আমাদের দ্বীনই এজন্য যথেষ্ট। মনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে সালাতে।

সালাত হচ্ছে সংযোগ। অথচ আমরা সংযোগ ছাড়াই বছরের পর বছর সালাত পড়ে চলেছি। সালাত এতটাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে যে, সঠিকভাবে সালাত পড়তে পারলে মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

*****

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক তো নামাজ পড়ে, আবার চুরিও করে।' নবীজি জবাব দিলেন, 'শিগগিরই এই নামাজ তাকে চুরি থেকে ফেরাবে।'

আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত সকল অশ্লীল ও পরিত্যাজ্য কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।'

চলুন দেখি আমরা আমাদের নামাজে কীভাবে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারি। কীভাবে এমন সালাত পড়তে পারি, যা আমাদেরকে সালাতের বাইরের জীবনেও সমানভাবে ফোকাসড ও মনের উপর বিজয়ী করে রাখবে।

এক. ওযু

- ওযুর সময় পূর্ণমাত্রায় মনকে ওযুর ভেতর কেন্দ্রীভূত করুন।
- ওযু দিয়ে যে কাজ আপনি করতে যাচ্ছেন (সালাত বা তিলাওয়াত), সেটার কথা ভাবুন।
- সম্ভব হলে বসে ওযু করুন। এতে এই মনঃসংযোগগুলো সহজ হবে।
- পানির ব্যবহারের দিকে খেয়াল করুন, অপচয় যেন না হয়।
- এই চারটি চিন্তার ভেতরেই মনকে বন্দি রাখতে হবে।

দুই. সালাত

ক) কিয়াম: দাঁড়িয়ে থাকাকে বলে কিয়াম।

- দাঁড়ানো অবস্থায় চোখ সিজদার স্থানে স্থির থাকবে। শরীর টাইট না, শরীর ছেড়ে দিবেন। শরীরের ওজন থাকবে পায়ের পাতার গোড়ালির উপর, সামনের দিকে না। তাহলে শরীর ফিক্সড হয়ে যাবে, সামনে পিছে নড়বে না।

- মনের অবস্থা এমন করে ফেলুন যেন আপনি আজীবন এভাবেই থাকতে পারবেন। রুকুতে যাবার জন্য মনে একবিন্দুও তাড়াহুড়া নেই।

- সূরার অর্থ জেনে অর্থের দিকে খেয়াল করুন।

- কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এটা একটা আলাদা রকম অনুভূতি। ধরেন আপনি সামনে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার বন্ধু আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে, একটু অস্বস্তির অনুভূতিটা। নামাজের মধ্যে এই অনুভূতিটা আনতে হবে, আনা যায়। ভাবুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। কোনো ভুল হচ্ছে কি না, এমন একটা তটস্থ ভাব আনুন।

এই চিন্তাগুলোর মাঝে ঘুরেফিরে মনকে আটকে ফেলুন।

খ) রুকু:

- চোখ দুপায়ের বুড়ো আঙুলের মাঝে। শরীরের ওজন এবার পায়ের পাতার সামনের অংশে, তাহলে বডি ফিক্সড হবে। কোমর টানটান করুন, দেখবেন নিতম্ব ও উরুর পেছনে একটা টান অনুভব হবে। শরীরের উপরের অংশ টাইট থাকবে না, লুজ থাকবে। এমন পজিশন করুন আর মনের ভাব এমন করুন যেন, আপনি এই পজিশনেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। আল্লাহু আকবার বললে ওঠার জন্য কোনো তাড়া নেই।

- রুকুর তাসবীহর অর্থ খেয়াল পড়ুন। ৩ বার, ৭/৯ বার পড়ুন।

- বাদশাহের বাদশাহ, আপনার স্রষ্টা ও মনিবের সামনে আপনি কুর্নিশের ভঙ্গিতে আছেন। অন্তরকে আনুগত্যের চরম সীমায় নিয়ে যান।

- আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, আপনার অন্তর জেনে ফেলছেন। হায়, আমার নাপাক অন্তর! এমন একটা জড়সড়ো ভাব আনুন।
- যখন মনের ভেতর একটা শান্তি ভাব আসবে যে, আল্লাহ আপনার তাসবীহ শুনেছেন, তখন দাঁড়াবেন।

উপরের চিন্তাগুলোর বাইরে মনকে যেতে দিবেন না। ছটফটে মন এটুকুর ভেতরেই ছটফট করবে।

গ) রুকু থেকে দাঁড়ানো

- সোজা হয়ে দাঁড়ান। শরীরের উপরের অংশের পেশি রিল্যাক্স করে দিন। যেন এইভাবে দাঁড়িয়ে আজীবন থাকতে পারবেন, এমন দিলের অবস্থা করুন। যেন সিজদায় যাবার কোনো তাড়া নেই।
- 'রব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহ' এর অর্থ খেয়াল করে পড়ুন। এত সওয়াব পেলেন, যা আল্লাহর কাছে নেবার জন্য ৩০ এর অধিক ফিরিশতা প্রতিযোগিতা করছে, এত সওয়াবের কথা ভেবে মনে আনন্দের আবহ নিয়ে আসুন।
- অপরাধীকে যেভাবে আদালতে হাজির করা হয়, তেমন একটা তটস্থ ভাব মনে নিয়ে আসুন।
- সাথে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, এই অনুভূতি তো আছেই।
- যখন মনের ভেতর একটা শান্তিভাব আসবে যে, আল্লাহ আপনার হামদ শুনেছেন, তখন সিজদাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিন।

একবার আনন্দ, একবার তটস্থ, একবার অর্থ এইসব বিচিত্র চিন্তার ভেতর মনকে আটকে দিন। এর ভেতর ঘুরপাক খাক।

ঘ) সিজদা:

- চোখ অবশ্যই খোলা রাখবেন। চোখ খুলে না রাখলে আপনি যে মাটিতে লুটিয়ে আছেন, পরিপার্শ্বের তুলনায় এই অনুভূতি আসে না।
- পায়র আঙুল যথাসাধ্য কিবলামুখী রাখার চেষ্টা করবেন। দেখবেন কপালে

কিছুটা চাপ পড়ছে। এই অবস্থায় শরীর ছেড়ে দিবেন, লুজ করে দিবেন।

- এমন একটা ভাব আনুন মনে, যেন আপনি আজীবন এভাবেই থাকতে প্রস্তুত। এই অবস্থাতেই আপনার যত শান্তি। ওঠার জন্য মনে একবিন্দুও তাড়াহুড়া নেই।

- সিজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট উপস্থিতি অনুভবের চেষ্টা করুন। বোঝানোর জন্য বলছি। কেউ আপনার পেছনে এসে দাঁড়ালে আপনার ভিন্ন এক অনুভূতি হয়। পরীক্ষা দেয়ার সময় পরিদর্শক পেছনে এসে দাঁড়ালে কেমন অস্বস্তি অস্বস্তি একটা ভাব আসে। ধরুন, তিনিই খাতা দেখবেন, তিনি আপনার লেখার দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই ভাবটা গাঢ় হয়—ভুল লিখছি, না ঠিক লিখছি। এরকম একটা মনের ভাব আনতে হবে।

- আবার আনন্দের অনুভূতিও আসবে। এমন সর্বশক্তিমানের কাছে আমি এই সিজদার দ্বারা প্রিয়তর হচ্ছি। হাদিসে এসেছে, প্রতি সিজদায় বান্দার মর্যাদা বাড়ে। সেই আনন্দ অনুভব করুন।

- সিজদার তাসবীহগুলোর অর্থ খেয়াল করে ৭/৯ বার পড়ুন।

- যখন মনে এমন একটা তৃপ্তি আসবে যে, আল্লাহ আপনার প্রশংসা শুনেছেন, তখন মাথা ওঠাবেন। প্রথম প্রথম এই তৃপ্তির অনুভূতি আনতে দেরি হয়, ৭/৯ বার বা আরো বেশি তাসবীহ পড়া লাগতে পারে। চর্চা করতে করতে ৫ বারেই এই অনুভূতি চলে আসে।

ঙ) বৈঠক:

- কোলের উপর চোখ থাকবে।

- আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ এবং দুআ মাসূরার অর্থের দিকে খেয়াল থাকবে। মনের অবস্থাও অর্থের সাথে বদলাবে।

- আল্লাহ দেখছেন, এমন অনুভূতি থাকবে।

- আল্লাহ বললে এভাবেই বসে থাকতে আপনার কোনো সমস্যা নেই, এমন তৃপ্তি ও রিল্যাক্সের সাথে বসবেন। মনে এই অনুভবটা আনবেন।

- ফরজ সালাত আমরা জামাতে পড়ি। ফলে এভাবে পড়া সম্ভব পুরোপুরি নাও হতে পারে। সুন্নাত ও নফল নামাজ এভাবে পড়লে ইনশাআল্লাহ তাড়াহুড়ার ভেতরেও মন আটকানোর দক্ষতা চলে আসবে। নামাজের ধ্যান আনতে হবে নিয়মিত যিকির করে। সকাল-সন্ধ্যা যিকিরে অভ্যস্ত হোন।
  - সুবহানআল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) - ১০০ বার
  - আলহামদুলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর) - ১০০ বার
  - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই) - ১০০ বার
  - আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) - ১০০ বার
  - আস্তাগফিরুল্লাহ (আল্লাহ, মাফ করুন) -১০০ বার

প্রতিটি যিকিরের ভেতরে মনকে আটকে রাখুন। সহজ হবে যদি অর্থের দিকে খেয়াল রাখেন। এবং আল্লাহ আপনার ডাক শুনছেন, এমন অনুভূতির সাথে করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

এভাবে নামাজ পড়তে পারলে এবার জীবন আপনার জন্য সহজ। মন এখন আপনার হাতের মুঠোয়। কোনো গুনাহের কল্পনা আসলে পাশ কেটে যাওয়া আপনার জন্য সহজ, জাস্ট মনটাকে কানে ধরে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিন, অন্য চিন্তায় লাগিয়ে দিন। কষ্ট বা অপমানের কোনো স্মৃতি মনে আসছে, ওকে কীভাবে আরো সমুচিত একটা জবাব দেয়া যেত এসব ভেবে তিতা তিতা মন নিয়ে ঘুরছেন? মনকে অন্য কাজে নিযুক্ত করে দিন। বদভ্যাস ত্যাগও এখন আপনি করতে পারেন। সিগারেটের খেয়াল এলে মনটাকে ঘুরিয়ে আরেক কাজে লাগিয়ে দিন, ব্যস। আনন্দের কোনো কাজ যেমন সন্তানের সাথে খেলছেন, বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছেন, পুরোটা মন লাগিয়ে দিন, আনন্দকে পুরোপুরি অনুভব করুন, কেন্দ্রীভূত করুন। এখন সুখের জীবন, ফুরফুরে জীবন আপনার জন্য সহজ, ইনশাআল্লাহ। কারণ দৈনিক পাঁচবার মুসলিম হিসেবে আমরা এই দারুণ মানসিকতার প্রশিক্ষণ নিই, আলহামদুলিল্লাহ।

নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত কেন?

শাইখ ড. আকরাম নদভী

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। তবে বিভিন্ন সময়ে সেট করা। সব নামাজ সূর্যের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। কারণ, মানুষের চোখের সামনে সূর্যটা দৃশ্যমান। ভোরে সূর্য থাকে না। দুপুরে ঠিক মাথার উপর। বিকালে গাছের পেছনে। সন্ধ্যায় অস্ত। রাতে পুরোই হারিয়ে যায়।

সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সূর্যাস্ত, গভীর অন্ধকার। প্রশ্ন আসে, এসব সময়ে নামাজ কেন পড়া হয়?

ইবাদতগুলোর দুইটা পার্ট। হানাফিয়্যাহ আর ইসলাম। এ দুইটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নাহ।

হানাফিয়্যাহ হচ্ছে, দুনিয়ার দৃশ্যমান সবকিছুই অস্থায়ী, এসব থেকে মুখ ঘুরিয়ে আল্লাহমুখী হওয়া। যখনই বুঝতে পারবেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই, তিনিই একমাত্র স্থায়ী। তখন সম্পূর্ণ তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছ বিলিয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলাম।

নামাজই হচ্ছে হানাফিয়্যাহ ও ইসলামের বাস্তবিক ট্রেনিং।

এবার প্রশ্নে আসা যাক। কেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আলাদা আলাদা উপযুক্ত সময় সেট করা হয়েছে?

ফজর: সূর্যোদয়ের আগে ফজর নামাজ পড়তে হয়। ঐ সময়ে সূর্য থাকে না। আকাশে সূর্যের দেখা নাই। সূর্য নামক জিসিটাই যেন অধরা। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল

সব সময় আছেন, থাকবেন। ফজরের সময়ে, শক্তির আধার সূর্যের কোনো খবর নেই। মানুষের চিন্তাশীল মন ভাবে, এই সূর্য দিনে তার কত প্রখরতা। সে সূর্যটাকে এখন আর দেখতে পাই না। শিওর এটি অস্থায়ী। কারণ, দিনে আছে, ভোরে নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো কোথাও হারিয়ে যান না। তিনি আছেন অদৃশ্য আকারে। তিনি সব সময়ই অস্তিত্ববান। তিনিই সবচেয়ে মহান। নামাজে মানুষের উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হয়, 'আল্লাহু আকবার।'

যোহর: মধ্যাহ্নে সূর্য একেবারে মাথার উপর থাকে। নামাজ পড়া তখন নিষিদ্ধ। যোহর ওয়াক্তের সময় সূর্য হেলে পড়ে। সূর্য এতক্ষণ মাথার উপর জ্বলজ্বল করছিল, নিজের প্রখরতা জানান দিচ্ছিল, তার পতন মাত্র শুরু হয়ে গেছে। আপনি ঐ সময় আল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়ান, নীরবে ঘোষণা দেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি মহান, আপনার কোনো পতন নেই।'

আসর: গাছ অথবা পাহাড় সূর্যকে আড়াল করে দেয় এ সময়ে। সর্বদিক ছায়ার খেলা। সূর্য গাছের পেছনে পড়ে যায়। আসরের ওয়াক্তে নামাজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হয়, 'আল্লাহ আপনি এমন শক্তিশালী আর এমন ক্ষমতাধর, কেউ আপনাকে আড়াল করতে পারে না। আপনার রহমত থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে না।'

মাগরিব: কিছুটা আলো থাকে ওই সময়। কিন্তু সূর্যের অস্ত ঘটে। তার দীপ্তি এখন নিভু নিভু। প্রচণ্ড তাপশক্তির অবসান ঘটে। আকাশে তার সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা। কিন্তু আল্লাহর শক্তির কোনো ধ্বংস নেই। দুর্বলতা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করে না, সুবহানআল্লাহ। তিনি সবসময়ই প্রখর আর প্রচণ্ড। মানুষকে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে হয় মাগরিব নামাজে।

এশা: মাগরিবে একটু আলো তবু দৃশ্যমান থাকে। কিন্তু এশায় পুরো পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়। মনে হয় এ পৃথিবীর দিনের অবস্থা ছিল মিথ্যা। সূর্যের আলো ছিল মায়া। কোনো আশা নেই। গাঢ় অন্ধকারে মানুষের মন খুঁজে বেড়ায় জীবনের আশার আলো। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা তুমি হতাশ হয়ো না, আমি আছি, আমার সামনে প্রশান্ত অন্তরে দাঁড়িয়ে যাও নামাজে, আমাকে স্মরণ করো উচ্চকণ্ঠে, আমার সামনে মাথা ঠেকাও আনন্দচিত্তে। অন্ধকারকে ভয় নেই। তোমার আল্লাহ জীবন থেকে অন্ধকারকে উঠিয়ে নিবেন। তিনিই মহান। তিনিই বড়, আল্লাহু আকবার।'

সালাত—ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং

ডা. জাকির নায়েক

বেশিরভাগ মুসলিম সালাত আদায়ের সময় যে সূরাগুলো পড়েন তা কমবেশি আমরা সবাই জানি। সূরা ফাতিহাসহ ছোট-বড় আরো অনেক সূরা সালাতে পড়া হয়। আর আমরা এগুলো এত যান্ত্রিকভাবে পড়ি যে, যদি কোনো মুসলিমকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেন, তবে সে তা অনায়াসে মুহূর্তেই পড়ে শেষ করবে।

ব্যাপারটা একেবারেই যান্ত্রিক। অবচেতনভাবেই মুখে আসছে। পাঠের সাথে মনের সংযোগ একদমই থাকছে না। যেহেতু এটা যান্ত্রিক, তাই আমাদের মনের খুব সামান্য একটা অংশ এতে ব্যস্ত থাকে। আমরা অধিকাংশ মুসলিম অনারব। আর তাই আরবী ভাষায় কথাবার্তা বুঝতে পারি না।[১৭৭] এজন্য সালাতে আরবীতে যা পড়ি তা বুঝতে পারি না। আর এই না বোঝার ফলে আমাদের মন সালাতের বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করে। মন যাতে এসব চিন্তা না করতে পারে সেজন্য সালাতে আরবী পড়ার পাশাপাশি একই সাথে আরবী আয়াতগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। যদি আপনি ইংরেজি জানেন তবে সূরার ইংরেজি অর্থ মনে করার চেষ্টা করুন। হিন্দি জানলে হিন্দিতে। মোদ্দা কথা, আপনি সেই ভাষায় আল্লাহর

---

[১৭৭] ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় "নামাজে মন ফেরানো" বইটা পড়ার পর থেকে আপনার আর এই আফসোস থাকবে না। আরবীতে নামাজে এতদিন ধরে যেটাই পড়ে আসছেন, সেই সবই আপনি এখন বুঝতে পারবেন, বিইজনিল্লাহ।

বলা অমিয় বাণীর অনুবাদ মনে রাখার চেষ্টা করুন যেই ভাষা আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন।

যেমন ধরুন, আমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়ি, অনেকটা এরকম...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

'(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময়, অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে।'

আপনি যখন আরবী আয়াত পড়ছেন, বাংলায় অর্থটাও মনে মনে পড়বেন। একইভাবে, সূরার অন্য আয়াতগুলোও পড়ার সময় বাংলা অর্থ মনে করার চেষ্টা করুন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

'যিনি করুণাময় ও পরম দয়ালু।'

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

'যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।'

٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

'আমাদেরকে সরল-সহজ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যারা আযাবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।'

আপনি সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য কোনো আয়াত পড়ার সময় অর্থটাও মনে করার চেষ্টা করুন। তখন আপনার মন আর অন্যত্র ঘুরে বেড়াবে না। কারণ, এতে করে আপনি সালাতে যে আরবী পড়ছেন তার অর্থ মনে রাখতে মন ব্যস্ত থাকছে।

*****

কয়েকদিন পর বা কয়েক মাস পর এটাও একেবারে যান্ত্রিক হয়ে যাবে। আমাদের মন খুব শক্তিশালী। ফলে আরবীর সাথে বাংলা মনে করার সময় অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনা একেবারেই কম। কারণ, মনের খুব ছোট্ট একটা অংশ আরবী পড়ায় ব্যস্ত থাকবে। আপনার মনের বাকি অংশটা তখন অর্থ মনে করবে। অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনা কম। তারপরও মন চিন্তা করতে পারে। মনের এই চিন্তা দূর করার জন্য আপনি আয়াতগুলো আরবীতে পড়বেন আর সেগুলোর অর্থ মনে করবেন।

একজন মানুষ দুটো ভিন্ন জিনিসের উপর শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। দুটো বিষয়ের উপর পঞ্চাশ শতাংশ করে মনোযোগ দেয়া সম্ভব অথবা একটাতে আশি শতাংশ, অন্যটিতে বাকি বিশ শতাংশ। কিন্তু দুটো আলাদা বিষয়ের উপর শতভাগ মনোযোগ দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যত বেশি মনোযোগ দিবেন আপনার মন তত কম ঘোরাফেরা করবে। মনের এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে আমরা আরবী আয়াত পড়ব, আয়াতের অর্থ বুঝব আর সেই অর্থের উপর মনোযোগ দিব। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের মন ঘোরাঘুরি করবে না।

পবিত্র কুরআনে সূরা আনকাবুতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।'[১৭৮]

*****

কম্পিউটার একটি আশ্চর্য মেশিন (যন্ত্র) যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অনেক হিসাব-নিকাশ করতে পারে। কম্পিউটার প্রচুর পরিমাণ তথ্যও ধারণ করতে পারে তার স্থায়ী ও অস্থায়ী মেমোরিতে। তো এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ তৈরি করছে শত রকমের সফটওয়্যার। সেই সফটওয়্যার হতে পারে একটি সাধারণ ক্যালকুলেটর, কিংবা চালকবিহীন গাড়ি চালানোর সফটওয়্যার, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ব্যবস্থা, কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পরিচালনার জন্য তৈরি সফটওয়্যার। কত কাজে যে মানুষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে, সেটা বলে শেষ করা যাবে না। তো সফটওয়্যার ব্যবহারের সুবিধা কী? যেসব কাজে প্রচুর পরিমাণ তথ্য প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ করার কাজ করতে হয়,

---

[১৭৮] সূরা আনকাবুত ২৯:৪৫

যা অনেক সময় সাপেক্ষ, সেখানেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজটি করা যায়। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কথাই ধরা যাক। সেখানে ১০-১৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর অনেকগুলো বিষয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রসেস করতে হয়, তারপর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করতে হয়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজটি করার ফলে হাজার হাজার ঘণ্টার শ্রম বেঁচে যায়। কাজেই, নির্দেশনা মোতাবেক কোনো কাজ সম্পাদন করাকে প্রোগ্রামিং বলে।

সালাত হলো এক ধরনের প্রোগ্রামিং। এই প্রোগ্রামিংটা হলো ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য। আর আমরা মুসলিমরা সালাতের মাধ্যমে দিনে পাঁচবার প্রোগ্রামড হই। আমরা নামাজে আল্লাহর কাছে এই বলে নির্দেশনা চাই যে, 'হে আল্লাহ, আমদের সরল পথ দেখাও।' আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর উত্তর দেন। তিনি আমাদের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি প্রোগ্রামড করেন।

যেমন ধরুন, সালাতে ইমাম সূরা মায়িদা পড়তে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে,

> 'হে বিশ্বাসীগণ, নিশ্চয়ই মদ ও জুয়া ঘৃণ্যবস্তু আর মূর্তি ও ভাগ্যগণনাকারী ঘৃণিত ও শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১৭৯]

এখানে সালাতে আমাদেরকে প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে যে, আমাদের বাদ দিতে হবে মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, মূর্তিপূজা ও ভাগ্য গণনা করা। কারণ, এগুলো সব শয়তানের কাজ।

ইমাম সূরা ফাতিহার পর সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত পড়তে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে,

> 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু।'[১৮০]

এখানে সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে। আমাদের এই হারাম খাবারগুলো খাওয়া উচিত নয়। এই হারাম খাবারগুলো হলো মৃত জন্তু, রক্ত,

---

[১৭৯] সূরা মায়িদা ৫ : ৯০

[১৮০] সূরা মায়িদা ৫ : ৩

শূকরের মাংস এবং যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র বাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতার পথে।

ইমাম সূরা ফাতিহার পর সূরা ইসরার ২৩-২৪ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে,

> "তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে কোনোরকম ধমক বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও, আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছেন।'"[১৮১]

এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চমৎকারভাবে আমাদেরকে প্রোগ্রাম করছেন যে কীভাবে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হয়।

*****

সাধারণত কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করার দরকার হয় মাত্র একবার। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনে একটি নিজস্ব ইচ্ছা রয়েছে যেটা কম্পিউটারের নেই, সেহেতু আমাদের—মানুষের প্রোগ্রামড হওয়া প্রয়োজন প্রত্যেকদিন। কারণ, আমরা আমাদের চারপাশে প্রত্যেকদিন অনেক খারাপ কাজ দেখি। মেয়েদের ইভটিজিং করা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, মদ পান করা, দুর্নীতি করা ইত্যাদি। এতে করে আমাদের প্রোগ্রামিংটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এজন্য প্রত্যেকদিন সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে যাতে করে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমে অর্থাৎ সহজ-সরল পথে থাকতে পারি। কিছু মানুষের মনে হতে পারে তাহলে তো দিনে একবার সালাত আদায় করলেই হতো। পাঁচবার সালাত আদায়ের কী প্রয়োজন ছিল!

---

[১৮১] সূরা ইসরা : ২৩-২৪

এটা এভাবে চিন্তা করা যায়। শরীর সুস্থ রাখতে আমাদের দিনে কমপক্ষে তিনবার খাওয়ার দরকার হয়। যদি দিনে একবার খান তবে আপনি খুব একটা স্বাস্থ্যবান হবেন না। একইভাবে শরীরের আত্মার সুস্থতার জন্য আমাদের দরকার দিনে কমপক্ষে পাঁচবার প্রোগ্রামিং করা অর্থাৎ, দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করা। একবার আদায় করা যথেষ্ট নয়। এই কারণে আমরা মুসলিমরা দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করি।

ইহুদীরা প্রতিদিন তিনবার করে প্রার্থনা করে। এই কথাটা উল্লেখ আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট বুক অফ ডেনিয়েলস ছয় নম্বর অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদে।

মুসলিমরা—আমরা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার সালাত আদায় করি। আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা। আর এ আদেশ প্রযোজ্য সব মুসলমানদের জন্য। একথা পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ‘তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রান্ত সময়ে আর কিছুটা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর, পুণ্যরাজি অবশ্যই পাপরাশিকে দূর করে দেয়, এটা তাদের জন্য উপদেশ যারা উপদেশ গ্রহণ করে।’[১৮২]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ‘সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, আর ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন করো)। নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের কুরআন পাঠ (ফিরিশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।’[১৮৩]

সূরা ত্ব-হায় আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

> ‘কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাগীতি (নিয়মিত) উচ্চারণ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো

---

[১৮২] সূরা হুদ ১১ : ১১৪

[১৮৩] সূরা ইসরা ১৭ : ৭৮

> রাত্রিকালে ও দিনের প্রান্তগুলোয় যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।'[১৮৪]

একইভাবে এ প্রসঙ্গে সূরা রুমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে। আর আসমানসমূহে ও জমিনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই।'[১৮৫]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন দিনে-রাতে পাঁচবার সালাত আদায়ের জন্য। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো ফজর, যেখানে আমরা সালাত আদায় করি ভোরবেলা হতে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত। এরপর যোহরের সালাত। যেসময় সূর্য সবচেয়ে উপরে থাকে, সে সময় থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত অর্থাৎ, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত। তৃতীয়ত, যোহরের পর থেকে সূর্যাস্তের ঠিক আগ পর্যন্ত আসরের সালাত। তারপর সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাত। আর এশার সালাত আকাশে লালিমা শেষ হবার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যেকোনো সময়ে এশার সালাত আদায় করা যায়।

---

[১৮৪] সূরা ত্বহা ২০ : ১৩০

[১৮৫] সূরা রুম ৩০ : ১৭-১৮

মনের মতো সালাত

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে বসে আছেন। ইতোমধ্যে একজন সাহাবী মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম দিলেন। নবীজি বললেন, 'যাও, তুমি আবার নামাজ পড়ে এসো। তোমার নামাজ হয়নি।' সাহাবী গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নবীজির সামনে এলেন। তিনি এবারও বললেন, 'তোমার নামাজ হয়নি, আবার পড়ে এসো।' তৃতীয়বারে এসে সাহাবী অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে আমি নামাজ পড়তে পারি না। দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> 'শোনো, প্রথমে নামাজে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে। তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, তা পাঠ করবে। রুকু করবে, রুকুতে শান্ত হয়ে যাবে। রুকু শেষে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হবে। এরপর সিজদা দিবে, সিজদাতে গিয়েও স্থিরতা বজায় রাখবে। সিজদার পর স্থির হয়ে বসবে। এভাবেই পুরো নামাজ শেষ করবে।'[১৮৬]

একটু কি ভেবে দেখবেন, আপনি যখন রুকু কিংবা সিজদা করেন, তখন কি

---

[১৮৬] বুখারী, মুসলিম

মনের ভুলেও কখনো খেয়াল করেন যে, আপনি কার সামনে রুকু করছেন! কার সামনে লুটিয়ে পড়ছেন সিজদায়?

জীবনে কবরের সিজদা দেখেছেন? আজকাল ইন্টারনেটে পীরের সামনে সিজদার দৃশ্য দেখা যায়। খেয়াল করে দেখবেন, পীরের সামনে যে নির্বোধরা সিজদা করে, তাদের মাঝে কোনো তাড়াহুড়ো থাকে না। কাকের মতো ঠোকর দিয়েই ওঠে না। জানে পীর বাবা তার সামনে আছে, বেয়াদবি করা যাবে না। কবরে যখন সিজদা করে খটাস করে মেরে উঠে পড়ে না কি? প্রতিমার সামনে সিজদা দেখেছেন কখনো? খটাস[১৮৭] করে মেরে উঠে পড়ে না কি?

আমাদের কী দুর্ভাগ্য! কবরপূজারি কবরে গিয়ে কত ভক্তি নিয়ে সিজদা করে পড়ে থাকে। পীরের পূজারি কত আবেগ নিয়ে শ্রদ্ধার সাথে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে। প্রতিমাপূজারি প্রতিমার সামনে কত আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে। আর আল্লাহর উপাসকরা আল্লাহর সামনে সিজদা দেয়ার সময় চট করে উঠে পড়ে। এই আমাদের ঈমান ভাইয়েরা! এমনই কি হওয়া উচিত ছিল ভাইয়েরা! আমি তো নামাজ পড়ছি আল্লাহকে সিজদা করার জন্য। নামাজে আমার মাবুদকে সিজদা করব, আমার মনের কথা বলব। কিছু না পারি, আরবী এক হরফ পারি বা না পারি, সিজদায় গিয়ে তো পড়ে থাকা যায়!

*****

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন রুকু করবে শান্ত হয়ে যাবে।' আমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে নিজের দাসত্ব প্রকাশের জন্যই তো নামাজে দাঁড়িয়েছি। কিচ্ছু পারিনি, সব মাফ। কিন্তু মাথাটা নিচু করে রুকুতে গেলাম আর যান্ত্রিকভাবে দ্রুততার সাথে রুকুর তাসবীহ পড়লাম। তারপর দেখা যায় দুঃখজনক দৃশ্য। অধিকাংশ মুসল্লি পুরো সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের আগেই সিজদাতে চলে যায়। আর একাকী নামাজির অবস্থা তো আরো নাজুক। যখন একা একা সুন্নাত পড়া হয়, রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে যেন রুকু থেকেই সিজদায় চলে যাচ্ছে। তাহলে 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদা' কখন পড়ল? অনেকে দাঁড়ানোর ভাব নিলেও সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায়।

বিশ্বাস করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[১৮৭] খুব দ্রুত কাজ করা

> 'যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা চুরি করে, এইভাবে খেয়ালহীন এবং মোরগের মতো ঠোকর দিয়ে নামাজ পড়ে সে আমার উম্মত হয়ে মরতে পারবে না।'

নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অনেক কিছুই মাফ হতে পারে। কিছু সময় এমন আছে, কাপড় পাক নেই মাফ, টুপি নেই মাফ, ওযু নেই, মাফ! যখন আপনি সিজদায় মাথা নোয়ালেন, তখন কেন পড়ে থাকলেন না। কী অভিযোগ ছিল আপনার?

সব সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, নামাজ আমার সবচেয়ে বড় ইবাদত, আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে আমার মূল মারিফত, মূল তরিকত, মূল সেতুবন্ধন। সেই ইবাদতে আর কিছু না পারি, আমি যে আমার মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার মাবুদ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমার অন্তর তিনি দেখছেন, আমার চোখ তিনি দেখছেন, আমার ইবাদত দেখছেন। সেই মাবুদের সামনে আমি অন্তত একটু সময় নিয়ে দাঁড়াই।

*****

দেখুন, আমরা অনেকেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি সূরা-কিরাত ঠিকমতো পড়তে পারি না, ভুলে যাই। এটা হতেই পারে। কিন্তু 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' তো ভুলে যাওয়ার কথা না। তাহলে অন্তত রুকুতে গিয়ে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নিয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করুন।

মানুষ পীরের সামনে মাথা নত করে সিজদা করে কত কথা বলে। পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না করে কত কথা বলে। আর আপনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে কান্না করতে পারেন না, তাহলে আপনি আল্লাহর কেমন বান্দা হলেন!

কাজেই আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশের জন্য রুকু-সিজদা সুন্দর করার কোনো বিকল্প নেই। রুকু থেকে উঠে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলুন,

'রাব্বানা লাকাল হামদ, হামদান ক্বাসিরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফী-হি।' আর কিছু জানা না থাকলে অন্তত এই কথাগুলো সুন্দর করে বলুন। তাও না পারলে অন্তত পুরো সোজা হয়ে—মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান, শান্ত হয়ে দাঁড়ান।

আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী কিংবা ডিসির সামনে দাঁড়ান, তখন খুব অস্থির হয়ে দাঁড়ান না কি? খুব সচেতন ও মিনতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন দৃষ্টিকটু কিছু

আপনার আচরণে প্রকাশ না পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আপনি আপনার মাবুদের সামনে তীব্র অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়ান।

কাজেই রুকুতে গিয়ে শান্ত হোন এবং রুকুতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে শিখুন। জীবন তো শেষ করে দিলেন বউ-বাচ্চা, পড়ালেখা আর ডিগ্রি নিয়ে। অনেকে রবের কাছে প্রার্থনার মধুর স্লোগান তুলে নামাজে আরবী ভিন্ন মাতৃভাষা প্রয়োগের ফতোয়া দিয়ে থাকেন। আমি তাদের সুবোধ কামনা করছি। তাদের কথা ভাবলে বড্ড লজ্জা আর অবাক লাগে। এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু বছর সময় নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছে। এই ডিগ্রির খাতিরে অনেক সময় ব্যয় করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছেন, এতে সমস্যা হয়নি। যখন রবের সাথে একটু কথা বলার জন্য আরবী শেখার প্রসঙ্গ আসে তখনই গাত্রদাহ শুরু হয়। ধিক জানাই নামাজের প্রতি এই অবহেলাকে এবং এই নিচু মানসিকতা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চিন্তাকে। নশ্বর এই দুনিয়ার জন্য রাতের পর রাত জেগে ইংরেজি শিখতে পারেন, আর আল্লাহর জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে আরবী শিখতে পারেন না, এই লজ্জার কথা বলি কী করে? আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

*****

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে বিভিন্ন দুআ পড়তেন। দুআগুলো ছোট ছোট কিন্তু মজার এবং আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব প্রকাশক। যেমন, তিনি বলতেন, 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।'

হাদিসে আছে, রুকুতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ، وَمُخِّيْ، وَعَظْمِيْ، وَعَصَبِيْ، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ

আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু। খাশা'আ লাকা সাম'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌খী ওয়া 'আযমী ওয়া 'আসাবী ওয়ামাস্তাক্বাল্লাত বিহি কাদামী।[১৮৮]

যার অর্থ হলো,

---

[১৮৮] মুসলিম ১/৫৩৪

> ‘হে আল্লাহ, তুমি মহাপবিত্র, তোমার কাছে আমি নত হয়েছি। তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি আমি। তোমার জন্য বিনম্রতায় নত হয়েছে আমার কান, আমার চোখ, আমার বোধ, আমার অস্থি, আমার সকল অনুভূতি।’

আমি হাতজোড় করে বলছি, আপনি এই অর্থগুলো খেয়াল করে কয়েক মাস দুআ করুন। বিশ্বাস করুন, আপনার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর কাছে নত হয়ে যাবে।

রুকুতে গিয়ে তিনি আরো বলতেন,

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَة

> সুবহা-নাযিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়া’ই ওয়াল ‘আযামাতি।[১৮৯]

‘পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি প্রবল প্রতাপময়, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী।’

এগুলো পড়তে শিখেন, বেশি না মাত্র কয়েকটা বাক্য। চেষ্টা করলে অল্প কয়েকদিনে মুখস্থ হয়ে যাবে।

রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলুন ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’, ‘হে আমার রব, সকল প্রশংসা তোমার।’

আমার রবকে এটা বললে তো আমার লজ্জা লাগার কথা না। আমরা হুজুরের কাছে, মন্ত্রীর কাছে কিছু বলতে গেলে কত প্রশংসা করে তারপর বলি। আর আল্লাহ যিনি আমার খালিক, আমার মালিক, যিনি অসীম দয়ালু; তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার আগে, তাঁর প্রশংসা করে তারপর চাইলে নিশ্চয়ই আমাদের লজ্জা বা কষ্ট লাগার কথা না।

আল্লাহু আকবার বলে মহব্বতের সাথে সিজদায় কপাল রাখুন মাটিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘বান্দা যখন নামাজে সিজদায় যায়, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে যায়।’

কাজেই সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চান, চাইতে থাকুন। সিজদায় আপনি যা চাইবেন আল্লাহ তা কবুল করে নিবেন ইনশাআল্লাহ। কাজেই সিজদায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৮৯] আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭৩

ওয়াসাল্লামের শেখানো সুন্নাত, মাসনুন দুআগুলোর মাধ্যমে। ছোট ছোট দুআ, কী মজার দুআ। সব চাওয়া হয়ে যায় এগুলো পড়লে। যেমন,

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা, ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা'

কতটুকু সময় লাগল এটা পড়তে? কিন্তু এই সময়ে আমরা কী চাইলাম আল্লাহর কাছে,

> 'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাইছি হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা।'

দেখুন, কেমন সামগ্রিক একটি দুআ। সব চাওয়া হয়ে গেল। তারপর কুরআনে যেসব দুআ আছে সেগুলোও পড়বেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য শিখিয়ে দিচ্ছেন,

> 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

এটি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সফলতার জন্য মুমিন ব্যক্তিদের আল্লাহর দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে অধিকাংশ সময় এ দুআটি করতেন।[১৯০] এরচেয়ে বড় দুআ আর নেই। এই দুআ যদি আপনি পড়তে পারেন আপনার বড়লোক হতে বেশি সময় লাগবে না।

হজে যারা যান তাদের জন্য হজের খাস দুআ হলো এই দুআ। হজে গেলে কারো হজ যদি কবুল হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তার আর কোনো অভাব থাকে না।' কাজেই আল্লাহর কাছে এই দুআটি করতে থাকুন।

আমরা নামাজ নষ্ট করি দুই জায়গায়তে বেশি। একবার রুকু থেকে উঠে পুরো সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে, আর সিজদা থেকে উঠে দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে দুআ করতেন।

---

[১৯০] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ

> ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।’

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া‘আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা‘নী।[১৯১]

এই দুআগুলো একটু শান্তভাবে পড়তে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডে সময় লাগে। এই পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড সময়ে আমরা আল্লাহর কাছে কী চাইলাম? আবার খেয়াল করুন। আমরা আল্লাহ তাআলাকে বলছি,

> ‘হে আল্লাহ, আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাকে রহমত করো, রহমত দিয়ে আমার জীবন ভরে দাও আল্লাহ। আল্লাহ, আমার রিযিক বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ, আমাকে হিদায়াত দান করো। আল্লাহ, আমকে পরিপূর্ণ সুস্থতা এবং নিরাপত্তা দাও। আল্লাহ, আমার গুনাহগুলো মুছে দাও। আল্লাহ, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ, আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও।’

*****

জীবনের জন্য চাওয়ার মতো আর কি কিছু বাকি থাকল?

একটা কথা আছে নিজের ভালো পাগলেও বুঝে কিন্তু বাঙালি বুঝে না। আমরা হুজুরদের কাছে, আলিমদের কাছে দুআ চাইতে যাই এগুলো নিতেই তো! অসুস্থ হয়েছি, তো হুজুর দুআ করেন যাতে সুস্থ হয়ে যাই, এজন্যই তো? আল্লাহ, আপনি আমাদের রিযিকে বরকত দিন, এজন্যই তো?

আচ্ছা মনে করেন, আপনি বিপদে পড়েছেন। কষ্ট হচ্ছে, অসুস্থতায়, রিযিকে

---

[১৯১] আবু দাউদ, ১/২৩১

বরকত নেই। তখন পকেটে দুহাজার টাকা নিলেন, গাড়িতে চড়লেন, জামা কাপড় পরলেন, কিছু হাদিয়া নিয়ে কোনো নেককার বুজুর্গ লোকের কাছে গেলেন। হুজুর দুআ করলেন। আল্লাহ কবুল করলে ভালো।

আর এত কিছু না করে প্রতিদিন আমরা মোটামুটি ত্রিশ রাকাতের মতো নামাজ পড়ি। এই ত্রিশ রাকাত নামাজে বড়জোর প্রতি দুই সিজদার মাঝখানে পাঁচ সেকেন্ড করে এই আধা ঘণ্টা আল্লাহর কাছে দুআ করলেন।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য সহজ, আর আমরা কোনটি করি?

নিজে আল্লাহর কাছে না চেয়ে, হুজুর ধরি, পীর ধরি। সহজ রাস্তা বাদ দিয়ে কঠিন রাস্তায় হাঁটি।

কাজেই নিজেকে নিয়ে ভাবুন। এই দুআগুলো শিখে দুই সিজদার মাঝখানে পড়ার চেষ্টা করুন। নামাজটাকে আল্লাহর সাথে মহব্বতের মূল ইবাদত মনে করবেন। আর কিছু না পারেন রুকু থেকে ওঠে এবং সিজদায় এই দুআগুলো পড়ার চেষ্টা করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যতক্ষণ থাকতেন, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ততক্ষণ থাকতেন। যতক্ষণ সিজদায় থাকতেন, দুই সিজদার মাঝখানে প্রায় ততক্ষণ বসে থাকতেন। বুঝতে পেরেছেন?

সাহাবীগণ বলতেন,

> “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় আমাদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার সময় রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাস্বিরান, তাইয়্যিবান মুবারাকান...’ এভাবে বলেই যাচ্ছিলেন। তখন আমাদের মনে হতো সিজদা যে করা লাগবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো সে কথা ভুলেই গেছেন। সিজদা দিয়ে দুই সিজদার মাঝে বসেছেন আর বসে এমনভাবে দুআ করতেন আমরা মনে মনে ভাবতাম আরেক সিজদা যে দেয়া লাগবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো সেটা ভুলেই গেছেন।”

এর নাম নামাজ। মহব্বতের সাথে অন্তর দিয়ে এগুলো পড়ুন। আমরা অনেক মজলিসে উলামায়ে কেরামগণ আসলে মহব্বতের সাথে জিন্দাবাদ দিয়ে তাদেরকে

স্বাগত জানাই। তেমনিভাবে আল্লাহর জিন্দাবাদ হলো সুবহানআল্লাহ। আপনি আর কিছুই না পারেন অন্তত পক্ষে রুকুতে গিয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (মহা পবিত্র আমার রব), সিজদায় গিয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' অন্তর থেকে মহব্বতের সাথে পড়ি।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের নামাজগুলোকে সুন্নাহ মতো আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।[১৯২]

---

[১৯২] শাইখ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদৌস দান করুন। লেকচারটি অনুলিখন করেছেন সম্পাদক হাসান শুয়াইব এবং অনুবাদিকা শারিন সফি অদ্রিতা।

সালাত বিষয়ক আয়াত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

> কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে—'কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে এনেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং আমরা মিসকিনদেরও খাবার দিতাম না; বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সঙ্গে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান-দিবসকে অস্বীকার করতাম। আর এভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেল।'[১৯৩]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ و

> '(হে নবী), আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।'[১৯৪]

---

[১৯৩] সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ : ৪২-৪৭

[১৯৪] সূরা আনকাবুত ২৯ : ৪৫

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

> ‘আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তা মজবুতভাবে পালন করুন। আমি আপনার কাছে রিযিক চাই না। বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিচ্ছি। আর ভালো পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।’[১৯৫]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

> ‘এবং তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটি একটি উপদেশ।’[১৯৬]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

> ‘অতঃপর যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন করো, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামাজ ঠিক করে পড়ো। নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।’[১৯৭]

---

[১৯৫] সূরা ত্বহা ২০ : ১৩২

[১৯৬] সূরা হুদ ১১ : ১১৪

[১৯৭] সূরা নিসা ৪ : ১০৩

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> ‘ওহে যারা ঈমান এনেছ! জুমার দিনে যখন তোমাদেরকে সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।’[১৯৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

> ‘সুতরাং, ওই সব নামাজির জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের নামাজসমূহে অলসতা করে। যারা লোককে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে।’[১৯৯]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

> ‘সজাগ দৃষ্টি রেখ সমস্ত নামাজের প্রতি এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি। আর আল্লাহর সামনে আদব সহকারে দাঁড়াও।’[২০০]

ফরজ নামাজ আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ। পদ্ধতিগতভাবে পার্থক্য থাকলেও আগের নবীদের যুগেও নামাজের বিধান ছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তী লোকেরা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করে। এর পরিণতি হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১৯৮] সূরা জুমআ ৬২ : ৯

[১৯৯] সূরা মাউন ১০৭ : ৪-৬

[২০০] সূরা বাকারা ২ : ২৩৮

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

‘নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা ‘গাই’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না।’[২০১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

‘এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্যই তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী বান্দাদের পক্ষেই তা সম্ভব। যারা ধারণা করে যে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।’[২০২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

অতঃপর বলুন, ‘আর যারা তাদের সালাতে যত্নবান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ; যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে।’[২০৩]

---

[২০১] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৫৯-৬০

[২০২] সূরা বাকারা : ৪৫-৪৬

[২০৩] সূরা মুমিনুন ২৩ : ৯-১১

সালাত বিষয়ক হাদিস

[১]আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের ফাঁকা জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরির বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।'[২০৪]

[২]আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোনো ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।"[২০৫]

[৩]আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কাতারগুলি সোজা করে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও । কাতারের ফাঁক বন্ধ করে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম করে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে), আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন।"[২০৬]

[৪]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে নামাজ। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল হয় তবে সে

---

[২০৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৬৭

[২০৫] সহীহ তারগীব ৫০৫

[২০৬] রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১০৯৮

সফল হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরজগুলোর মধ্যে কোনো কমতি থাকে তবে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কি না, তার সাহায্যে তার ফরজসমূহের কমতি পূরণ করে দাও। এরপর সব আমলের হিসাব এভাবেই নেয়া হবে।'[২০৭]

[৫]আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এই সালাত যথাযথভাবে ও সঠিক নিয়মে আদায় করতে থাকবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য প্রমাণ ও মুক্তি নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সালাত সঠিকভাবে আদায় করবে না, তার জন্য নূর, অকাট্য দলিল ও মুক্তি কিছুই হবে না, বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফিরাউন, হামান, উবাই ইবনু খালফের সাথে।'[২০৮]

[৬]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারির সামগ্রী তৈরি করে রাখেন।'[২০৯]

[৭]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর আল্লাহর কোনো একটি ফরজ (সালাত) আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হলো, তার পদচারণার প্রতি এক কদমে একটি গুনাহ মাফ এবং পরবর্তী কদম একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে।'[২১০]

[৮]আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'একাকী সালাত পড়ার চেয়ে জামাতে সালাত পড়ার ফযিলত সাতাশ গুণ বেশি।'[২১১]

---

[২০৭] তিরমিজি

[২০৮] মুসনাদু আহমাদ: ৬২৮৮

[২০৯] সহীহ বুখারী: ৬২২

[২১০] সহীহ মুসলিম: ১০৭০

[২১১] সহীহ বুখারী: ৬০৯

[৯]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?' সাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে, কষ্ট সত্ত্বেও ওযু করা, মসজিদে (সালাতের উদ্দেশ্যে) অধিক পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় বন্ধন।'[২১২]

[১০]আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সালাত (ফজর ও আসর) পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২১৩]

[১১]নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে উত্তমরূপে গোসল করে আগে আগে মসজিদে যায় এবং বাহনে না চড়ে হেঁটে যায়। ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ দিয়ে ইমামের আলোচনা শোনে, অনর্থক কাজ না করে, তবে তার প্রতি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এক বছর সিয়াম ও কিয়ামের সাওয়াব দান করেন।'[২১৪]

[১২]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাতে নামাজ শেষ হবার পরও বসে থাকে, রহমতের ফিরিশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ, এর প্রতি দয়া করো; হে আল্লাহ, একে ক্ষমা করো; হে আল্লাহ, এর তাওবা কবুল করো। (ফিরিশতাদের এই দুআ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওযু নষ্ট না হয়।'[২১৫]

[১৩]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা যখন সিজদায় যায় তখন তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা (সিজদায় গিয়ে) বেশি বেশি দুআ করো।'[২১৬]

[১৪]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তাদের (কাফিরদের)

---

[২১২] সহীহ মুসলিম: ৩৬৯

[২১৩] সহীহ বুখারী: ৫৭৪

[২১৪] তিরমিজি, হাদিস : ৪৫৬

[২১৫] রিয়াদুস সালেহিন ১১

[২১৬] রিয়াদুস সালেহিন: ১৪৯৮

মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।'[২১৭]

[১৫]আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই তার সালাত নেই। আর যার সালাত নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যেমন মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে সালাতের অনুরূপ মর্যাদা।'[২১৮]

[১৬]আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পুণ্য কাজ হচ্ছে ওয়াক্তের প্রথমভাগে সালাত আদায় করা।'[২১৯]

[১৭]আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।'[২২০]

[১৮]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওযুর প্রভাবে তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল জ্বলজ্বল করতে থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এই উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে সে যেন তা বাড়িয়ে নেয়।'[২২১]

[১৯]উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, তার গুনাহসমূহ শরীর থেকে ঝরে যায়। এমনকি নখের নিচ থেকেও।'[২২২]

[২০]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা ওযুর সময় যখন

---

[২১৭] মুসনাদু আহমাদ: ২১৮৫৯

[২১৮] আল-মওসুআতু লিত-তবরানি: ২৩৮৩

[২১৯] সুনানুত তিরমিজি: ১৭৩

[২২০] সুনানুত তিরমিজি: ৩৫৪৯

[২২১] সহীহ বুখারী: ১৩৬

[২২২] সহীহ মুসলিম: ২৪৫

মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখ দিয়ে করা গুনাহসমূহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের স্পর্শে করা সকল গুনাহ পানি অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন তার দুই পা দ্বারা করা সকল গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অবশেষে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।'[২২৩]

[২১] উবাদাহ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, যা আল্লাহ তাআলা (বান্দার জন্য) ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এ সালাতের জন্য ভালোভাবে ওযু করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকু ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।'[২২৪]

[২২] কিন্তু অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে, যারা নামাজে অবহেলা করে, তারা দ্বীনকেই অবহেলা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করল, সে দ্বীন কায়েম করল। আর যে নামাজ ধ্বংস করল, সে দ্বীন ধ্বংস করল।'[২২৫]

[২৩] নোমান ইবনু মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের নামাজ চুরি করে, সে চুরি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় চুরি।' তারা (সাহাবীরা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপন নামাজ চুরি করে কীভাবে? তিনি বলেন, 'যে নামাজের রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না।'[২২৬]

[২৪] আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন লোকও আছে যারা নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও নামাজের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং

---

[২২৩] সহীহ মুসলিম: ২৪৪

[২২৪] মিশকাত, হাদিস : ৫৭০

[২২৫] বায়হাকি, হাদিস : ২৫৫০

[২২৬] মুয়াত্তায়ে মালিক, হাদিস : ৩৮৯

নামাজে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুজু না থাকায় তারা নামাজের পরিপূর্ণ সওয়াব পায় না। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ বা অর্ধাংশ সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।[২২৭]

[২৫]নামাজে প্রশান্তি ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ এবং রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা না করা এবং রুকু থেকে ওঠার পর সোজা হয়ে না দাঁড়ান এবং দুই সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে না বসা, অধিকাংশ মুসল্লির মাঝে এসব ত্রুটি লক্ষ করা যায়। কোনো মসজিদই এ ধরনের মুসল্লি থেকে মুক্ত নয়। নামাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা থাকা নামাজের একটি রুকন, যা ব্যতিরেকে নামাজ সঠিক হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'কারো নামাজ ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না রুকু এবং সিজদায় তার পিঠ সোজা করবে।'[২২৮]

[২৬]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এভাবে ইবাদত করো যে যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।'[২২৯]

[২৭]ইমাম আহমাদ হাসান সনদে ও আবু ইয়ালা কর্তৃক বর্ণিত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। ১. মোরগের মতো ঠোকর মারতে ২. কুকুরের মতো বসতে এবং ৩. শৃগালের মতো এদিক-সেদিক তাকাতে।[২৩০]

[২৮]ইমাম বুখারী তারিখে এবং ইবনু খুযায়মা প্রমুখ খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর বিন আস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান এবং শারাহবীল বিন হাসনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে থেকে বর্ণিত। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজ আদায় করতে দেখলেন যে, রুকু পুরোপুরিভাবে করছে না এবং সিজদায় ঠোকর মারছে। হুজুর নির্দেশ দিলেন, পরিপূর্ণভাবে রুকু করো এবং এও ইরশাদ করলেন, এ ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে মিল্লাতে মুহাম্মাদী ছাড়া অন্য মিল্লাতে মৃত্যুবরণ করবে। তারপর ইরশাদ করলেন, যে

---

[২২৭] আবু দাউদ, হাদিস : ৭৯৬

[২২৮] আবু দাউদ ১/৫৩৩; সহীহ আল-জামে ৭২২৪

[২২৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি; বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, ঈমান অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৮ হাদিস ৪৮

[২৩০] আহমাদ, ২৯৯

ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে রুকু করে না এবং সিজদায় ঠোকর মারে ওই ভুখার মতো যে এক-দুটি খেজুর খেয়ে নেয়, যা কোনো কাজ দেয় না।[২৩১]

[২৯]হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, রুকু ও সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করছে না। যখন সে নামাজ শেষ করল, তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার নামাজ হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, তিনি এও বলেছেন যে, যদি তুমি এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করো তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের উপর তোমার মৃত্যু হবে না।[২৩২]

[৩০]ইমাম আহমাদ মুতলাক বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার ওই নামাজের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকু ও সিজদার মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না।[২৩৩]

[৩১]হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে বৎস! নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাকো। কারণ নামাজে এদিক-সেদিক তাকানোই ধ্বংস।[২৩৪]

[৩২]দারেমী, কাব বিন উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মহান প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি যথাসময়ে নামাজ সম্পন্ন করবে, তার জন্য আমার প্রতিশ্রুতি হলো, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি যথাসময়ে পড়বে না এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করবে না তার জন্য আমার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে দোজখে প্রবেশ করাব আর চাইলে জান্নাতে প্রবেশ করাব।[২৩৫]

[৩৩]তাবরানী আওসাত্ব গ্রন্থে আনাস বিন মালিক থেকে থেকে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত

---

[২৩১] মু'জামুল কাবীর, ১৫৮

[২৩২] বুখারী

[২৩৩] আহমাদ

[২৩৪] তিরমিজি

[২৩৫] দারেমী, ফতওয়ায়ে রযভীয়্যাহ

নামাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে এবং এর ওযু, কিয়াম, খুশু, রুকু এবং সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করে ওই সব নামাজ উজ্জ্বল আলো হয়ে এ বলে বের হয় যে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন, যেমনি তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। আর যে ব্যক্তি যথাসময়ে নামাজ না পড়ে অন্য সময়ে পড়ে এবং ওযু, কিয়াম, খুশু , রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না, ওই নামাজ কালো অন্ধকার হয়ে এ বলে বের হয় যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছ। শেষ পর্যন্ত ওই স্থানে নিয়ে পৌঁছে যেখান পর্যন্ত পৌঁছা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন, সেখান থেকে পুরোনো আবর্জনার মতো একত্রিত করে তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়।[২৩৬]

[৩৪]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিও না, কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ ও রাসূল তার থেকে দায়মুক্ত।[২৩৭]

[৩৫]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে মানুষের ইমামতি করে, সে নামাজ সংক্ষেপ করবে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামাজ আদায় করবে, তখন সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নামাজ সুদীর্ঘ করবে।[২৩৮]

[৩৬]আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকল। অতএব তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারিকে নষ্ট করো না।'[২৩৯]

[৩৭]আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন। তখন গাছের পাথা ঝরার মৌসুম ছিল। নবীজি গাছের একটি দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। ফলে তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২৩৬] তাবরানী

[২৩৭] আহমাদ

[২৩৮] বুখারী ও মুসলিম

[২৩৯] ইবনু মাজাহ ৩৯৪৫

ওয়া সাল্লাম বললেন, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে।[২৪০]

[৩৮]নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন-মুসলমানরে ঈমানের দাবী ও ফরজ ইবাদত। নামাজি ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয় নবী। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে; কিয়ামতের দিন ওই নামাজ তার জন্য নূর হবে এবং হিসাবের সময় নামাজ তার জন্য দলিল হবে এবং নামাজ তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হবে না, কিয়ামতের দিন নামাজ তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফিরাউন, হামান এবং উবাই ইবনু খালফের সাথে তার হাশর হবে।'

[৩৯]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকদের কাছে ফজর ও এশা অপেক্ষা অধিক ভারী কোনো সালাত নেই। আর যদি তারা জানত যে, এই সালাতদ্বয়ের মধ্যে কী ফযিলত রয়েছে, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এর জন্য আসত।[২৪১]

[৪০]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমার সালাত থেকে অপর জুমার সালাত এবং এক রমজান মাসের রোজা হতে অপর রমজান মাসের রোজা সেসব গুনাহের জন্য কাফফারা হয়, যা এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে; যখন কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।[২৪২]

[৪১]আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায়ে করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন।'[২৪৩]

[৪২]ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর থেকে তাঁর জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন। মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[২৪০] মুসনাদ আহমাদ

[২৪১] সহীহ বুখারী: ৬৫৭, সহীহ মুসলিম: ৬৫১

[২৪২] সহীহ মুসলিম:২৩৩

[২৪৩] আন-নাসায়ী ১৭৯৫

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটি নসীহত করেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার উপর আল্লাহ তাআলার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।'[২৪৪]

[৪৩]নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয়। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করল তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।'[২৪৫] আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য আরেকটা হাদিসে ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে গেল তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।'[২৪৬]

[৪৪]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মসজিদে প্রবেশ করার পর থেকে নামাজ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষার সময় নামাজের মধ্যেই গণ্য হয়। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তির আমলনামায় নামাজ পড়ার সওয়াব যোগ হতে থাকে।'[২৪৭]

[৪৫]উল্লেখ্য, এই কথাগুলো সাহাবীদের। এটা হাদিস হয়। এটা সরাসরি নবীজির কথা নয়! এই উক্তি শুনে কেউ নিজেকে এবং অন্যের দিকে আঙ্গুল তুলে 'কাফির' স্যব্যস্ত করা শুরু করবেন না, ইনশাআল্লাহ। বরং এর গুরুভার বুঝে নামাজের ব্যপারে আরও সচেতন হই যেন কাউকেই এই ভয়ে থাকতে না হয়।

[৪৬]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জুমার দিন মসজিদের দরজায় ফিরিশতারা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে আসে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানি করে। এরপর যে আসে সে ওই ব্যক্তি যে একটি গাভি কুরবানি করে। এরপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর ন্যায়। তারপর ইমাম

---

[২৪৪] মুসনাদ আহমাদ : ৫/২৩৮

[২৪৫] বুখারী, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪

[২৪৬] বুখারী, হাদিস : ৫৫২; মুসলিম, হাদিস : ৬২৬

[২৪৭] রিয়াদুস সালেহিন ১১

যখন বের হন তখন ফিরিশতাগণ তাদের লেখা বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতে থাকেন।'[২৪৮]

[৪৭]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যদি তার নিকট থাকে। তারপর জুমার নামাজে আসে এবং অন্য মুসল্লিদের গায়ের উপর দিয়ে টপকে সামনের দিকে না যায়। নির্ধারিত নামাজ আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়ার পর থেকে সালাম পর্যন্ত চুপ করে থাকে। তাহলে তার এই আমল পূর্ববর্তী জুমার দিন থেকে পরের জুমা পর্যন্ত সমস্ত সগিরা গুনাহর জন্য কাফফারা হবে।'[২৪৯]

[৪৮]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিনই সর্বোত্তম। এই দিনে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এই দিনে শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে। এই দিনে সমস্ত সৃষ্টিকে বেহুঁশ করা হবে। অতএব তোমরা এই দিনে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরুদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে।'[২৫০]

[৪৯]রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।'[২৫১]

[৫০]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়া এবং এর মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু (আল্লাহর রাস্তায় দান করা) থেকেও উত্তম।'[২৫২]

[৫১]ফজরের সময় ফিরিশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফিরিশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করে। এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেছেন, 'ফিরিশতারা

---

[২৪৮] বুখারি, হাদিস : ৯২৯

[২৪৯] আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৩

[২৫০] আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৭

[২৫১] মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭

[২৫২] নাসায়ী ১৭৫৯

পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোনো অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তারা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।'[২৫৩]

[৫২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে, তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তার জন্য একটি হজ ও একটি উমরার সওয়াব রয়েছে।[২৫৪]

[৫৩] ফজর নামাজ আদায়ের জাগতিক উপকারের কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাৎ অংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, ওযু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষ-কালিমা ও আলস্য নিয়ে।'[২৫৫]

[৫৪] বিখ্যাত তাবেয়ী আবু বকর বিন উমারাহ তার পিতা রুআয়বাহ থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।'[২৫৬]

[৫৫] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের কী ফযিলত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে আগেভাগে আসার চেষ্টা করত। মানুষ যদি জানত, সালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কী ফযিলত রয়েছে, তবে তা

---

[২৫৩] বুখারী, হাদিস : ৫৫৫

[২৫৪] তা'লীকুর রাগীব ১/১৬৪, ১৬৫, মিশকাত ৯৭১

[২৫৫] বুখারী, হাদিস : ১১৪২

[২৫৬] মুসলিম, হাদিস : ১৩২২

পাবার জন্য লটারি করত। মানুষ যদি জানত, এশা ও ফজরের সালাতের কী ফযিলত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা মসজিদে উপস্থিত হতো।[২৫৭]

[৫৬]আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। আবুন নাযর রহ. বলেন, আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন।[২৫৮]

[৫৭]যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ উত্তমরূপে ওযু করে নির্ভুলভাবে দুরাকাত সালাত আদায় করলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'[২৫৯]

[৫৮]আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জামাতে নামাজ আদায়ের সময় যখন ইমাম আমিন বলে, তখন তোমরাও আমিন বলো। যার আমিন বলা ফিরিশতাদের আমিন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।'[২৬০]

[৫৯]আবু মালিক আলি আশআরি রা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ' মিযান বা (হিসাবের) পাল্লাকে ভারী করে দিবে। সুবহানআল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ করে দেয়। সালাত হলো নূর বা আলোকবর্তিকা। দান-সাদাকা দলীল। ধৈর্য উজ্জলতা। কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে দলীল। প্রতিটি মানুষ সকাল করে, অতঃপর সে নিজেকে বিক্রয় করে, তাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কর্মে লিপ্ত থাকে। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে তাঁর কাছে বিক্রি করে দেয়, ফলে নিজেকে শাস্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। আবার কেউ শয়তান ও প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে বিক্রি করে, তার তাবেদারী করে। ফলে নিজের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে।"[২৬১]

---

[২৫৭] সহীহ বুখারী ৭২১

[২৫৮] সহীহ বুখারী ৫১০

[২৫৯] আবু দাউদ ৯০৫

[২৬০] ইবনু মাজাহ ৮৫১

[২৬১] সহীহ তারগিব ১৮৯

নামাজে প্রচলিত কয়েকটি ভুল

নামাজে মনে মনে কুরআন পড়া

যে সমস্ত নামাজে আস্তে কিরাত পড়া হয়, সে সকল নামাজে অনেককে দেখা যায়, মুখ-ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সূরা-কিরাত পড়েন। হয়তো তারা এই ভুল ধারণা করে আছেন যে, আস্তে আস্তে কিরাত পড়া মানে মনে মনে পড়া।

এটি ঠিক নয়। কারণ, যে সকল নামাজে কিরাত আস্তে পড়তে বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, নীচু স্বরে তিলাওয়াত করা। আর এ তো খুবই সহজ কথা যে, মনে মনে পড়া কোনোক্রমেই নীচু স্বরে পড়া নয়।

ইসলামি ফিকহ ও ফাতওয়ার গ্রন্থাদি থেকেও স্পষ্ট হয় যে, নীচু স্বরে কিরাত পড়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এমনভাবে পড়া, যেন সে নিজে শুনতে পায়। আর সর্বনিম্ন এতটুকু তো অবশ্যই জরুরি যে, সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করা হবে এবং ঠোঁট-জিহ্বার নড়াচড়া দেখা যাবে। একটি হাদিসে আছে, যোহর ও আসর নামাজে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন পড়তেন, তখন কোনো কোনো আয়াত সাহাবায়ে কেরামও কখনো কখনো শুনতে পেতেন।

আবু মামার রহ. বলেন, আমরা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যোহর ও আসরের নামাজে কুরআন পড়তেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, বিজতিরাবি লিহয়াতিহী—তাঁর দাড়ি মুবারক নড়াচড়া দ্বারা।[২৬২]

---

[২৬২] সহীহ বুখারী-ফাতহুল বারী ২/২৮৪-২৮৭

অতএব, কিরাত পড়ার সময় জিহ্বা ও ঠোঁট ব্যবহার করে মাখরাজ থেকে সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করতে হবে। অন্যথায়, শুধু মনে মনে পড়ার দ্বারা কুরআন পড়া সাব্যস্ত হবে না। না।

তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা

এটি আরেকটি ভুল। ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার সময় এই ভুলটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে বাঁধাকেই অনেকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নামাজের শুরুতে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমে, মনে মনে কোন নামাজ পড়ছি—এর সংকল্প করতে হবে। এর নাম: নিয়ত, যা নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি। উল্লেখ্য, মনে মনে সংকল্প করে নিলেই নিয়ত হয়ে যাবে, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

দ্বিতীয় কাজটি হলো, তাকবীরে তাহরীমা। অর্থাৎ, স্পষ্ট উচ্চারণে 'আল্লাহু আকবার' বলা। তাকবীর অর্থ বড়ত্ব বর্ণনা করা, গৌরব বর্ণনা করা, তাকবীর দেয়া, আল্লাহু আকবার বলা ইত্যাদি। আর তাহরীমা অর্থ নিষিদ্ধকরণ, হারামকরণ ইত্যাদি। যেহেতু এই তাকবীরের মাধ্যমে নামাজবহির্ভূত সকল কাজ হারাম হয়ে যায় তাই একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। এই তাকবীর বলা ফরজ। আর এ তাকবীর দ্বারাই নামাজ শুরু করা হয়, যা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

তৃতীয় কাজ হলো, কান পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে নাভির নিচে বাঁধা। এই কাজটি সুন্নাত।

প্রচলিত পরিভাষায় 'নামাজের নিয়ত বাঁধা' এই তিন আমলের সমষ্টিকেই বোঝায়।

এখন কেউ যদি শুধু হাত উঠিয়ে তা বেঁধে নেয়, কিন্তু আল্লাহু আকবার না বলে কিংবা মনে মনে বলে, তাহলে নামাজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবটিই আদায় হবে না। ফলে তার নামাজও হবে না। অতএব, এখানেও তাকবীর স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। শুধু মনে মনে বলা যথেষ্ট নয়।

আমিন মনে মনে বলা

এটিও এটিও আরেকটি ভুল। নিয়ম হলো, জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমাম সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর মুকতাদি 'আমিন' বলবে। আমিন নীচু স্বরে ও

উঁচু স্বরে বলা দুটোই শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যদিও অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির আমল নীচু স্বরে বলাই ছিল, তাই অনেক ফকিহ নীচু স্বরে বলাকেই উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ কোনোভাবেই মনে মনে বলা নয়। 'নীচু স্বরে বলা' কিংবা 'অনুচ্চকণ্ঠে' বলা আর মনে মনে বলা এক কথা নয়। কাজেই আমিন বলার ফজিলতপূর্ণ সুন্নাতটি আদায় করার সময়ও তা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, এই তিনটি আমলের কথা বলা হলো, অন্যথায় তাকবীর, রুকু-সিজদার তাসবীহ, মাঝ এবং শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ ও দুআর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই আমলগুলোও মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

অতএব, উদাসীনতা বা অবহেলার কারণে হোক কিংবা না জানার কারণে হোক, সর্বাবস্থায় উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে মনে মনে বলার ভুল পদ্ধতি সংশোধনযোগ্য।[২৬৩]

---

[২৬৩] মাসিক আলকাউসার, সফর ১৪৩২, জানুয়ারী ২০১১

শেষ কথা

অভিনন্দন আপনাকে বইটির শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য!

তবে প্রিয় পাঠক এবং পাঠিকা, মনে রাখবেন আপনার নামাজকে জীবন্ত করার যাত্রার শেষ এখানেই নয়। বরং এটা স্রেফ শুরু, ইনশাআল্লাহ। বইটি কেবল পড়ার জন্য নয়, "করার" জন্যও বটে! অর্থাৎ, যা শিখলাম এবং জানলাম সেটা আমলে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করে দেই এই মুহূর্ত থেকে। আমল বিবর্জিত জ্ঞান এবং জ্ঞান বিবর্জিত আমল—দুটোই ক্ষতিকর।

এই বইয়ের প্রায়োগিক জ্ঞানকে আমলে পরিণত করতে পিছপা হবেন না। বইটা বারবার পাঠ করবেন। সপ্তাহে একবার করে বইটি রিভিশন দেয়ার রুটিন করে নিতে পারেন। আপনার সন্তানদের এই বই থেকে ধরে ধরে নামাজের তাসবীহ/বাক্যমালার অর্থগুলো শেখাতে পারেন। পারিবারিক তালিমে বইয়ের অধ্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে পড়তে পারেন। বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে অসার আড্ডার বদলে জায়গা করে নিতে পারে "নামাজে মন ফেরানো"র মূল্যবান কিছু কথা। আপনার আশেপাশে যে মানুষগুলো তাদের নামাজে অবহেলা করছে এবং তাদের জান্নাতে যাওয়া নিয়ে আপনি আন্তরিকভাবে চিন্তিত, তাদেরকে বইটি হাদিয়া দিতে পারেন।

আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি, নামাজে মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে আমরা কেউই রাতারাতি পারদর্শী হয়ে যাব না। সর্বোপরি এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর ধৈর্য ধরে রাখবেন। সবর এবং সালাতের মাধ্যমেই তো আল্লাহর সাহায্য ও ভালোবাসা আমরা চাই!

সালাত আদায় করার স্থান মসজিদ বা মুসাল্লার জায়নামাজ হতে পারে। কিন্তু জীবন্ত সালাত মসজিদ বা মুসাল্লার বাইরেও নিজেকে প্রকাশ করবে; আমাদের কথায়,

চলনে, চরিত্রে। সালাতের প্রাণচাঞ্চল্য যদি মসজিদ/জায়নামাজের আঙিনাটাই পার না হয়, তবে এর সুফল কীভাবে আমাদের কবর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে?

সম্পূর্ণ বইতে যা কিছু উত্তম এবং কল্যাণকর, সব আল্লাহর তরফ থেকে, এখানে যত ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, সেটা আমাদের, নফসের এবং শয়তানের তরফ থেকে।

বারাকাল্লাহু ফীকুম।

দ্বীন পাবলিকেশন

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই	লেখক
০১	খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.	শাইখ আব্দুল হামিদ মাহমুদ তাহমায
০২	আয়েশা বিনতে আবু বকর রা.	শাইখ আব্দুল হামিদ মাহমুদ তাহমায
০৩	হাফসা বিনতে উমর রা.	আমিনা উমর আল-খাররাত
০৪	যাইনাব বিনতে জাহাশ রা.	আমিনা উমর আল-খাররাত
০৫	উম্মু সালামা রা.	আমিনা উমর আল-খাররাত
০৬	পুণ্যবতী	আরিফুল ইসলাম
০৭	কমান্ডারস অফ দা মুসলিম আর্মি	মাহমুদ আহমাদ গাজানফার
০৮	নবীজিকে হত্যাচেষ্টা, অতঃপর	মাহমুদ নাসসার, সায়্যিদ ইউসুফ
০৯	উম্মু উমারা নুসাইবা বিনতে কাব রা.	আমিনা উমর আল-খাররাত
১০	উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রা.	আমিনা উমর আল-খাররাত
১১	নামাজে মন ফেরানো	শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা
১২	পজিটিভ থিংকিং	হাসান শুয়াইব
১৩	যে আমলে আসমানের দুয়ার খোলে	শাইখ মুহাম্মাদ আন-নাঈম
১৪	প্রজ্ঞার গল্প	ড. আদহাম শারকাভি
১৫	ইসলাম সহজ দ্বীন	শাইখ সালেহ আহমাদ শামি

অনুবাদিকা পরিচিতি

শারিন সফি অদ্রিতার লেখালিখির হাতেখড়ি শৈশবকাল থেকেই। ২০১১ সালে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার অন্তরে দ্বীনের বুঝকে জাগ্রত করলেন। এরপর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজ কলমকে শানিত করবেন দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে তার লেখা যৌথভাবে অন্যান্য লেখকদের সাথে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোক্ত জনপ্রিয় ইসলামিক বইগুলোতে: গল্পগুলো অন্যরকম, সেরা হোক এবারের রামাদান, প্রজন্ম ক্ষুধা, রোদেলা দিনের গল্প এবং শেষ বিকেলের রোদ্দুর। অনুবাদিকা হিসেবে "নামাজে মন ফেরানো" তার প্রথম একক বই, আলহামদুলিল্লাহ। শারিন ২০২০ সাল থেকে মুসলিম বোনদের সমসাময়িক অনলাইন দাওয়াতী প্লাটফর্ম "মুসলিমা কনফিডেন্স ওয়ার্কশপ" পরিচালনা করছেন। সর্বোচ্চ ডিগ্রী মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন "সাইকোলজি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কাউন্সেলিং" সাবজেক্টের উপর ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ থেকে। “ইসলামিক সাইকোথেরাপি”র উপর বিশেষ ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন Khalil Center থেকে। প্রবাসে বর্তমানে তার স্বামী এবং মা-বাবার সাথে আছেন। প্রবাসে থাকাকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে শারিন গত আট বছর ধরে সরাসরি এবং অনলাইনে আলিম-আলিমাদের তত্ত্বাবধানে ইসলাম অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসেন বই পড়তে, লিখতে এবং কুরআন-হাদিসভিত্তিক ইতিবাচক চিন্তাধারার নূর প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মেহনত করতে।

ভাবুন তো, নামাজ ছাড়া মুসলিম জীবন কল্পনা করা যায়? শরীরের জন্য যেমন অক্সিজেন আবশ্যক, মুসলিমের জন্য তেমনি নামাজ! যে মানুষটা হয়তো তেমন একটা ধর্ম-কর্ম নিয়ে সচেতন নন, তিনিও জীবনের কোনো এক পর্যায়ে নামাজে সিজদায় গিয়ে নিজের অন্তর ঠাণ্ডা করেছেন। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আমরা যখন বুঝতে পারি, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করা কতটা জরুরী, তখন সবার আগে নামাজকে আঁকড়ে ধরি। কিয়ামতের দিন সবার আগে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাকে-আমাকে প্রশ্ন করা হবে, সেই নামাজকে জীবন্ত করবার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

শাইখ আব্দুল নাসির জাংদা কর্তৃক পরিচালিত 'মিনিংফুল প্রেয়ার' কোর্সটির শিক্ষারত্ন এবং ভাবানুবাদ এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কোর্সটি মূলত অনলাইনে প্রচারিত হয় এবং সর্বমোট ১১টি লেকচারের সমন্বয়ে গঠিত। সম্পূর্ণ কোর্সজুড়ে একজন মুসলিম তার নামাজের মধ্যে যা যা শব্দ, বাক্যমালা, তাসবীহ ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, সেগুলোর ভাষাগত এবং পরিভাষাগত অর্থের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেই সাথে নামাজকে মধুর এবং সফল করার বিভিন্ন কলাকৌশল, সত্য ঘটনা অবলম্বনে কিছু গল্প-উপাখ্যান ইত্যাদি আজকের যুগের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে নামাজ সম্পর্কিত সময়ের বিজ্ঞ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের বয়ান সংযোজন।

অনলাইন পরিবেশক
বইভ্যালি
যোগাযোগ: +০১৩০৩ ৭৭১২০২, +০১৩০৩ ৭৭১২২২
/boivalley.shop /deenpublication

দ্বীন পাবলিকেশন